প্রথম অধ্যায়

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন পথ

১

মর্টন স্কুল। ৫০ নম্বর আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। খুব গরম পড়িয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস। সন্ধ্যা হয় হয়। আলো আসিতেই শ্রীম হাততালি দিয়া 'হরিবোল, হরিবোল' বলিতে বলিতে ধ্যানমগ্ন হইলেন। গরমে কষ্ট হইলেও দীর্ঘকাল ধ্যান করিতেছেন। শ্রীম-র গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'সন্ধ্যার সময় সর্ব কর্ম ছাড়িয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে হয়।' শ্রীম সর্বদা এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

শ্রীম দ্বিতলের বসিবার ঘরের মেঝেতে বসিয়া আছেন। শরীর তত ভাল নয়। কাছেই শুকলাল, ডাক্তার, বিনয়, সুখেন্দু, ছোট জিতেন ও জগবন্ধু বসিয়া আছেন। ভক্তরা গান গাহিতেছেন শ্রীম-র ইচ্ছায়।

গান । রামকৃষ্ণ-চরণ-সরোজে মজরে মন-মধুপ মোর।
কণ্টকে আবৃত বিষয়-কেতকী
থেকো না থেকো না তাহে বিভোর॥

(প্রার্থনা ও সঙ্গীত - রামকৃষ্ণমিশন, সারদাপীঠ, বেলুড়মঠ)

গান । মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
বিষয়-মধু তুচ্ছ হলো কামাদি কুসুম সকলে॥

এতক্ষণে যোগেন, হরেন্দ্র মাষ্টার, ডাক্তারের ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বনাথ, সুধীর, শচী প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইবার কথামৃত পাঠ হইতে লাগিল — চতুর্থ ভাগ, ষোড়শ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাঠান্তে কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি ক্ষীণকণ্ঠে) — ঠাকুর বলেছিলেন ভোগ-বাসনা থাকলে যোগ হয় না। যোগ মানে ভগবানে মন রাখা। সাধারণতঃ লোকের মন থাকে লিঙ্গ গুহ্য নাভিতে। তাঁর কৃপায় উপরে উঠতে পারে মন। চেষ্টা চাই, তারপর কৃপা। বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তিপথেও হয় জ্ঞানপথেও হয়। গোপীদের ভক্তিপথে হয়েছিল। ঋষিদের জ্ঞানপথে।

যার যা সংস্কার তাই হবে। সংস্কারের গতিরোধ করা যায় না। সত্ত্বগুণ প্রধান যাদের, যেমন ঠিক ব্রাহ্মণেরা, তাদের ফস করে হয়ে যায়। ঋষিদের রক্ত দেহে আছে। যাদের মন বিষয়ে আসক্ত নহে, পরন্তু ঈশ্বরে আসক্ত, তারাই ব্রাহ্মণ। গীতার মতে ব্রাহ্মণের আটটি গুণ — শম, দম, তপঃ, শৌচ, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য। এই গুণ যার ভিতর থাকে সেও ব্রাহ্মণ, তা যেখানেই জন্ম হউক। যাদের মন সংসার ভোগে আসক্ত তারাই শূদ্র। এই শরীরে দেরী হয় ঈশ্বর-লাভ, কিন্তু হবে সকলেরই। যাদের পূর্বপুরুষগণ ঈশ্বরের চিন্তা করেছেন অনেক, সেই বংশে জন্মালে তাদের রক্ত শরীরে থাকে। আবার যারা দীর্ঘকাল ধরে অন্য রকম সব করেছে — ব্যবসা বাণিজ্য এই সব, তাদের রক্ত গায়ে থাকলে দেরী হয়ে যায়। সত্য পালন করা শক্ত হয়। আবার এও দেখা যায় ছোলা বীজ কি করে বিষ্ঠায় পড়ে গেছে। তা থেকে ছোলাই হয়। তা দিয়ে ঠাকুর পূজা হয়। যেখানেই থাকুক না কেন সংস্কার ভাল থাকলে জেগে উঠবে। এও আছে। প্রকৃতিতে যা আছে তাই হবে। তা বলে যাদের প্রকৃতি ভাল না, তাদের কি হয় না? তাও তিনি ইচ্ছা করলে করতে পারেন। আমড়া গাছে, তিনি বোম্বাই আম ধরাতে পারেন। তবে ধরান না কেন? তার উত্তর, এত বোম্বাই আম আছে যে ধরাবার প্রয়োজন হয় না। তিনি সব করতে পারেন।

(শচীর প্রতি) প্রকৃতির জন্যই তো মনে কর, একজনকে সব জ্ঞান বৈরাগ্যের কথা বলা হলো, তবুও সে পারলো না। আর একজন ঐ কথা শুনে ধরে ফেললো। যার যেমন সংস্কার — জন্ম, কর্ম, শিক্ষা।

শ্রীম (হরেন্দ্র মাষ্টারের প্রতি) — কারো হয়তো মা বাপ কেউ নাই, অনাথ। তার কাছে বললে — ঈশ্বর সত্য, সব অনিত্য — সে ধরবে কেমন করে? ভিতরে হয়তো সংসার-ভোগের ইচ্ছা রয়েছে। আবার কেউ ছোটবেলা থেকে হবিষ্যি করছে, ব্রহ্মচর্য পালন করছে। ভোগের ইচ্ছা থাকলে ওদিকে মন যায় না। যার শেষ হয়ে গেছে ভোগ পূর্ব জন্মে, কিংবা সামান্য বাকী আছে, তাদেরই ঈশ্বরে মন যায়। যে শ্রদ্ধাবান হয় তার self-respect (ঠিক আত্মসম্মান) জন্মে — 'আমি ঈশ্বরের — সংসারের নই' এই জ্ঞান। তখন আর ভয় নাই।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ভাব মহারাজ এসেছিলেন। বললেন, 'তাঁর কথা বলুন'। আহা কত কষ্ট করে ঐ আশ্রমটি করেছেন জামতাড়ায়। তাই আমি তাঁকে বললাম, বামন-ভগবানের ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনার কথা। বলী রাজাকে বললেন, "মহারাজ, দেহ তো বরাবর থাকবে না, তাই তাঁর নাম করবো বলে স্থির করেছি। সেইজন্য ত্রিপাদ ভূমি মাত্র চাই। আমাদের ব্রাহ্মণ শরীর। তপস্যা ও ঈশ্বর-ভজন আমাদের প্রধান কর্তব্য — ঈশ্বর লাভের জন্য। তাই দেহ রক্ষার জন্য একটি ক্ষুদ্র কুটীরের আবশ্যক। দেহ বিনশ্বর। তথাপি যতদিন না এ দেহে ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে ততদিন উহা রক্ষা করা উচিত। দেহ রক্ষার জন্য আহার, বস্ত্র ও বাসস্থানের দরকার। এখানে কারোও দেহ চিরকাল থাকে না, থাকতে পারে না। যদি ঈশ্বর ভজন উদ্দেশ্য হয় তবেই দেহ রক্ষার চেষ্টা বিশেষ করে করা উচিত। ত্রিপাদ ভূমি হলেই হবে। একটি কুটীর বেঁধে তপস্যা করবো। আহা, কি কথা — দেহ থাকবে না, যত দিন আছে তাঁর নাম করা উচিত। বামনদেব করেও ছিলেন তাই। রাম অবতারে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম যাচ্ছেন, আর জিজ্ঞাসা করলেন 'এ আশ্রমটি কার?' বিশ্বামিত্র বললেন 'এখানে ভগবান বামনদেব তপস্যা করেছিলেন। বলীকে ছলনার পর তপস্যা করেছিলেন — সত্য করে নিয়েছেন কিনা জায়গা। তাই যতদিন দেহ থাকে তাঁর নাম করা।'

ললিত ব্যানার্জী ওকালতি করেন। অনেক দিন শ্রীম-র দর্শন হয় নাই। তাই আজ ব্যাকুল হয়ে এসেছেন — শরীরে জ্বর একশ এক ডিগ্রী।

শ্রীম (ললিতের প্রতি) — আহা, এতো সব জ্বর নিয়ে কেন এলেন? যতদিন না সোনা গালান হয়েছে ততদিন এটি সযত্নে রক্ষা করতে হয়, ঠাকুর বলতেন। সোনা গালান মানে ঈশ্বর-দর্শন। দুদিকেই বিপদ। বেশী যত্ন ন্যাও দেহ পেয়ে বসবে। আবার যত্ন না ন্যাও তবে পড়ে যাবে। তাই মধ্য পন্থা — golden mean.

ঠাকুর বলেছিলেন, মা তার দিয়ে শরীরটা বেঁধে দাও যাতে তোমার নাম করতে পারি।

এই দেহে আত্মার নিবাস তাই যত্ন নেওয়া এই আত্মার দর্শনের জন্য। আত্মদর্শনের পর যদি শরীর থাকে তা প্রারব্ধ ভোগের জন্য, অথবা লোকশিক্ষার জন্য ভগবান রেখে দেন।

হঠাৎ শ্রীম-র কথাস্রোত বন্ধ হইল — কর্ণে মন সংযোগ করিয়াছেন। ভক্তগণ শুনিলেন পাশের ঘরে অরুণ হারমোনিয়ামে গান গাহিতেছে। অরুণ শ্রীম-র পৌত্র, বছর পনর বয়স, গন্ধর্ব কণ্ঠ।

গান ঃ বিকল্প বিহীন সমাধি মগন,
ব্রহ্মে চিরদিন আসন তোমার।

৪-৬-১৯২৩

২

মর্টন ইনস্টিটিউশানের অফিস ঘর। শ্রীম ও একজন শিক্ষক সামনাসামনি চেয়ারে উপবিষ্ট। এখন সাড়ে ন'টা। কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (শিক্ষকের প্রতি) — আপনি কোন্ গাড়ীতে মিহিজাম গিছলেন, ক'বার গিছলেন?

শিক্ষক — আপনার যাবার ইচ্ছা আছে কি?

শ্রীম — না, কিছুই স্থির নাই। আবার গেলাম, কোথাও কিছু নাই, ফস্ করে হয়ে গেল। তীর্থস্থানে কিন্তু খুব ভাল। ওখানেও ভাল

তবে তীর্থস্থানে সব সময় উদ্দীপন হয়। তৈরী জিনিষ আছে। কিন্তু ওখানে করে নিতে হয় সব। যেমন আপনারা কেউ পূজা করছেন, কেউ ফুল তুলছেন, কেউ পাঠ করছেন, কেউ জপধ্যান করছেন। এসব না থাকলে উদ্দীপন হয় না — এসব চাই। তীর্থস্থানে নিজেদের কিছু করতে হয় না। এসব সবই তৈরী পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ ঠাকুর রয়েছেন — তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আর কত সব ভক্ত দেশ-দেশান্তর হতে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসে, এঁদের দর্শনে। পুরীতে খুব ভাল। খাওয়ারও ভাবনা নাই। সবই প্রসাদ পাওয়া যায়। আপনারা পুরীতে খেতেন কী?

শিক্ষক — মহাপ্রসাদ। সকালে বাল্যভোগের প্রসাদী মিষ্টি, দুপুরে সত্র ভোগের প্রসাদ, রাত্রেও তাই। পাণ্ডারা সব এনে দিয়ে যেতো। শুধু দুধ আর কলা বাজার থেকে কেনা হতো। কলা প্রচুর পাওয়া যায়। একজন বীরভূমের বৃদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। বয়স ষাট হবে, বানপ্রস্থী। একটা আশ্রমে থাকেন — কিছু দেন ওখানে। তারা সব প্রসাদ খেতে দেন। সারাদিন দর্শন, সৎসঙ্গ ও পাঠাদি করেন। আমাকে স্কন্দপুরাণ থেকে পুরুষোত্তমক্ষেত্র মাহাত্ম্য সমস্ত শুনিয়েছেন।

শ্রীম — আমিও তাই চাইছি। একটা সুবিধা করে দিন ঐরূপ। কিছু দিয়ে দেওয়া গেল আর তৈরী প্রসাদ পাওয়া গেল। ওসব খাওয়ার হেঙ্গাম থাকলে বড় ঝঞ্ঝাট — ওসব না থাকা ভাল। দুটি দুটি প্রসাদ খাও, আর দর্শন কর, চিন্তা কর। জগন্নাথ দর্শন, আরোও কত দর্শন রয়েছে। কত ভাল ভাল সাধু, আবার চৈতন্যদেবের লীলাস্থলসমূহ। আর সমুদ্র দর্শন হবে — 'সরসামস্মি সাগরঃ' (গীতা ১০/২৪), চারদিকেই উদ্দীপনার বস্তু। ওখানে আগুন সর্বদা জ্বলছে, পোয়ালেই হলো।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি ছাত্র গৃহে প্রবেশ করিল।

শ্রীম (ছাত্রের প্রতি) — শোন, শোন। মন দিয়ে পড়াশোনা করো। কি বল? মন দিয়ে পড়া উচিত, নয় কি?

'মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবো', এই কথা বলিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল।

শ্রীম (শিক্ষকের প্রতি) — ছেলেটির বাপ খুব ধনী। সেদিন এসেছিলেন। গাড়ী আছে। কিন্তু ছেলেরা ওঁর কোনও কথা শোনে না। এখানে এয়েছেন, তা আমায় বললেন, 'মশায় ওদের বলবেন না'। বললে হয়তো ওরা ধমকাবে — ও লাগাতে যাওয়া হয়েছিল, এই বলে। কিছু বললেই, ছেলেরা উত্তর করে 'তুমি কি জান এসব'!

(সহাস্যে) আহা, এই লোকটি perfect gentleman (খাঁটি ভদ্রলোক)। বিলেতে কোর্টে মামলা হচ্ছে। উকীল বলছে, 'এ ব্যক্তি gentleman (ভদ্রলোক) তিনি এ কাজ করেন নাই, করতে পারেন না।' জজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকে আপনি gentleman (ভদ্রলোক) বলেন?' উকীল উত্তর করলো, 'যার গাড়ীঘোড়া আছে।' (উভয়ের উচ্চহাস্য)।

বাবা আমায় বললেন, 'ভাবছি হরিদ্বারে যাব। আমার অনেক আলাপী লোক আছে মারোয়াড়ী। তারা বলছে, 'যাওনা আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি।' আমিও বললাম যান না এমন সুবিধা আর অমন স্থান! ওদের ছাড়বেন কেন? কুণ্ডলীর ভিতর না থেকে বার হয়ে এদের দেখুন না! দেখতে তো আর বারণ নাই। অমন স্থানে সুবিধা হয়ে গেছে থাকার, যান না! একবার গিয়ে দেখে আসুন না। আর কি কার্য, ভগবানকে ডাকার জন্য যাওয়া। ওখানে হিমালয়, গঙ্গা, সৎসঙ্গ, সব আছে। যান দিনকতক থেকে দেখে আসুন।'

বললাম বটে, তা কি হয়? এমন মায়ার ফাঁদে পড়েছে। এ যে মায়াতে পড়ে এসব করছে। ছেলের মায়া ছাড়তে পারছে না। গানে আছে ঃ

বিল কেটে ঘুর্ণী পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
যাতায়াতের পথ আছে, তবুও মীন পালাতে নারে॥
গুটীপোকায় গুটী করে পালালেও পালাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী আপনার জালে আপনি মরে॥

শ্রীম (শিক্ষকের প্রতি) — এই ভদ্রলোক এইরূপ আপনার রচিত জালে আপনি পড়ে গেছেন। এঁর কথা যখন হচ্ছিল, তখন শু-বাবুর কথা মনে হচ্ছিল। ইনিও এমনি মায়াতে পড়েচেন। কারুকে মুখের কথাটি বলতে পারেন না। অত লোক, কেউ কথা শুনে না। ছেলেরা অবাধ্য। মায়াতে এসব করাচ্ছে।

'চণ্ডীতে এইরূপ একটি গল্প আছে একজন (সমাধি) সংসারে বিরক্ত হয়ে বনে তপস্যা করতে গেল। সেখানে গিয়েও স্ত্রীপুত্রের কথা ভাবছে। এরা কিন্তু একে দেখতে পারে না। তবুও সে তাদের কথা অহর্নিশ ভাবছে। তখন একটি সাধুর সঙ্গে দেখা হলো। সাধু বললেন, ঈশ্বর চিন্তা কর — এসব চিন্তা ছেড়ে দাও।' তা পারে না। বললে, মশায় আমার হৃদয় মন ওদের চিন্তায় পূর্ণ। ঈশ্বর স্থান পাচ্ছেন না ওখানে! ভাবছি ওরা কেমন আছে, সম্পত্তি রক্ষা করতে পারছে তো। সাধুটি বললেন, এ মহামায়ার খেলা। তুমি তাঁর শরণ লও, তবে যাবে। তারপর সাধুর উপদেশে তপস্যা করে দেবীর দর্শন লাভ করেন। তখন আর ওসব চিন্তায় অনিষ্ট করতে পারে নাই। দেবী বর চাইতে বললেন। ভক্তটি উত্তর করলেন — তোমাকে চাই আর কিছু চাই না। 'আর ভুলালে ভুলব না মা, দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ', ঠাকুরের গানে আছে। মহামায়ার এমনি কাণ্ড, সব গুলিয়ে দেয়। তাই ঠাকুর প্রার্থনা করতে বলতেন, 'ভুলাইও না, মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলাইও না।' তাঁর দেখা পেলে অন্য সব কাজ ভুল হয়ে যায়। ঘড়ির পেণ্ডুলাম্ — এদিকে যতটা যাবে, ছেড়ে দাও অন্যদিকেও ততদূর যাবে।

এখন সন্ধ্যা সাতটা। শ্রীম ভক্তসঙ্গে দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে উপবিষ্ট। ছোট নলিনী ভাগবত পাঠ করিতেছেন — জয়-বিজয়ের উপাখ্যান। শ্রীম উঠিয়া গেলেন, বারান্দায় একটি ভক্তসঙ্গে নিভৃতে কিছু কথা কহিলেন। ভক্তটি তারপর হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হইলেন। শ্রীম-র দৌহিত্র গোপেন বৈদ্যনাথ যাইতেছেন। পুত্র প্রভাসবাবু ওখানে আছেন। রাত্রি এখন সাড়ে নয়টা। শ্রীম দোতলার বারান্দায় হাই

বেঞ্চে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটি বিড়ালছানা। উহাকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তকে বলিতেছেন, 'দেখুন, কোথাও কিছু নাই, মাঝখান থেকে ও এসে হাজির। কি করে এলো তাই ভাবছি। এরই ভিতর নিজেকে রক্ষা করে চলছে। ভগবান এর জন্য পূর্ব থেকে সব যোগাড় করে রেখেছিলেন, খাবার টাবার। তাঁর ব্যাপার বোঝবার সাধ্য কার! সব তিনি করছেন। এই দেখুন না, জাপানের Premier (প্রধান মন্ত্রী), বাড়ির সব লোক গেল মরে, শুধু উনি বেঁচে রইলেন। উঠোনে দাঁড়িয়ে কেবিনেট মিটিং করলেন আগের দিন। পরের দিন সব শেষ — tidal wave (সমুদ্রের বান) এসে সব নিয়ে গেল ভাসিয়ে। দুঃখ ভোগ করতে রইলেন একা। এসব দেখেও কি আমাদের চৈতন্য হয়! মানুষের জীবন এই পঞ্চাশ ষাট বছর। এতে আমরা খুব একটা কিছু ভাবি। কিন্তু অনন্তের সঙ্গে কিছুই না। অনন্ত জীবনের কথা ভাবে কৈ লোক? এই কয় বছরের কথাই ভাবছে। এই সব বিপদ দেখেও চৈতন্য হয় না। অনন্ত জীবন লাভের চেষ্টা করলে, এই ক্ষুদ্র জীবনের সুখদুঃখ তত জব্দ করতে পারে না। অনন্তজীবন মানে ঈশ্বর। এতো বিপদেও কি প্রিমিয়ারের চৈতন্য হলো? এতিমখানা ভেঙ্গে গেলে দিন কয়েক লোক হা হুতাশ করলে। তারপর সব ভুলে গেল। জাপানে যা হয়ে গেল এর কাছে উহা কি? এও ভুলে যাবে লোক। এমনি মহামায়ার মায়া। এ যা হলো recorded histroy of the worldএ (পৃথিবীর ইতিহাসে) এরূপ ঘটনার কথা দেখা যায় না। লোকের চৈতন্যের জন্য ঈশ্বর মাঝে মাঝে এরূপ করেন। দু'চারজনের চৈতন্য হয়। অন্য সব লোক ভুলে যায়। ঠাকুর বলেছিলেন মৃত্যুস্তূপে বসা; এই ঘটনায় তাই দেখাচ্ছে। মানুষ সব মৃত্যুর ছাপ কপালে নিয়ে ঘুরছে। নিজের ছাপ দেখতে পাচ্ছে না। অপরেরটা দেখেও ভুলে যাচ্ছে। পাঁচ লাখ মৃত্যু একসঙ্গে — এ দেখেও চৈতন্য হচ্ছে কৈ?

৭-৯-২৩

৩

শ্রীম দ্বিতলের ঘরে বসা। বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী বিদ্যা-চৈতন্য আসিয়াছেন। শ্রীম-র সঙ্গে ইনি বিদ্যাপীঠের সম্বন্ধে বিবিধ বিষয় পরামর্শ করিতেছেন। আজ শনিবার, তাই বহু ভক্ত সমাগম। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা — কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — খুব নির্জন স্থান বৈদ্যনাথ, আবার ঠাকুর আছেন। আর সাধুরা সব আছেন। খুব serious (কঠোর) সাধু সব, সব দিকে সমান। আহা, ঐসব স্থান উদ্দীপনের জায়গা। ওবারে মিহিজাম আড্ডা করা গিছলো, এবারে এদের এখানে করা যাবে। (ভক্তদের কারু কারুকে দেখাইয়া) এরা সব সঙ্গে ছিলেন। তাঁর কৃপা কত দেখুন না কেন? এই সাধুদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন! আমাদের চৈতন্য হবে বলে এঁদের দেখে। সর্বদা ভুলিয়ে দেন — আবার কৃপা করে সাধুদেরও পাঠান। বন্ধন ও মুক্তি দুই-ই রয়েছে। সাধুদের দেখলে মনে হচ্ছে — এঁরা, ঈশ্বর সত্য সংসার মিথ্যা, এটা জেনে সংসার ছেড়ে তাঁকে নিয়ে আছেন। কি life (জীবন) এঁদের যেন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে! চব্বিশ ঘন্টা তাঁর চিন্তা করছেন। দেহের দিকে লক্ষ্য নাই, কিসে তাঁকে লাভ হয় সেই চেষ্টা। কখনও সেবা করছেন, কখনও ব্রত উপবাস, কখনও মন্দিরে যাচ্ছেন, কখনও জপধ্যান — যে যা বলছে তাই করছেন। সংসারের লোক অর্থের জন্য করছে। এঁরা তাঁকে পাবার জন্য এ সব করছেন। তাইতো এঁদের দেখে এত উদ্দীপন — যেন খাপ খোলা তরোয়াল সব। উঠে পড়ে লেগেছেন — মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

মোহন বেদান্ত সোসাইটির স্বামী অভেদানন্দজীর লেকচার নোট পড়িয়া শুনাইতেছেন। আজ প্রশ্নোত্তর ক্লাশ।

প্রশ্ন — সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ — এগুলি কি বস্তু? স্বামীজী বলেছেন material elements (ভৌতিক পদার্থ), গীতায় আছে 'গুণ' — বুঝতে পারা গেল না।

স্বামী অভেদানন্দজী — 'গুণ' আর matter (জড় বস্তু) আলাদা

নয়। Substance বা solid (জড় বা কঠিনঘন) বলে কোন জিনিষ নাই। এক্সরে (X-Ray) দিয়ে দেখলে, দেখতে পাবে তোমার হাত বলে কিছু নাই — bones আর dewy matter (অস্থি আর শিশিরবৎ পদার্থ) দেখা যায়। আর চারদিকে ঘুরছে ইলেকট্রন (electron) — এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল এক সেকেণ্ডে। এই বেগেই সূর্যের আলো নয় মিনিটে পৃথিবীতে পৌঁছায়। অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে দেখতে পাবে ইলেকট্রন সব ঘুরছে atom-এর (পরমাণুর) চারদিকে। ইলেকট্রন এক হাজার ভাগে বিভাগ করা যায়। তার আবার ওজন বের করেছে ওরা।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ vibrations of electrons (পরমাণুর তরঙ্গ বিশেষ)। এই ঘরে একটা পেণ্ডুলামকে যদি সাতশ' বিলিয়ন বার আরো অধিক বেগে চালাতে পার, তবে হবে violet colour (বেগুনী রং)। চারশ' হলে হবে red (লাল)। বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন ভায়লেট উপরের রং, 'রেড' নিচের। একটাকে সত্ত্ব, আর একটাকে তমঃ বলতে পার। আর মাঝের পাঁচশ থেকে ছ'শকে রজঃ বলা যায়। তোমরা করছ কি? 'ইলেকট্রনবাদ' যে বের করেছে তাঁর বয়স মাত্র আঠার বছর, নাম জে.জে. টমসন। গত যুদ্ধে শরীর গেছে। বেঁচে থাকলে আরোও কত করতো। টমাস্ এডিসন বের করেছেন, গ্রামোফোন, ইলেকট্রিক বালব। গ্রামোফোন মানে স্বরের ফটো। আমি গিছলাম তাঁর ল্যাবরেটরীতে। বসে যখন problem solve (সমস্যার সমাধান) করেন তখন আহারনিদ্রা ভুলে যান। পেছন দিয়ে একজন খাবার দিয়ে যায় সকাল, দুপুর, রাত্রিতে। ইচ্ছা হলে খাবেন নয়ত পড়ে থাকে। দেখলাম দু'বারের আহার টেবিলে পড়ে আছে। হুঁস নাই। ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। মাঝে মাঝে চোখ খুলে পেন্সিল নিয়ে কি টুকছেন। এখন তিনি এমন একটা delicate (সূক্ষ্ম) যন্ত্রের উন্নতি করছেন যা দ্বারা স্পিরিটকে এনে কথা কওয়া যাবে।

আজকাল আবার, thought-এর (চিন্তার) ফটো হচ্ছে। তুমি হয়তো মনে মনে ভাবছো 'গোলক'। তোমার কপালে একটা প্লেট

রেখে দিবে, এটাতে ঐ দাগ হয়ে যাবে।

একবার সানফ্রান্‌সিস্‌কো থেকে গাড়ীতে যাচ্ছি। যাত্রীর লিষ্ট-এ আমার নাম দেখতে পেয়ে একটি বৃদ্ধ আমার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। ইনিও ঐ গাড়ীতে যাচ্ছেন — mineralogist (খনিজ পদার্থবিশারদ)। বৃদ্ধলোক, আবক্ষ দাড়ি। আমায় বললেন, তোমাদের দেশে কপিলের সঙ্গে সঙ্গে একজন greatest scientist-এর (শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতমের) অন্তর্ধান হয়েছে। কপিলের প্রকৃতিতত্ত্ব, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ — গুণ বিভাগ কি গভীর, কি সুন্দর! আমি তো শুনে অবাক্। এই সম্বন্ধে একখানা বই লিখতে আমি অনুরোধ করলাম। পরে লিখে পাঠিয়ে দিছলেন। আমার নিকট আছে এর manuscript (পাণ্ডুলিপি)। এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভারতের সেবায় দান করেছেন। Diagram (চিত্র) করে সব বুঝিয়েছেন। তিনি তখন জাপান সরকারের নিমন্ত্রণে ওদেশে যাচ্ছিলেন। খনি কোথায় আছে — কিসের খনি, দু'হাজার ফিট নিচে থাকলেও বলে দিতে পারেন।

T.N.T. explosive Force (টি, এন, টি, নামীয় বিস্ফোরক আগ্নেয়াস্ত্র) গত যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। এইটুকুতে শহরটা উড়ে যায়। আজকাল বৈজ্ঞানিকরা ব্যস্ত কি করে atom-এর (পরমাণুর) explosive force (প্রদাহ শক্তি) বের করবে। পূর্বে atom পর্যন্ত ছিল। এখন কত এগিয়ে গেছে ইলেকট্রন। আরো কত যাবে। শেষে দেখবে সব শূন্য মানে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। হেকেট ইদানীং মারা গেছেন। তাঁর 'দি রিডল অব দি ইউনিভারস্' গ্রন্থে বলেছেন — সবের শেষ অদ্বৈত।

Invention (আবিষ্কার) কখন হয়? ভাবতে ভাবতে Consciousness (অন্তদৃষ্টি) যখন খুলে যায়। যে জিনিষ বের করবে, মনে পূর্ব থেকে তার ছাপ পড়ে যায়। বের যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পাগলের মত হয়ে যায়। মনের দরজা খুলে যায়। আবার বদ্ধ হয়ে যায়। ফাঁক দিয়ে যে ray (কিরণ)-টুকু আসে তাই নিয়ে এতো আলোচনা — এর নাম invention (উদ্ভাবন)।

তোমরা নিজেরা চিন্তা কর। অপরের টীকা পড়ে দেশ অধঃপাতে গেছে। ব্রহ্ম, মায়া — এ সব বেদান্তের উচ্চ তত্ত্ব সায়েন্স না পড়লে ভাল বুঝতে পারা যায় না। এসব পড়, চিন্তা কর, বিচার কর। ব্রহ্ম ও মায়া পরমহংসদেব একটি সোজা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছিলেন। ব্রহ্ম যেমন সাপ-কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে রয়েছে। মায়া — যেমন সাপ চলছে। তিনি সায়েন্স জানতেন না, কিন্তু অনুভূতি ছিল। তাই অত সোজা করে বলেছেন। এমন সোজা করে আর কেউ বলতে পারেন নাই।

৪

প্রশ্ন — মুক্তির পর মানুষ-জন্ম হয় কি?

স্বামী অভেদানন্দ — পরমহংসদেব বলতেন দুই থাক্ লোক আছে। এক থাকের লোক সাধন ভজন করে এত উঁচুতে উঠে যে নিচের কথা, জগতের কথা সব ভুলে যায়। আর এক থাক্ লোক আছে। ওরা ঐরূপ উঁচুতেও ওঠে, আবার নিচেও নেমে আসতে পারে লোকশিক্ষার জন্য। তাঁদের জগতের কল্যাণ করার আকাঙ্ক্ষা থাকে। কোনও কারণ নাই এর — ঈশ্বরেচ্ছা। এঁদের বলে ঈশ্বর কোটি। বৌদ্ধ মতেও দুই থাক্ বুদ্ধ আছে — প্রত্যক্-বুদ্ধ আর অবতারী-বুদ্ধ। প্রথম থাক ভাবে, নিজের হলেই হলো। দ্বিতীয় থাক্ জগতের কল্যাণের জন্য থাকেন, নিচে ফিরে আসেন। এঁরা উদার।

ঠাকুর একটা parable (গল্প) বলতেন। একটা জায়গায় খুব জঙ্গল। সেটা একটু উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। উঠবার জো নাই। সব লোকে জমা হয়ে ঠিক করলে একজনের কাঁধে অপর একজন আরোহণ করে এর উপর উঠবে। তাই করা হলো। যে ব্যক্তি প্রথম প্রচীরের উপর উঠলো, সে আনন্দে হাসতে হাসতে অপরদিকে পড়ে গেল। তারপর আরোও দু-একজন ঐরূপ করলে। তারপর আর একজন উঠলো। ঐদিক দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো— কত হাসি, কিন্তু পূর্বের লোকদের মত ঐদিকে না পড়ে—এদিকে নেমে

এলো। আর সকলকে ডেকে বললে, 'আনন্দ পেতে চাও তো উপরে ওঠ।' ইনি অবতার, ঈশ্বরকোটি — এঁর শক্তি বেশী। নিত্যমুক্ত, নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটিগণ জগতের কল্যাণের জন্য মানুষ জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন — মানুষজন্ম হয় কেন?

উত্তর — সংস্কারের জন্য, কর্মফল ভোগের জন্য। পাপ পুণ্য সমান হলে মানুষ হয়। আবার এ জন্মেই মুক্তি হয়, অন্য শরীরে তা হয় না। এ শরীরে পূর্বে কর্মফলের ভোগ হয়, আবার নূতন কর্ম অর্জনও হয়। অন্য শরীরে শুধু কর্মফল ভোগ হয় মাত্র, অর্জন হয় না। মানুষদের মধ্যেও কেউ আসে ঈশ্বরের লীলার সহায়তার জন্য। সে উপলব্ধি হয় যখন বুড়ি ছোঁয়া হয় — ঈশ্বর-দর্শন হয়। যারা বুড়ি ছুঁয়েছে তাঁদের মনে হিংসা-দ্বেষ, জয়-পরাজয়, লাভালাভ — এ সব দ্বন্দ্ব থাকে না। সমদর্শী হয়ে যায়, একভাব আছে — ঈশ্বর। তখন নিজেকে যন্ত্র ঈশ্বরকে যন্ত্রী দেখতে পায়।

মানুষ যখন তাঁকে ভুলে যায় তখন কখনও তাকে খুব বিপদে ফেলে দেন। এতে তাঁর দিকে টেনে নেন। বাইরে দেখতে বিপদ কিন্তু শেষ ভাল। জাপানের কথা যা বললে এও তাঁর কাজ। পাঁচ লক্ষ লোক একেবারে নাশ হয়ে গেল — tidal wave-এ (সমুদ্রের বানে)। এ দেখে এদের মধ্যে যারা চিন্তাশীল তারা ঈশ্বরের দিকে মন দেবে। বড্ড ফেঁপে গিছলো জাপান। ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতো, আর তার জন্য দিন দিন materialist (জড়বাদী) হয়ে গিছলো। নিজেদের সভ্যতা সংস্কৃতি ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। তাই ঈশ্বর এ কাণ্ডটা করে এদের মোড় ফিরিয়ে দিলেন। Worldly view-তে (জাগতিক দৃষ্টিতে) খুব অনিষ্ট হয়েছে। যুদ্ধে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে) ফ্রান্সের যা ক্ষতি হয়েছে, কয়েক মিনিটে টোকিয়োতে তাই হয়ে গেল। অন্যভাবে দেখলে, কে কাকে মারে? আত্মার জন্মও নাই মরণও নাই!

তোমরা নিজকে নিজে ভুলে রয়েছো, তমোতে আচ্ছন্ন হয়ে

আছ। তমোকে দূরে ঝেড়ে ফেলে দাও — রাজসিক হও। বাংলা দেশটা তলিয়ে যাচ্ছে, চেষ্টা কর উঠবে। বাংলাই জগতের মুখ উজ্জ্বল করবে। এ যুগের ধর্ম কর্মযোগ। কর্ম কর মন ঈশ্বরে রেখে। কর্ম না করলে রজঃ আসবে না। সেইজন্য কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছে সব। দাসভাব তোমাদের মনকে ঘিরে রেখেছে। দাসের কি সুখ? ঐ ভাব ছাড়। Ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) আনতে চেষ্টা কর। Young man must have ambition (প্রত্যেক যুবকের অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত)। সুনাম, সুযশ, ধনদৌলত এ সবের আকাঙ্ক্ষাই উচ্চাকাঙ্ক্ষা — ambition এসব ভোগ করে যখন দেখবে এতে সুখ নাই, ভোগের শেষ নাই, তৃপ্তি নাই, তখন শান্তির চেষ্টা হবে। তখন aspiration (ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা) আসবে। তাঁকে লাভ করার চেষ্টা আসবে। অনেকের আবার ছেলেবেলা থেকেই aspiration (ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা) আসে। তাদের বুঝতে হবে পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা করা ছিল। ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করে এসেছে। কি দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশে দুপুরটা কাটিয়ে দেয় ভুঁড়ি কাত করে ঘুমিয়ে। দিনকে রাত করে তুলেছে। বরং ফুটবল খেল, সেও ভাল। তমো থেকে রজঃ-তে ওঠ, পরে সত্ত্বে যাবে।

প্রশ্ন — Ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) থাকলে কর্ম নিষ্কাম হবে কি করে? সুখ শান্তিলাভ বাসনায় যদি ঈশ্বরকে ডাকা যায়, উহা সকাম নয় কি?

উত্তর — Ambition-ও (উচ্চাকাঙ্ক্ষাও) থাকবে, আবার ফলও ঈশ্বরে অর্পণ করবে। অর্জুনকে এই কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন — খাও দাও, যা কিছু কর, সব কর্মফল আমাতে অর্পণ কর। যুদ্ধ কর, তাও রাজ্যলাভের জন্য নয় — আমার কাজ ভেবে কর। ছুটোছুটি করে ট্রামও ধরতে হবে, চাকরীও রাখতে হবে। যখন এসব শেষ হয় তখন রাত্রে শোবার আগে একবার না হয় বল, 'ঠাকুর যা করেছি তার ফল চাই না — সব তোমার।' প্রথম মৌখিক বলতে হয়, পরে আন্তরিক হয়।

শান্তি সকলেই চায়। যে কাজ করলে শান্তি লাভ হয় তাই কর। বিষয়ের দেওয়া শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। এটা বুঝতে পারলে তখনই শান্তির খনি ঈশ্বরে মন যাবে। ঐ শান্তি কখনও নষ্ট হয় না — জন্ম জন্ম সঙ্গে থাকে যতদিন না তাঁকে লাভ হয়। তখন পরম শান্তি। এইটি লাভই উদ্দেশ্য মানুষ জীবনের। সবাইকে এটি লাভ করতে হবে একদিন। পুণ্য কাজ দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু তা থেকে পতন আছে — তখন আবার অশান্তি। চির শান্তি, চির সুখ লাভ — ঈশ্বরলাভ বাসনা কামনার মধ্যে নয় তাই ঠাকুর বলতেন। যেমন মিছ্‌রী, মিষ্টির মধ্যে নয়। এতে অম্লশূল সারে, অন্য মিষ্টিতে বাড়ে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — লোকশিক্ষা যারা দিবে তাদের অত সব জানতে হয়। দেখ কত জানতে হয়েছে। তবে তো ওদেশে (পাশ্চাত্যে) কাজ হবে। না জানলে কি করে ওদের ভাষায় ওদের ভাবে কথা বলতেন। কিন্তু শেষে ঐ ঈশ্বর লাভ জীবনের উদ্দেশ্য বলেছেন। যে যেভাবে বোঝে, সেইভাবে বোঝাতে হবে তাকে — নচেৎ কাজ হবে না। শুধু নিজের জন্য হলে 'রাম রাম' করলেই হয়ে যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন পথ। কাল ভাগবত পড়া হচ্ছিল, জয়-বিজয়ের কথা। সনকাদি ঋষিরা ভগবানের স্তব করছেন, 'তুমি না থাকলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব কোথায়?' ব্রহ্মাকে যে জানে সে ব্রাহ্মণ। তাঁরা জেনেছিলেন তাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য। সকলকেই এটি হতে হবে আগে আর পরে।

শ্রীম — বিচারের দিক দিয়ে দেখলেও বোঝা যায়, ভগবান লাভই মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য। নচিকেতা তাই বলেছিলেন যমকে, 'আমাকে আত্মজ্ঞান দাও।' অন্য বস্তু নিতে যম প্রস্তাব করলে, বললেন — 'ওসব যে থাকবে না; আপনি সব বিনষ্ট করে দিবেন।'

এই অবিনশ্বর বস্তু লাভের জন্য নশ্বর বস্তু প্রয়োজন। যতটা না হলে নেহাৎ নয় ততটা ন্যাও। বেশী হলেই আটকে পড়বে। এটি যদি কারোও মনে থাকে তবে তো সে ব্যক্তি অর্ধজীবন্মুক্ত। সংসারে তার কোন বস্তুর অভাব বোধ হবে না। এই অভাববোধ অনন্ত দুঃখের

কারণ, এটাই জন্মমরণচক্রে ফেলে দেয়। দেহ ধারণের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা নেওয়া।

ঠাকুর একজন ভক্তকে বলেছিলেন, ‘অধিক উপার্জন করতে পার যদি ঈশ্বর সেবা, সাধুভক্তের সেবার জন্য হয়।’ পাণ্ডবগণ রাজ্য সেবাও করলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর সেবাও করলেন। আবার অন্তে ঈশ্বর লাভ করলেন। নিষ্কামভাবে সব করেছিলেন কিনা তাই! নিষ্কাম মানে সব শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে, তাঁর আদেশ নিয়ে করেছিলেন, তাই বদ্ধ না হয়ে মুক্ত হলেন অত কর্ম করেও। ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি চিহ্ন অভাববোধ কমা।

কলিকাতা। ৮ই সেপ্টেম্বর, ২৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ,
২২শে ভাদ্র, ১৩৩০ সাল। শনিবার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘আমার চিন্তা করবে যে, আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে সে’

১

আজ সকালে মর্টন স্কুলে ‘সৎপ্রসঙ্গ সভা’। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র আলোচনা হইতেছে। শিক্ষক ও ছাত্রগণ অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা করিলেন। শ্রীমও সেখানে উপস্থিত। তিনি একটি যুবক শিক্ষককে ‘পরিত্রাণায় সাধূনাম্’ (গীতা ৪/৮) — শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের এই দিকটির বিষয় বলিতে বলিলেন। শিক্ষক বলিলেন, সাধু ও ভক্তগণের উদ্ধার অবতারের প্রধান কাজ। তিনটি উদ্দেশ্য তাঁর আগমনের — প্রথম সাধুদের পরিত্রাণ, দ্বিতীয় দুষ্টের বিনাশ, আর তৃতীয় — ধর্ম-সংস্থাপন। এই তিনটি কার্যের মধ্যে প্রথম আর তৃতীয়টি ধর্মসংস্থাপন কার্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাধুদের দ্বারাই ধর্মসংস্থাপন করান। অবতার এসে একটি ক্লাশ সৃষ্টি করেন, তাঁরা তাঁর বাণী প্রচার করবেন আর নিজ জীবনে পালন করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এদের মধুমক্ষিকার সঙ্গে তুলনা করতেন। ‘মধু’ অর্থাৎ ঈশ্বরীয় রস ছাড়া, এঁরা বিষয়রস গ্রহণ করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসায় ব্যাসাদি ঋষিগণ স্বচ্ছন্দে ধর্ম অর্থাৎ তাঁর ভাব জগতে প্রচার করতে পেরেছেন। তাঁরা পূর্বে তাঁকে জেনেছেন সাধন-ভজন করে। তবে তাঁর আদেশ নিয়ে প্রচার করেছেন। সাধকদের শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, শরীর ধারণ করলে সকলকে কাজ করতে হবে। অলসের ধর্ম হয় না। এই সব কাজের ফল আমাতে সমর্পণ কর। সাধনভজন এ-ও কাজ, সংসারীদের দান, ব্রত, জীবিকা অর্জন এ-ও কাজ। সবের ফল তাঁকে দিয়ে দেওয়া। অর্জুনকে লক্ষ্য করে এই কথা বলেছিলেন। আর বলেছিলেন, আগে আমার চিন্তা — তারপর যুদ্ধ অর্থাৎ অপর কাজ। আগে অন্য সব, তারপর আমার চিন্তা নয়। যাদের হৃদয়ে এইভাব দৃঢ় হয়েছে তারাই সাধু।

ঘরে থাকলেও সাধু। ঘরে থেকেই ওরা সর্ব কার্যে তাঁর ভজন করেন। সাধু ভক্তরা বুঝেছেন, ঈশ্বর দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য। সেইজন্য তাঁর শরণাগত হয়ে তারা থাকেন যেখানেই তিনি রাখুন। সাধু ভক্তদের মুক্তির উপায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ' (গীতা ১৪/৬৬) — একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। ঠাকুরও বলেছেন, 'আমার চিন্তা করলেই হবে।' 'আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।' জ্ঞান ভক্তি লাভই মুক্তি। ইহাই সাধুদের পরিত্রাণ।

আজ ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খৃঃ অঃ; ২৪শে ভাদ্র, ১৩৩০ সাল সোমবার। এখন সকাল সাড়ে আটটা। শ্রীম গোল টুলে বসিয়া আছেন — তিনতলার প্রভাসবাবুর ঘরে। রাজমিস্ত্রিরা কাজ করিতেছে তাহা দেখিতেছেন। একটি ভক্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইনি বেদান্ত সোসাইটিতে ধর্মকথা শুনিতে যান। তাঁহাকে শ্রীম বলিতেছেন, "আপনাকে ওখানে যেতে বলি আপনার উপকার হবে বলে। আমায় ঠাকুর এমন করে দিছলেন, সাত আট ঘণ্টা শুনছি তাঁর কথা, তাঁকে watch (পর্যবেক্ষণ) করছি, রাত্রিতে বাড়ি এসে সব লিখছি, সব মনে থাকতো। পর পর এসে যেত লিখবার সময় সব কথা। একদিনে সব হতো না — ক্রমে মনে আসতো। এমনি দাগ লাগিয়ে দিতেন। আর পাঁচ বছর লিখছি কেউ জানতো না। এই পাঁচ বছরই তাঁর লীলা প্রকাশের সময় ছিল। কালী মহারাজ শেষ বৎসর তাঁর কাছে এসেছিলেন। এক বছর কম কি! একদিন দেখলেই রক্ষা নাই, তা এক বছর থাকা! এতে আপনি কি benefited (উপকৃত) মনে করেন না?

ভক্ত — উপকার হচ্ছে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে গোলমালও হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীম — সব কি আর মিলে! সকলের ধাত কিছু এক নয়। বিভিন্ন প্রকৃতি। ঠাকুর বলতেন, 'চিনিতে বালিতে মিশান থাকে, পিঁপড়ে হয়ে শুধু চিনিটুকু নেবে।' সবতো আর চিনি নয়, হতেও

পারে না। কিন্তু তাঁর, ঠাকুরের কথা সব চিনি, মিছরী আরো কত কি! তাঁর একটি কথাও ফেলবার যো নাই। সামান্য একটা কথাও কত গভীর অর্থপূর্ণ। সমাধির পর বলেছিলেন, 'ছাতাটা আনতো।' এরও মানে আছে। সমাধিবান্ পুরুষ — মুহুর্মুহুঃ সমাধি, কিন্তু এদিকেও কত হুঁস। একটি আদর্শ জীবন। ওদিকে যেমন এদিকেও তেমন। অপ্রমত্ত গভীর মনোযোগ। অবতারাদির হয় পূর্ণ অন্যদের খানিকটা হয়। শ্রীকৃষ্ণের দেখ, যুদ্ধের খুঁটিনাটি পরামর্শ দিচ্ছেন, সব চাল বাতলে দিচ্ছেন, আবার এরই মধ্যে সমাধিস্থ — গীতা বলছেন। এই দিকটাকে লক্ষ্য করেই স্বামীজী বলেছেন, In the midst of intense activity, intense calmness (মহা কর্ম-প্রবাহের ভিতর থাকিয়াও সমাধিস্থ)। এ দু'দিক যাঁদের আছে তাঁরাই আদর্শ যেমন শ্রীকৃষ্ণ, ঠাকুর। ভক্তরা ছাতাটা বাইরে ফেলে এসেছিল। ঘরে এসেই ঠাকুরের সমাধি। তারপর নিচে নেমে এসে ঐ কথা বলেছিলেন। আর বলেছিলেন, 'এখানকার পোঁদের কাপড় ঠিক থাকে না (মানে সমাধিস্থ); কিন্তু অত ভুল হয় না! ছাতাটা ফেলে এলে?' তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে হয়, 'তুমি সুমতি দাও যেন পথ থেকে বিচলিত না হই।' সুমতি কুমতি সবই তাঁর। আপনারা তো নির্জনে গোপনে তপস্যা করেছেন; কিছু বুঝেছেন তো? তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। আর ঠাকুরের মহাবাক্য রয়েছে সব তার সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। সব কি নিতে হয়, না পারে নিতে? সব খেলে হজম হবে কেন। তাই গোলমাল হয়। যতটা অনুকূল হয়, নিতে হয়। মনের ভালমন্দ এ সব তো আছেই। মিষ্টি বললে ভাল, একটু কড়া বললে খারাপ। এ ওঠা পড়া মনের ধর্ম। এদিকে অত লক্ষ্য দিতে নাই। সংসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক। সকলের সঙ্গে সকলের মিল হয় না। কিন্তু সকলকেই হয়তো থাকতে হয় একখানে। তাই ঠাকুর বলতেন, 'কতক লোকের সঙ্গে মুখের খাতির রাখতে হয়। বলতে হয়, ভাল আছেন মশায়, আসুন বসুন। আর কারো কারো সঙ্গে অন্তরের ভাবের আদান প্রদান চলে।' এই যে ছেলেদের, শচী প্রভৃতিকে যেতে

বলছি — অনেক সুবিধা হতে পারে পড়ার।

ভক্ত — আজ্ঞে হাঁ, philosophy (দর্শন) পড়ার খুব সাহায্য হবে।

শ্রীম — শুধু কি তাই? যুবকদের West-এ (প্রতীচীতে) যেতে ইচ্ছা হয়। কি দরকার বিলেত আমেরিকা যাবার? অত বড় একজন authority (অধিকারী) পঁচিশ বছর রয়েছেন ওদেশে। তাঁর কাছে শুনে নিলেই হলো — কত অভিজ্ঞতা! কথাপ্রসঙ্গে ওদেশের সব কথা, ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনলেই হয়ে গেল। সময় কোথায় এত সব একজনের করার। সামান্য জীবন কয়েক বৎসরের। তাই best mind-এর (শ্রেষ্ঠ মনীষীর) কাছে শুনে নিতে হয়। আমরা এটি করি। এটি ঠাকুরের উপদেশ। আপনি এই দুটি কথার উপর লক্ষ্য রাখবেন — প্রথম, ওঁর personal reference (নিজের জীবনের ঘটনা) আর দ্বিতীয়, ঠাকুরের reference (কথা)। এ দু'টি মনে থাকলে, আর সব মনে করে আনতে পারবেন। তারপর এসে লিখে নিলেই হলো। ঠাকুরের কথা শুনতে যাওয়া, এইজন্যে যেখানে সেখানে যাওয়া যায়। আর ইনি ঠাকুরের সন্তান। একজন মহাপুরুষকে watch করা (মনোযোগ দিয়ে দেখা) খুব ভাল। মান অভিমান ছেড়ে দিয়ে তাঁদের কাছে যেতে হয়।

২

এখন বেলা এগারটা। শ্রীম অন্তেবাসীকে একটি বালতি দিয়া বলিলেন, 'নিচে বেয়ারা রয়েছে। তাকে বলুন, এই বালতি করে জল উপরে উঠিয়ে দিতে। স্নান করতে হবে।' অন্তেবাসী নিজেই জল লইয়া চারতলায় উঠিলেন। শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিতেছেন, 'মিস্ত্রিরা কাজ করছে। ঘরে অনেক দামী জিনিষ আছে। আপনাদের তো এখন অন্য কাজ নাই। একটু বসলে স্নানটান্ করে আসতাম। তিনি স্নান করিতে গেলেন। একটু পর ফিরিয়া আসিলেন। স্নান হয় নাই, হাতে নাগ মশায়ের জীবনী। বলিলেন, এইটি এই টুলে বসে পড়ুন। আর ছোট অমূল্যবাবুর পত্রের জবাব লিখতে হবে। মঠে জন্মাষ্টমীর দিনে

রাত্রিবাস, নন্দোৎসব, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে উৎসব দর্শন — এসব বিবরণ দিয়ে লিখবেন। অর্থাৎ যাতে পত্রপাঠে ভগবানের উদ্দীপন হয়, এমনতর করে লেখা চাই।

শ্রীম স্নান করিয়া আসিয়াছেন। একটি ভক্তকে বলিলেন, আপনার তো স্নান হয়ে গেছে? আমি তা হলে একটু চোখ বুজি (ধ্যান করি)। ধ্যানান্তে ভক্তটি বিদায় লইতেছেন। তাহার হাতে তিনখানা কাপড় দিলেন সিটি কলেজের কোণের ডাইং ও ক্লিনিং-এ দিবার জন্য। আর বললেন, সঙ্গে বেয়ারাকে নিয়ে যাবেন। তাহলে সে রসিদ দেখিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। তিনখানা তিন আনার বেশী হলে দেবেন না। আর রসিদ আনবেন। আর এইখানা (লাল পেড়ে ধুতি), বেশী ময়লার জন্য বেশী চাইলে দেবেন না।

রাত্রি সাড়ে আটটা। মর্টন স্কুলের দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে নৈশ আসর বসিয়াছে। শ্রীম চেয়ারে পূর্বাস্য। নিকটে শুকলাল, ছোট জিতেন, মণি, যোগেন ও আসামের অক্ষয় ডাক্তার রহিয়াছেন। উকীল ললিত ব্যানার্জী ও মোহন বেদান্ত সোসাইটি হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে আরোও কয়েকজন নূতন ভক্ত আসিলেন। তারপর ছোট নলিনী ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিলেন। সুধীর প্রথমে বেদান্ত সোসাইটি, তারপর ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন। তিনিও আসিলেন। সর্বশেষ শচী ও শান্তি বেদান্ত সোসাইটি হইতে ফিরিয়াছেন। একটি ভক্ত গাহিতেছেন —

গান। রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বলরে আমার মন।
ঐশ্বর্য বিহীন মূরতি জিত কামিনীকাঞ্চন।।

শ্রীম (অক্ষয় ডাক্তারের প্রতি) — আপনারা দক্ষিণেশ্বর কখন গিছলেন?

অক্ষয় — আজ্ঞে, যাই নাই অনেকদিন। যাব যাব করছি, হয়ে ওঠে না।

শ্রীম — যান একদিন। এমন সুন্দর বাগান, ঘুরে ঘুরে সব দেখবেন।

ডাক্তার — একদিন গিয়ে সারাদিন থেকে ভাল করে দেখে

আসবো, আরতি দেখে ফিরবো এই বাসনা।

শ্রীম — তা বেশ। কিন্তু কাল পরশুর মধ্যে একবার দেখে আসুন ফস্‌ করে, পরে না হয় গিয়ে ভাল করে দেখবেন।

ভক্তদের বেলুড়মঠ ও দক্ষিণেশ্বর পাঠাতে শ্রীম কতই না ভাব ভাষা ও উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। তিনি নিশ্চয় জানেন, অধ্যাত্ম জীবন যারা চায় তাদের ঐ সব স্থানে না গেলে স্ফুরণ হওয়া সম্ভব নয়, তাই পাঠাতে অত করেন। এ যেন, বুঝিয়েই হউক কিংবা জোর করে ধাক্কা মেরেই হউক অমৃত সাগরে ফেলে দিবার চেষ্টা। এইবার যুক্তির পর, ডাক্তারের হৃদয় আক্রমণ করিলেন।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — যান একবার, আমাদের বড় উপকার হবে। এসে সব বলবেন। এতে আমাদেরও যাওয়া হয়ে যাবে। Old man (বৃদ্ধ) কিনা, ইচ্ছা করলেই যাওয়া হয় না। আপনারা young man (যুবক), যা ইচ্ছা করতে পারেন। আমাদের বড্ড উপকার হবে, যান। তবে আরতি দেখলে last steamer (শেষ জাহাজ) পাবেন না।

ডাক্তার — আজ্ঞে যাব, আপনার আদেশ যেতেই হবে। আমার ভাই বালীতে আছে। সব বন্দোবস্ত করে নিব।

শ্রীম — তা বেশ, বেশ। দু'একদিনের মধ্যেই একবার যান। যাবার সময় মঠ দর্শন হবে ইষ্টিমার থেকে।

অক্ষয় — নিশ্চয় যাব। বীরেন বোস কবে আসেন এখানে?

শ্রীম — রবিবারে দক্ষিণেশ্বর যান। ওখানকার ফেরৎ মাঝে মাঝে এখানে আসেন।

অক্ষয় — আমায় বলেছিলেন বীরেনবাবু, এটর্নির কাজ ভাল লাগে না ছেড়ে দিবে।

শ্রীম — তা লাগবে না! ঈশ্বরেতে মন পড়ে আছে। কিরণবাবু দক্ষিণেশ্বরের চার্জ নিয়েছেন। মানে এখন আমাদেরই হলো। মঠ recommend (সুপারিশ) করেছেন। জজের তো আর local knowledge (এস্থান সম্বন্ধে ভাল জানা) নাই। তাই রেফারি করেছিল

একজনকে। পাঁচজনের মধ্যে কিরণবাবুই হলেন। ভক্ত লোক আর অনেক কাজ, তবুও নিয়েছেন ঠাকুরের কাজ বলে। বেশ হলো। দেখে আসুন।

৩

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — কি কি কথা হলো ঠাকুরের, বেদান্ত সোসাইটিতে, শোনান।

মোহন — আজের বিষয় ছিল 'বেদান্ত কি' — শ্রোতা একশ'র উপর। অভেদানন্দজী বলিলেন, "দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটি মতই বেদান্তের অন্তর্গত। অদ্বৈত হলো highest culmination and gradual development of the other two — অদ্বৈত শেষ কথা — ক্রমোন্নতির শেষ শিখর। মনের ক্রমবিকাশে দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈতে পৌঁছিয়ে দেয়, সেখান থেকে শেষ শৃঙ্গ অদ্বৈতে। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানমার্গী। তারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করে। 'নেতি নেতি' করে অগ্রসর হয়। বড় শক্ত পথ! এই মতে 'তুমি প্রভু আমি দাস', 'তুমি পূর্ণ আমি অংশ' এ সব নাই। তুমিই আমি — ত্বমেবাহম্, সোঽহং, শিবোঽহং, এই চিন্তা করে অদ্বৈতবাদী। ইহার আলোচনা বাংলা দেশে নাই — পশ্চিমে ও দক্ষিণে আছে। বাংলা দেশ বৈষ্ণব ও শাক্তের দেশ। এখানে দ্বৈতবাদ এর প্রভাব বেশী।

অদ্বৈতবাদী বলেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম কেমন? যেমন মহাজলরাশি, কুলকিনারা নাই। আর জীব জগৎ যেন তাতে বুদবুদ উঠছে। দশটা বুদবুদ উঠলো, দু'চারটা একত্র হয়ে বড় হলো। আবার ভেঙ্গে গেল, আবার জলে মিশে গেল। যতক্ষণ উপাধি থাকে ততক্ষণ এই জ্ঞান হয় না। আমি অমুকের ছেলে, অমুকখানে বাড়ি, অমুক জাত — এসব উপাধি। এ সব গেলে তখন ঐ জ্ঞান হয়। অভ্যাস করতে হয় 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'শিবোঽহং' — এ সব মন্ত্র, এ সব মহাবাক্য। আরে বাবা, ভেবে দেখ্ দেখি, তুই কার ছেলে? অজ্ঞানে

লোক ভাবে এ আমার পুত্র। এ বড় হলে আমায় খাওয়াবে। কি আহাম্মকী! তোর পুত্র কি করে? তুই কি পুত্রের প্রাণ দিতে পারিস? তুই কল — যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রী তিনি। In a process (একটা উপায়ে) কলেতে ছেলে জন্মালো। তুই বলছিস, আমার ছেলে। আত্মা কারো ছেলে নয়।

আমাদের দেশ অধঃপাতে গেছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠা কর। বর্ণও নাই আশ্রমও নাই। এক বর্ণ এক আশ্রম হয়ে গেছে এখন — দাস বর্ণ আর গৃহস্থ আশ্রম। সব ইংরেজের গোলাম। আর গৃহস্থ আশ্রম মানে পশুর মত ভোগ বিলাসে রত থাকা। উচ্চ চিন্তা, ঈশ্বরের চিন্তা নাই। হিন্দু সভা হলো বেনারসে। সেখানে কিনা বিয়ের বিষয় নিয়ে সব ব্যস্ত — কত বয়সে বিয়ে হবে! এই কি হিন্দুধর্ম, ঋষিদের ধর্ম? আত্মজ্ঞান যে ধর্মের মূল — সেখানে খালি নীচের কথা নিয়ে সব ব্যস্ত। এই তো ধর্ম! সন্ন্যাস আশ্রম চতুর্থ আশ্রম — ত্যাগের আশ্রম। এর ভিতর দিয়ে গিয়ে সকলকে পূর্বে মরতে হতো। বাণপ্রস্থ থেকে সন্ন্যাস। এখন কি হচ্ছে? এর নাম শুনলে ক্ষেপে যায়। এক আশ্রম চার আশ্রমকে গ্রাস করে রেখেছে। দেখনা, পরমহংসদেবের ওখানে যেতাম বলে আমাদের বাপ মা কত মন্দ বলতেন। তোমরা এখানে আস বলে বাপ মা হয়তো ক্ষেপে যাবে। আমাকে হয়তো পাগল বলবে।

এ দেশের নেতা কে? না, যে পরের মাথায় হাত বুলিয়ে খায়। যারা খেটে খায় তাদের করে রেখেছে ছোট লোক — সমাজে হীন। পৌরহিত্য হয়েছে hereditary (বংশগত) কিন্তু ওদেশে (পাশ্চাত্যে) তা নাই। Clergyman-এর (পুরোহিতের) ছেলে সকলে clergyman (পুরোহিত) হয় না। পাঁচ ছেলে পাঁচ রকম কাজ হয়তো করে। এদেশে তা নয়। জন্ম দ্বারা হয়ে গেছে জাতি বিচার। আগে ছিল গুণ ও কর্ম দ্বারা। বি. ব্যানার্জির জুতার দোকান ছিল। তিনি কে? না, অমুকের পুরোহিত। তুমি যে বাপধন বৈশ্য হয়ে গেলে ব্যবসাকর্ম করায়! পুরোহিত রইলে কি করে? West-এও

(পাশ্চাত্ত্যেও) চার বর্ণ আছে — clergy, warrior, merchant and servers (পুরোহিত, সৈনিক, বণিক ও সহকারী)। যখন ঋষিরা ছিলেন সমাজের নেতা তখন বর্ণাশ্রম ছিল। তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরায়ণ। সকলের কল্যাণ করা ছিল তাঁদের একমাত্র কামনা ও চেষ্টা। এখন হয়েছে স্বার্থপর লোক সমাজের নেতা। সন্ন্যাসীকে কর নেতা — যে সকলের মঙ্গল চায় অথচ প্রতিদানে কিছু চায় না। বর্তমান যুগের যুগাবতার পরমহংসদেব, তাঁকে কর নেতা। তাঁর আদেশে চলা উচিত। দেশ সমাজ ও ব্যক্তি সকলের কল্যাণ হবে — সকলে উঠবে।

পরমহংসদেব বলতেন, ‘পাকা আমি’, আর ‘কাঁচা আমি’। আমি অমুকের ছেলে অমুক জাত ইত্যাদি ‘কাঁচা আমি’। ‘আমি ঈশ্বরের ছেলে’, কিংবা ‘আমি ঈশ্বর’ সোঽহং এ ভাব ‘পাকা আমি’। পরমহংসদেব বলতেন, ‘অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যথা ইচ্ছা তথা যা’। গৃহস্থ হতে হয়, তাই হও; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ করে হও। তবে ঠিক থাকতে পারবে, নয়তো মায়াতে ডুবিয়ে দিবে। পরমহংসদেব আবার বলতেন, ‘যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে’। এই শরীরের ভিতরে যিনি আছেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন।

তোমরা পরমহংসদেবকে ধর। তাঁকে আদর্শ কর। ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ করে সংসারে থাকো — দ্বৈত অদ্বৈত যা হউক। শেষে সব এক জায়গায় যাবে — ঈশ্বরে। এই সব রাস্তার ঝগড়া ছেড়ে দাও। এরূপ করলে তোমরাও উঠবে দেশও উঠবে।

৪

প্রশ্ন — আমি বলতে পারি কি — সোঽহং শিবোঽহং?

উত্তর — খুব পার। ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা করা ভাল ‘তত্ত্বমসি’ — তুমি সেই আত্মা।

প্রশ্ন — প্রার্থনার আবশ্যকতা কি?

উত্তর — দ্বৈতবাদীদের খুব আবশ্যক — essential,

জ্ঞানমার্গীদের দরকার নাই, তারা কাকে করবে প্রার্থনা? তারা 'নেতি নেতি' বিচার করে। ভাবে সোঽহং — আমি নিজে পরমাত্মা — ব্রহ্ম, তাই তাদের দরকার নাই। ভক্তিমার্গীদের দরকার অত্যন্ত।

পরমহংসদেব বলতেন, শুদ্ধা ভক্তি আর শুদ্ধ জ্ঞান এক। শেষে দুইই একস্থানে মিলিত হয় — ঈশ্বরে। প্রার্থনা আবার দু'রকম আছে — সকাম ও নিষ্কাম। চণ্ডীতে সকাম প্রার্থনার কথা আছে — 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি'। 'ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্'। ইহা খারাপ নয়। কিন্তু এতে শাশ্বত শান্তি সুখ লাভ হবে না। তাই নিষ্কাম প্রার্থনা করতে হয় — যেমন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও, বিশ্বাস দাও। এতে চির শান্তি, সুখ লাভ হবে। প্রার্থনা করলে দেখতে পাবে মনটা ক্ষণিকের জন্যও অন্য বস্তু থেকে উঠে যায়। এইরূপ করতে করতে যখন মন মুখ এক হবে, তখন মনে যা চাইবে তাই পাবে।

প্রশ্ন — প্রার্থনা দ্বারা কর্মফল কমান যায় কি?

উত্তর — হাঁ যায়। তবে avoid (পরিত্যাগ) করা যায় না। মোড় ফিরিয়ে দেওয়া যায়। কর্মফল ভোগ করা, এটা একটা law — natural law (প্রাকৃতিক নিয়ম)। এ সকলকেই করতে হবে তবে মোড় ফিরালে তোমার মনকে সেটা affect (কাবু) করতে পারে না। হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দের) দেখলাম, মস্ত operation (অস্ত্রোপচার) পিঠে, কিন্তু খেয়াল নাই। শেষ পর্যন্ত মন যোগে আছে। ঠাকুরেরও দেখেছি — রোগে কাঠ হয়ে গেছেন। আমরা সব পাশে বসে। খাচ্ছেন — মুখ দিয়ে সব বের হয়ে আসছে, গিলতে পারছেন না। কি কষ্ট! ভক্ত বলছেন, 'আঃ, কি কষ্ট হচ্ছে খেতে'।

ভক্তদের সকলকে দেখিয়ে বললেন, 'বল কিগো — আমি যে অত সব মুখে খাচ্ছি।' একজন দুর্বাঘাসের উপর দিয়ে যাচ্ছিল — অমনি ঠাকুর চিৎকার করে উঠলেন, 'উঃ উঃ, বুকে লাগছে যে'। এই সব হয় ঠিক ঠিক অদ্বৈত জ্ঞানে।

প্রার্থনা সঞ্চিত কর্ম অথবা সংস্কার বদলাতে পারে। কিন্তু প্রারব্ধ ভোগ হতেই হবে — তবে নির্লিপ্তভাবে, জ্ঞানাগ্নি ভিতরে জ্বালিয়ে

দিতে পারলে সব ভস্ম হয়ে যায় — কর্ম থাকে না।

কর্মফল আবার transfer (অপরে সঞ্চারিতও) হয়। ঠাকুর ও যীশুখৃষ্ট নিয়েছিলেন অপরের কর্মফল। Mental healer (মেণ্ট্যাল হিলার) চিন্তা দ্বারা অপরের রোগ আরাম করে, কিন্তু প্রতিরোধ না জানলে নিজের শরীরে আসে।

প্রশ্ন — প্রার্থনায় পাপপুণ্য কমে কি?

উত্তর — হিন্দুরা পাপপুণ্য বলে কিছু মানে না। ব্রাহ্মসমাজে, 'পাপী পাপী' করতো, আর দু'একটা স্তবে পাপ, পাপী এসব কথা রয়েছে। পরমহংসদেব শুনে বললেন, পাপী পাপী বলতে বলতে পাপী হয়ে যায়। আর শিব শিব বলতে বলতে শিব হয়ে যায়। ক্রিশ্চিয়ানদের মতে আদম নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে পতিত হয় — পাপী হয়। তাই তোমরা, তার সন্তান অনন্তকাল নরক ভোগ করছো। ওদের পুণ্যের দেবতা আলাদা — পাপের আলাদা। আমাদের ওসব কিছু নাই। পাপ করেছো পুণ্য কর — ঈশ্বরের আশ্রয় নেও, প্রতিরোধ হয়ে যাবে। অনন্ত নরক মানে না হিন্দুরা।

প্রশ্ন — স্ব-স্বরূপকে নিজে নিজে জানা যায় কি?

উত্তর — না। একজনের নিকট উপদেশ নিতে হয়। যিনি উপদেশ দিবেন তিনি তোমার প্রকৃতি জানবেন। ধ্যান, জপ, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি — কোনটা তোমার পক্ষে উপযুক্ত তিনি বলে দিবেন। নিজে নিজে সিদ্ধ হওয়া যায় না — সকলেই ভাবে আমি বড়। একজনের কাছে জেনে নিয়ে বিশ্বাস করে ধৈর্য সহকারে কাজ করতে থাক, নিশ্চয় কৃতকার্য হবে।

শ্রীম — দেখলেন, কেমন সব মনে রয়েছে — যেন গেঁথে গেছে। এখন এগুলি লিখে রাখলেই হলো। যা বলেছি ঐ দু'টো কথা মনে রাখবেন, অন্য সব আপনা থেকে মনে আসবে। ঠাকুরের কথা মন্ত্র। তা সকলকেই মানতে হবে। কিন্তু ভাষ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই তাঁকে ধরে থাকলে তিনি সকলকে নিয়ে যাবেন ঠিক রাস্তায়।

দুর্গাপদ মিত্র, 'নিউ জাপান' ও 'মডার্ণ থট' আনিয়াছেন। শ্রীম চোখ বুলাইতেছেন। এখন রাত্রি প্রায় দশটা।

৫

শ্রীম মর্টনের দ্বিতলের পশ্চিমের ঘরে বসিয়া আছেন। বড় জিতেন, ছোট জিতেন, বিনয়, যোগেন, ছোট নলিনী, শচী, সুধীর, মণি, জগবন্ধু প্রভৃতিও রহিয়াছেন। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম-র একটি আনন্দময় ভাবের প্রকাশ হইয়াছে। আনন্দে গানের পর গান গাহিতেছেন আর দুইটি চারটি কথা বলিতেছেন। গানে বলিতেছেন, মৃত্যু সম্মুখে দণ্ডায়মান। জীব প্রস্তুত হও — এই শত্রুকে জয় করিবার জন্য। শ্রীভগবানের নামে এই শত্রু বশীভূত হতে পারে, অন্য পথ নাই। গানে বলিলেন, সংসার দুঃখপূর্ণ, দুঃখ দূর করিবার উপায় আনন্দময় ভগবানের শরণ গ্রহণ।

গান । জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান তূণ,
রসনা ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।।

(কথামৃত ২/৫/৫)

ডাক্তার বক্সী, অমৃত, মনোরঞ্জন ও বীরেন গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম গাহিলেন —

গান। কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই গানটি গাইতেন — এই পদটির জন্য — 'সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানা রূপ ধারিণী'। আর ভক্তদের বলবার জন্য, সংসার তাঁর লীলাভূমি — এখানে তাঁর নানা ভাবের সম্মিলন ক্ষেত্র। কখন রুদ্র মূর্তি অসুর নিধন করছো — সঙ্গে সঙ্গে সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভক্তদের পালন করছো। কখন ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ করছো, কখনও আবার ভক্ত হৃদয়ে আনন্দে নৃত্য করছো। তাঁর জগৎলীলার চিত্র। আগের গানটি গাইতেন, ভক্তরা যখন শোক তাপে জর্জরিত হয়ে যেতেন। সাবধান করে দিতেন, যাতে ঈশ্বরের শরণ লয়।

প্রত্যেকটি গানই সম্পূর্ণ গাহিতেছেন —

গান। আর ভুলালে ভুলব না মা,
দেখেছি তোমার রাঙ্গা চরণ।
আমি অভয়পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুলব না মা।

গান। আমি ঐ খেদে খেদ করি
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এ দু'টিই রামপ্রসাদের গান। প্রথমটিতে ভরসা, দ্বিতীয়টিতে ভয় দেখাচ্ছেন। ভগবানের আশ্রয় নিলে বিপদ যায়; কিন্তু সম্ভাবনা থাকে শরীর থাকলে। যাবৎ অহং ভাবের লেশ মাত্রও থাকবে তাবৎ ঐ ভয়। তাই বলছেন, 'অভয়পদ সার করেছি ভয়ে হেলব না দুলব না মা — আশ্রয় নিলে দৃঢ়তা আসে কিন্তু ইহাও স্থায়ী নয়। তিনি তা-ও বদলিয়ে দেন। তাই বলছেন, 'তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।' ঠাকুরের হাতটি ভেঙ্গে গেলে এই গানটি গেয়েছিলেন। শরীর যাবার আগে তাই বলেছিলেন, সব তাঁর 'অণ্ডারে'। ঠাকুরের থাকবার ইচ্ছা ছিল ভক্তদের কল্যাণের জন্য — কিন্তু বললেন, 'মা নিয়ে যাচ্ছেন — আমি সব দিয়ে দিচ্ছি সবাইকে।' মানে, সবার জ্ঞান হয়ে গেলে জগৎলীলা চলে না মা'র; তাই নিয়ে যাচ্ছেন। কি বুঝবে মানুষ এ লীলা! অবতার এই কথা বলছেন, মানুষ ভাবে ভক্ত ভাবে। অবতার মানে ব্রহ্মশক্তির মানুষরূপে আগমন। দুর্বোধ্য সব। তাঁতে আশ্রয় নিলে দুঃখ হবে না একথা হতে পারে না। শরীর থাকলে দুঃখ আছে। তবুও তাঁর আশ্রয়ে থাকা। ঈশ্বরই একরূপে মা, একরূপে ঠাকুর আবার বহুরূপে জীবজগৎ। ঠাকুর বলেছিলেন, 'দু'একটা পরিবার দেখেই মাকে বলেছিলাম, মা মোড় ফিরিয়ে দাও। তাই হলো।' আমাদের এত hammering (হাতুড়ি পেটা) করা হচ্ছে তবু কিচ্ছু হচ্ছে না।

শ্রীম পুনরায় আবেগ ভরে গাহিতেছেন। গানে প্রার্থনা করিতেছেন।

গান। কবে তব দরশনে হে প্রেমময় হরি।
উথলিবে প্রেমসিন্ধু চিদানন্দ লহরী॥

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এইটি কাম্য ভক্তদের। বাহ্য জ্ঞান ভুল হয়ে যায়, তাঁ'তে মন সমাধিস্থ। চিদানন্দ সাগরে মগ্ন। তখন দুঃখ

নাই — পূর্ণ আনন্দ, শান্তি। একদিন একটি ভক্তকে নিয়ে মার মন্দিরে গেছেন আর নেচে নেচে গানের সুরে ঠাকুর বলছেন, ‘বিপদনাশিনী গো বিপদনাশিনী’। (বড় জিতেনের প্রতি) সব থেকে বড় বিপদ হলো দেহবুদ্ধি। Sense world-টাই (বাহ্য জগৎ) বিষয়। মা যতদিন রেখেছেন দেহবুদ্ধি ততদিন তাঁকে প্রার্থনা করতে হয় — ‘বিপদ নাশ কর, মা’। আত্মা নির্লিপ্ত। দেহেতে মন যখন রেখেছ, এখন তুমি দেখ। Sense world-টা (বাহ্য জগৎ) থেকে মন উঠলে কি অবস্থা হয়, তা এই —

গান। নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥

শ্রীম — এই অবস্থা শেষ অবস্থা। এটি স্বামীজীর গান। ঠাকুর এটি করে দিয়েছিলেন। তাই বলছেন, ‘সে ধারাও বন্ধ হ’ল শূন্যে শূন্য মিলাইল।’ দেহবুদ্ধি, নাশ হয়ে গেছে — the lower ego disappeared. তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না; তাই ‘অবাঙ্ মনসোগোচরম্’। যার হয় সে বোঝে মুখে বলা যায় না। এটি তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না। ‘নী’ বলতেন এ অবস্থাকে। ভক্তদের তিনি কৃপা করে এটি করিয়ে দিয়েছেন। যতদিন না এটি লাভ হচ্ছে ততদিন এইভাবে থাক — ভক্তি-ভক্তভাবে —

গান। শিবসুন্দর চরণে ও মন মগ্ন হয়ে রওরে।
ভজরে আনন্দময়ে সব যন্ত্রণা এড়াওরে।
শিবপদ-সুধা-হ্রদে ডুবে মন জুড়াওরে।।

শ্রীম দীর্ঘকাল মৌন হইয়া রহিলেন, মন অন্তর্মুখ — ‘শিবপদ-সুধা-হ্রদে’ বুঝি মন ডুবিয়াছে। আবার মধুর কণ্ঠে ভগবৎ মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ডাক্তারের প্রতি) — এই গানটি যার সেই শিবের প্রসাদ আজ আমরা পেয়েছি। শান্তানন্দ পাঠিয়েছেন। সাধুরা কেউ কেউ অমরনাথ গিছলেন — কাশ্মীরে। একটি সাহেবের বিবরণ পড়েছি বলে মনে হচ্ছে। এই সাহেব নৌকো করে মানস সরোবরের ভিতর

গিছলেন বুঝি। অমরনাথও গিয়েছিলেন। লোকে বারণ করেছিল যেতে। বলেছিল, ওদিকে ডাকাত আছে। হুনিয়ারা লুটপাট করে মানস সরোবরের পথে। অমরনাথ যেতেও বন্ধুরা বারণ করেছিল (হাস্য)। বলেছিল সেখানে রাক্ষস থাকে। সাহেব মানলে না, দু'জায়গায়ই গিছলো। তিনি বলেছেন, সেখানে গেলে সব সময় উদ্দীপন হয় — অপর ভাবনা থাকে না। সেই অমরনাথের প্রসাদ, একেবারে টাটকা। সেখানে একলা শিব আছেন — প্রকৃতি ছাড়া। প্রকৃতিতে সৃষ্টি ফিষ্টি হয়। একলা শিবের পূজা হয় সেখানে। 'আমি'টা যতক্ষণ রেখেছেন, ততক্ষণ সব আছে — এই সব তীর্থাদি। ততক্ষণ 'কিছুই নাই' বলবার যো নাই। তবে বিবেক হলে এক কোপে কেটে ফেলা যায়। কুল গাছ — হাজার পাতা, কুল — সব এক কোপে কেটে ফেলে যেমন।

অমৃত (শ্রীম-র প্রতি) — চিত্তশুদ্ধি মানে কি?

শ্রীম — মনকে রূপরসাদি থেকে তুলে নেওয়ার নামই চিত্তশুদ্ধি। ঐ থেকে তুলে ফেল্লেই শুদ্ধ আর ঐতে রাখা অশুদ্ধ। শুদ্ধচিত্তেই ঠিক যোগ হয়। ঠাকুর বলতেন, তখন একটি ভাগবতী তনু হয়। তার নাক, মুখ, চোখ সব আছে। তাঁর কৃপাতে তপস্যা দ্বারা ঐটি হয়। তা'তে আবার এ শরীরের মত রূপরসাদি ভোগ হয়। স্থূল ভোগ নয় — চিন্ময় ভোগ সব। যতক্ষণ ঐটি না হয় তার জন্যই ততক্ষণ ভক্তরা প্রতিমা দর্শন করে, তাঁর প্রসাদ আস্বাদন করে, সুগন্ধি পুষ্প আঘ্রাণ করে, তাঁর নাম করে ও প্রতিমার পাদস্পর্শ করে থাকে। এইটি বাহ্য — এইটি করতে করতে চিত্তশুদ্ধ হলে, তখন ভাগবতী তনুতে চিন্ময় ভোগ হয়, এইরূপ। এগুলি ভাল। ভোগ করবে তো তাঁকে নিয়ে কর — তাঁকেই ভোগ কর। এগুলি relative (ব্যবহারিক), Absolute (নিত্য সত্য) তিনি। একবারে ডুবে যাওয়া, এক হয়ে যাওয়া — সব জল মহাসাগর। সেটি তো হচ্ছে না। তাই কি করা যায়? দাস হয়ে থাক — ঐ ভাবে।

ইনি (ঈশ্বর) কেমন? না, coin-এর (মুদ্রার) দুই দিক যেমন। এক দিকে ব্রহ্ম অন্য দিকে এই সব যত কাণ্ড। তিনি নামরূপের

অতীত হলেও, ব্যাকুল হয়ে ডাকলে ভক্তের ইচ্ছানুকূল রূপ ধারণ করে দেখা দেন। আবার মানুষ হয়েও আসেন — যেমন ঠাকুর এসেছেন। মানুষের মত সব ব্যবহার — 'বুর্‌রুর্‌, বুর্‌রুর্‌' করেন। মিহিজামে দেখেছি — ছাগলদের রাখালেরা এই ভাবে ডাকে তাদের ভাষায়।

মুনিরা আত্মারাম, তাঁদের বন্ধন নাই। তবুও তাঁরা নাম রূপ রেখে দেন। যেমন নারদাদি, জগতের কল্যাণের জন্য। সংসারে থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় — বিষয় ভোগ। পরমানন্দ ভোগ মুনিরা করেন, অপর জীবকে শিখান এই করতে। তবে শান্তিতে থাকবে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কি সুন্দর বিধান! ভোগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে বেশ তাঁর নামে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ পাও। যাতে বন্ধন হতো তা মুক্তির উপায় হলো। নিবেদন অর্থই পূজা করা। এই পা দিয়ে তাঁর স্থানে যাও তীর্থে, চোখে দেখ সাধু, ভক্ত, দেবতা। অন্ধ যে সেও শুঁকতে পারে, স্পর্শ করতে পারে। সব ইন্দ্রিয় তাঁর সেবায় লগানো চাই। যে ক'টাতে হয় তাই ভাল। ঠাকুরের এমনি হয়ে গিছলো অবস্থা — সব মাকে দিয়ে নিজে নিতেন। নূতন কাপড় মাকে আগে পরাবেন, পরে নিজে পরবেন। আরসি ছিল একটি ঠাকুরের। মশল্লার বটুয়াতে রাখতেন। আরসিতে হৃদয় মধ্যে যিনি আছেন সেই মাকে দেখতেন। এই রকম হলে সর্বদা যোগে থাকা যায়, এর ভিতর থেকেও।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — সূর্য কি করে? সব নক্ষত্র নিয়ে — শনি, মঙ্গল, বুধ — অপর একটি constellation-এর (নক্ষত্রপুঞ্জের) দিকে ধাবিত হয়। দেহবুদ্ধি যখন যাবার নয়, তখন কি করা যায় — ইন্দ্রিয়াদি সুদ্ধ সব তাঁর দিকে যাক। অহঙ্কার তো যাবার নয়, তাই ঐভাবে থাক্‌। আবার বেলের মালা, শাঁস, বীচি সবশুদ্ধ যেমন বেল, তেমনি জীবজগৎ সবসুদ্ধ তিনি। ঠাকুর বলতেন, আমি মাছের ঝোল, ঝাল, অম্বল সব করে খাই। ঈশ্বরকে নানাভাবে সম্ভোগ করছেন। কখনও দ্বৈত, কখনও বিশিষ্টাদ্বৈত, কখনও একেবারে অদ্বৈত।

উচ্চ অধিকারী হলে সব ভাবে সম্ভোগ করতে পারে, নচেৎ একটা নিয়ে থাকে। তাতেই কাজ হয়ে যায়, কিন্তু একঘেয়ে। ঠাকুরের অনন্ত ভাব।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বুড়ি ছুঁলে খেলা হয় না সেইজন্য 'আমি'টা রেখে দেন। তিনি খেলা চান কিনা। বুড়ি খেলা চালাচ্ছেন। এটা হলো শেষ অবস্থা। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) আপনারা ভেবে দেখুন তো তাদের কি অবস্থা জাপানে — মহাশ্মশান হয়ে গেছে, লাখ লাখ লোকের প্রাণ গেল!

মোহন — কালকের ভূমিকম্পে লোকের চৈতন্য হবে।

শ্রীম — কয়দিন থাকে চৈতন্য — এতিমখানার কথা ভুলে গেছে। জাপানের কথা ভুলে যাবে। আর এই ভূমিকম্পে কি করবে? শাশুড়ী বলেছিল, 'নাচকুঁদ বউ মা, আমার হাতের আটকেল (আন্দাজ) আছে।' সব শ্মশান বৈরাগ্য — কয়দিন পর আবার যা তাই হয়ে যায়। পানায় জল ঢেকে যায়। এমনি মহামায়ার খেলা। চণ্ডী পড়ছিলাম আজ — মা বলছেন, আমাকে ডাক তবে চৈতন্য থাকবে। অবতার ঠাকুর এসেও তাই বললেন — আমাকে চিন্তা করলেই হবে। শোনে কে? অবতার কেমন — যেমন রেলের গার্ড, মুক্ত পুরুষ। অন্য গাড়ীতে তালা বন্ধ, কিন্তু গার্ডের গাড়ী খোলা — ইচ্ছামত বার হচ্ছে আবার ভিতরে যাচ্ছে। আবার চলন্ত গাড়ী থেকেও নেমে পড়ছে। ঠাকুরকে ধরলে আর ভয় নাই। প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, 'যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।'

এইবার অমরনাথের বিবরণ পাঠ ও প্রসাদ বিতরণ হইল। শ্রীম বলিলেন, 'এই দেখুন টাটকা প্রসাদ — দর্শন করুন, স্পর্শন করুন, আস্বাদ করুন।' অমরনাথের বিল্বপত্র ও ক্ষীর ভবানীর সিন্দুর ভক্তগণ গ্রহণ করিতেছেন। ঠনঠনের মা কালীর প্রসাদও মনোরঞ্জন সকলকে দিতেছেন। প্রসাদের একটি কণিকা খামের উপর পড়িয়া ছিল, শ্রীম জুতা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া হাতে লইয়া উহা মুখে দিলেন আর বলিতে

লাগিলেন, মা, বিপদনাশিনী গো বিপদনাশিনী'।

শ্রীম মধ্যাহ্ন ভোজন করিতে বসিয়াছেন। ভৃত্য তেজু ঠাকুর বাড়ি হইতে আহার লইয়া আসিয়াছে। একে একে ভোজ্য দ্রব্য শ্রীম দেখিতেছেন। ভাত ও কয়েকটি তরকারী আর দুধ। সঙ্গে চিংড়ি মাছ ভাজা আনিয়াছে। শ্রীম প্রথমেই সব নিবেদন করিয়া দিলেন, তৎপর মাছ ভাজা হাতে লইয়া একটি বিড়াল শিশুকে খাওয়াইতেছেন। শ্রীম-র নির্দেশ মত ভৃত্য এই মাছ বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া ভাজিয়াছে — এই অতিথির জন্য। দেখিলে মনে হয়, যেন স্বীয় ইষ্টদেবকে সপ্রেমে ও সশ্রদ্ধভাবে তিনি ভোজন করাইতেছেন। ভগবান এই বিড়াল শিশুরূপে কয়দিন ধরিয়া শ্রীম-র অতিথি, তাই কি এ সেবা!

এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা, দ্বিতলের গৃহে ছোট জিতেন ও যোগেন বসা। অন্তেবাসী প্রবেশ করিলে জিতেন বলিতে লাগিলেন, 'উনি (শ্রীম) ঠাকুরবাড়িতে আরতি করতে গেলেন। তোমায় বলে গেছেন পার্বতীবাবুর বাড়িতে যেতে। তুমি ওদের বলবে, উনি আসতে পারেননি, কোমরে অসুখ। তোমায় প্রসাদ পেতে বললে বসে প্রসাদ পেতে বলেছেন।' আজ পার্বতী মিত্রের বাড়িতে শ্রী নাগমহাশয়ের জন্মতিথি উৎসব। স্বামী সারদানন্দজীও সাধুভক্ত সঙ্গে আসিয়াছিলেন। গতকল্য মধ্যাহ্নে শ্রীম বেড়াইতে বেড়াইতে মিত্র ভবনে গিয়াছিলেন। আজ সারাদিন উৎসব। পূজা, কীর্তন, ভোগ, আরতি ও প্রসাদ বিতরণ চলিতেছে। বাড়ির লোক সব উপবাসী, কিন্তু সাধু ও ভক্তগণকে নিজহাতে পরিতোষ পূর্বক ভোজন করাইতেছে। শ্রীম-র ধর্মপত্নী 'গিন্নিমা'ও উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। ইনি শ্রীশ্রীমা-র অন্যতমা সেবিকা ও পরমহংসদেবের কৃপাপ্রাপ্তা। শ্রীম-র দৌহিত্র রমেশ তাহার মা ও দিদিমাকে লইয়া আসিয়াছেন। এখন তাঁহারা ফিরিয়া যাইতেছেন। শ্রীম ইঁহাদিগকেও পূর্বাহ্নেই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

একটি ভক্তের সহিত পার্বতীবাবুর কথা হইতেছে। পার্বতীবাবু বলিতেছেন, 'আমার ভগবান ইনি (নাগমশায়)। এঁর কৃপাতে সব।

আমি নির্বোধ, কিন্তু তিনি কৃপা করে সদবুদ্ধি দিয়েছেন। তাঁর অপার স্নেহ সর্বদা অনুভব করছি। তাঁর পূজা ও চিন্তা নিয়ে থাকি। অন্য কোথাও বড় একটা যাইনা। তাঁর সেবার কথা কি বলবো! রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে। তাদের ডেকে তামাক সাজিয়ে খাওয়াচ্ছেন। কুলী মজুর কাজ করছে, তাদের নিজ হাতে পাখা করছেন, তামাক সেজে খাওয়াচ্ছেন। এদিকে তো দীনতার ও সেবার মূর্তি। কিন্তু অন্যায়ের সময় সিংহতুল্য। নারায়ণগঞ্জের ইংরেজ সাহেব গ্রামে পক্ষী শিকার করতে এসেছে। নিরপরাধ জীবদের মারছে শুনে নাগমশায় গিয়ে হাত জোড় করে ঐ কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করলেন। সাহেবের গ্রাহ্য নাই দেখে সিংহবিক্রমে তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিলেন। এই ক্ষীণদেহ, কিন্তু আজ কি মহাশক্তির আবির্ভাব?'

দ্বিতলে শ্রীশ্রী ঠাকুর ও নাগমহাশয়ের প্রতিমূর্তি বিবিধ গন্ধপুষ্পে অতি মনোরম ভাবে সজ্জিত। খিচুরী, বিবিধ ভাজা, আলুর দম, দই, সন্দেশ, রসগোল্লা, ফল প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য নিবেদিত হইয়াছে। মিত্র-গৃহিণী স্বহস্তে অন্তেবাসীকে ভোজন করাইতেছেন। মিত্রমশায়ও সম্মুখে উপবিষ্ট। ভোজনান্তে শ্রীম-র জন্য কিঞ্চিৎ প্রসাদ লইয়া অন্তেবাসী বিদায় হইলেন।

শ্রীম মর্টনের দ্বিতল গৃহে বসিয়া সব সংবাদ শুনিলেন। এখন সিঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। একটি ভক্তের সহিত গৃহস্থ জীবনের কথা হইতেছে।

শ্রীম — লোকগুলি কি নিয়ে আছে! পেট আর পেট, সন্তান উৎপাদন আর সন্তান পালন, এই কাজ। কিন্তু যারা ঈশ্বর ভক্ত তাদের চিন্তা এরও উপরে, কিসে তাঁর দর্শন হয়। বেশ স্বাধীন, কোথাও কিছু নাই, বিয়ে করলো, ছেলেপুলে হলো অমনি saddled (গদীয়ান) হয়ে গেল। নড়বার যো নাই। কিন্তু অবতারের কথা শুনলে এই গোলোক ধাঁধা থেকে বের হতে পারে। ঘরটিকে যদি আশ্রম বানিয়ে ফেলতে পারে তা হলে এখানে থেকেই হতে পারে। এঁরা বেশ করছেন — মিত্র মশায়রা। সর্বদা পূজা অর্চা নিয়ে আছেন —

ছেলেদের পর্যন্ত ঐ রং ধরেছে। কিন্তু সাধুসঙ্গ চাই সঙ্গেসঙ্গে, নইলে ঠিক থাকে না উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত।

পরদিন সন্ধ্যায় বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী সদ্ভাবানন্দ আসিয়াছেন। বিদ্যাপীঠের দানপত্র একজন এটর্ণিকে দেখাইতে হইবে। শ্রীম নিচে রকে বসিয়া বলিলেন, 'বীরেনবাবুর কাছে গিয়ে বল, আমরা তোমায় এই বিষয়ে আলাপ করতে পাঠিয়েছি। ইনি খুব sympathetic (সহানুভূতিসম্পন্ন) — দক্ষিণেশ্বরের বিষয় অনেকটা এগিয়ে দিছলেন।' একজন ভক্তের কথা হইতেছে। সাধু বলিলেন, উনি যা ধরেন শেষ না করে ছাড়েন না। শ্রীম শুনিয়া বলিলেন, হাঁ, অনেক বড় বড় কাজ করেছেন বৈকি, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে বাক্যবাণটিও চলে (সকলের হাস্য)। জে, এন, গুপ্তের কথা হইতেছে। ইনি কমিশনার। শ্রীম বলিলেন, 'উনি ঠাকুরকে দেখেছিলেন। ঢাকায় থাকতে একজনের সঙ্গে কথা হয়েছিল। বললেন, তিনদিন দর্শন হয়েছিল। ত্রিগুণাতীত আমার সহপাঠী। আজ কোথায় এঁরা সব — স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি আর কোথায় আমি।' পুলী — কোনটার ভিতর কড়ার ডালের পুর, কোনটায় নারকেল, কোনটায় ক্ষীরের পুর। কিন্তু বাইরে দেখতে সব এক।

এবার উপরে দ্বিতলে আসিলেন। ভক্তগণে গৃহ পরিপূর্ণ — সকলে প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি পাঠ হলো এতক্ষণ?' মণি বলিলেন, উদ্ধব সংবাদ — তাঁর বৃন্দাবন আগমন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) আহা, best portion (শ্রেষ্ঠ অংশ) পড়া হলো। গোস্বামীরা এলে ঠাকুর উদ্ধব-সংবাদ পাঠ করতে বলতেন।

পাগল হয়ে গেছে মেয়েটির গান আজ শুনলাম। সিটি কলেজের কাছে। খুব ভক্তিমতী, কি সব কথা কইতে লাগলো — গভীর জ্ঞানপূর্ণ। বামাক্ষেপা সর্বদা মা মা করতেন। লোকে বলে ক্ষেপা। মেয়েটি বললে, 'মন্ত্র নিলেই হলো?' হাত নাড়িয়ে একটু সব করে খেতে বসলাম। এতে হবে না। ভক্তিবারি সিঞ্চন করে অঙ্কুরিত

করতে হবে সেই ব্রহ্মবীজকে।' কি সুন্দর কথা! 'ভক্তি কখন হবে? যখন কামক্রোধাদি রিপু দমন হবে' — এ কথাও বললে। 'ত্রৈলঙ্গ স্বামী বসে আছেন। একজন পাঁচ সের রাবড়ী দিল। তিনি খেয়ে ফেললেন। আবার একজন দু'সের লঙ্কা দিল, তাও খেয়ে ফেললেন নিরুদ্বেগে।' — এই কথা বলেই মেয়েটি বলছে, 'আহা, সাধুকে কি লঙ্কা দিতে আছে গা?' সাধুর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি আছে। একটি লোককে জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনি বাবা ব্রাহ্মণ?' 'হাঁ' বলায় অমনি প্রণাম করলো। একটি স্ত্রীলোকের কাছে রিপোর্ট পেলাম, রাস্তা থেকে প্রসাদী ফুলের মালা কুড়িয়ে নিয়ে ঐ মেয়েটি মাথায় দেয়। ওরা বলে কি রকম লোক — শুচি অশুচি নাই।' আমরা শুনে বললাম, তা কি থাকে — ও যে শুচি অশুচির পারে। 'শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।' এই বলিয়া রামপ্রসাদের সম্পূর্ণ গানটি গাহিলেন —

গান। আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে তার বেটারে, তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি॥
শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে পীরিত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি।

(কথামৃত ১/২/৬)

* * *

গান। শ্যামা মা কি কল করেছে কালী মা কি কল করেছে।
চৌদ্দপোয়া কলের ভিতরি কত রঙ্গ দেখাতেছে॥ ইত্যাদি

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঐ মেয়েটির কি আর ঐ জ্ঞান আছে? কতক্ষণ শুচি অশুচি মানা, যতক্ষণ দেহে জ্ঞান আছে। ওর মনকে ঐ উপরে উঠিয়ে রেখে দিয়েছে। তিনি ধরে আছেন একে। একটি লোক ফষ্টিনষ্টি করছিল ঐ মেয়েটির সঙ্গে। দোকানদার ভক্তলোক। তার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হচ্ছে। সে কান পেতে সব শুনছে।

অমনি একটুকরা আগুন ঐ লোকটার গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেললে। অমনি পাগল মেয়েটি বলে উঠলো, 'আহা, মানুষের গায়ে কি আগুন দিতে আছে গা?' যে ফষ্টিনষ্টি করছিল তাকে দৌড়ে ধরতে গেল সব। ঐ মেয়েটি কি ফষ্টিনষ্টির ধার ধারে? একবার বলছে মনে মনে, 'বেশ মা, বেশ মা।' মা'র সঙ্গে কথা কইছে। আবার within bracket (অস্ফুটস্বরে) একটি observation (সমালোচনা) করলো — 'ছি লাজ নাই মা তোর! কেমন মেয়ে তুই? পতির বুকে তোর পা!' বলেই খিল খিল করে হাসতে লাগলো। বাড়ির লোক এসব কি বুঝবে, তাই পাগল বলে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ঠাকুর কেশব সেনকে বলেছিলেন, 'তোমরা ঘরে রয়েছ — একটি chink (ফাঁক) দিয়ে আলো পাচ্ছ। যারা বেরিয়ে গেছে ঘরের বাইরে তারা flood of light-এ (আলোর বন্যায়) দাঁড়িয়ে আছে। বরানগর মঠে পড়া হতো যোগোপনিষদ। ওতে আছে, গৃহী ও ত্যাগীর তফাৎ কি? সরষে আর সুমেরু পর্বত, অথবা গোষ্পদের জল আর সাগরে যেমন তফাৎ তেমনি। (ভক্তদের প্রতি) অতি সামান্য, কি বলেন, (সকলের হাস্য)। একটি ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে একমাস রয়েছেন ঠাকুরের কাছে। তাকে ঠাকুর বললেন একদিন, 'দেখ, যখন ভিতর ত্যাগ হয়ে যায় তখন বাইরে আপনি ছেড়ে যায়।' একমাস থাকার পর বললেন। প্রথম বলেন নি, ভয় পাবে — হয়তো দমে যাবে। কিন্তু একি আর সকলকে বলবার যো আছে! শুনবে কেন? হয়তো ক্ষেপে যাবে। বলবে, আমি বেশ ভাল আছি। বললেই শোনে কে? বিকারের রোগী যে সব। মনে করে আমরা খুব সেয়ানা। কাকও মনে করে খুব সেয়ানা, কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে। 'গু' মানে হীন বস্তু — বিষয় ভোগ। ঈশ্বরের আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ দিলে ফেলে দেবে — ভাল লাগবে না। মাছের চুবড়ি শিয়রে রেখে শোবে, গোলাপের গন্ধ সহ্য হয় না। এমনি কাণ্ড তাঁর।

শ্রীম খনিকক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন — কি ভাবিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — জগন্নাথ ডাকছেন এবার। সখীচরণ

চিঠি দিয়েছেন। জগন্নাথের সেবক তিনি — ম্যানেজার। ইনি লিখেছেন মানে ঠাকুর ডাকছেন। রথের একমাস আগে ডেকেছিলেন এখনও লিখেছেন, 'পূজা সামনে, আসুন'। আহা, পুরী কি সুন্দর স্থান! মিহিজামের ডবল রাস্তা। নরেন্দ্র সরোবর, মার্কণ্ডেয়, ইন্দ্রদ্যুম্ন, সাগর এইসব প্রাচীন তীর্থ সব আছে। আবার নবীন তীর্থ — চৈতন্যদেব বিশ বছর ছিলেন। চার বছর ভ্রমণে ছিলেন সন্ন্যাসের পর। তাঁর স্থান রাধাকান্ত মঠ, গম্ভীরা, টোটা গোপীনাথ, জগন্নাথ নিত্য দর্শন করতেন। (সহাস্যে) আচ্ছা তিনি ডাকছেন তো তিনি নেন না কেন? নিলেই তো হয়।

শ্রীম (সহাস্যে ডাক্তারের প্রতি) — পুরীতে একটি ভক্তের dysentery (আমাশয়) হয়েছে। বারবার পায়খানায় যায়। বৃদ্ধশরীর একা কুটীরে আছেন। কষ্ট হচ্ছে দেখে একটি ছেলে এসে সেবা করছে, জল তুলে দিচ্ছে, ময়লা সাফ করছে। সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কে'? ছেলে বললে তুমি যাকে ডাক সেই নারায়ণ। তখন বললে, তবে রোগটিই নিয়ে যাও না কেন? কষ্ট করে কেন আবার সেবা করতে আসা (সকলের হাস্য)। তখন ভগবান বললেন, 'না, বাপু তোমার ভোগ আছে একটু, ও হয় না।' (সহাস্যে) আমরাও বলি, নিয়ে যাও না কেন — ডাকাডাকি কেন? তিনি তো সবই পারেন — ইচ্ছাময়।

রহস্য বন্ধ করিয়া শ্রীম গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। ইতিপূর্বে পাগল স্ত্রীলোকটির প্রশংসা করিয়াছেন, তাতে ভক্তগণ পাছে ওদিকে ঝুঁকে পড়ে তাই সাবধান করিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, স্ত্রীলোক হাজার ভক্তিমতী হলেও তার কাছে যেতে নাই। দূর থেকে প্রণাম করতে হয়। স্ত্রীলোককে মা বলে পূজা করতে হয়। এই ভাবটি প্রথম আসে না। তা বলেই দূর থেকে প্রণাম করা। একটি লোক — গ্রাজুয়েট, পতিতাদের দেখে বড় কষ্ট হলো তার মনে। তাদের হরিনাম শুনাতে গেল। কিন্তু ঐ করতে গিয়ে পড়ে গেল। এমনি কাণ্ড! আর একটি

ভক্ত, তার পরমহংস অবস্থা। একটি স্ত্রীলোকের কাছে যেতো। ঠাকুর শুনে বারণ করেছিলেন যেতে। পরে শোনা গেল পড়ে গেছে। তখন ঠাকুরের দেহ গেছে। আর একটি ভক্ত গৃহে থাকেন, ঘরে যুবতী স্ত্রী। জোয়ান ভক্ত ছোকরাদের নিয়ে গিয়ে বাড়ির ভিতর বসতেন। ঠাকুরের কানে ঐ সংবাদ পৌঁছাল। অমনি তিরস্কার করতে লাগলেন। বললেন, 'কি গো কি শুনছি, ঘরে বউ রয়েছে ছেলেমানুষ, তুমি এমন করছো বন্ধুদের নিয়ে! বল আর করবে না।' প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন। এমনতর ব্যাপার।

একবার একটি ভক্ত স্ত্রীলোককে ঠাকুর recommend (সুখ্যাত) করেছিলেন। দলে দলে লোক তার কাছে যেতে লাগলো। এর মধ্যে একজন এসে আমায় বলছে, 'স্ত্রীলোকটি, এমন সব কথা বলে, পরমহংসদেবের চাইতেও বড়।' (সকলের হাস্য)। বাবা, কি মোহিনী মায়া! স্বভাবতঃই পুরুষকে আকর্ষণ করে স্ত্রীলোক। তার উপর আবার ঠাকুরের সুখ্যাত, রক্ষে আছে! বলছে কি না, পরমহংসদেবের চাইতেও বড় — ও-ও! কি মোহিনী শক্তি! তাই ঠাকুর ভক্তদের আত্মরক্ষা করতে শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ওরে দূরে থেকে প্রণাম করবি জগদম্বার রূপ জেনে। কাছে যেতে নাই। সাধকের অবস্থায় দাবানল — সিদ্ধাবস্থায় তিনিই জগন্মাতা। খুব সাবধান! রাস্তা দিয়ে চলতে হয় কিরূপে তাও ঠাকুর বলে দিছলেন। বলেছিলেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ডান-বাঁ না চেয়ে বরাবর চলে যায়। অচলানন্দ বলেছিলেন, তুমি শিবের কলম মান না? ঠাকুরের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। ঠাকুর উত্তর করলেন, 'কি জানি বাবা আমার ওসব (বীর ভাব) ভাল লাগে না, আমার মাতৃভাব। বীর ভাব স্ত্রীলোক নিয়ে সাধন ভাল নয়।' পরে ভক্তদের বলেছিলেন, 'কে যায় ওর সঙ্গে তর্ক করতে, করলেও বুঝবে না। ওর ভিতর ঐ ভাব রয়েছে — স্ত্রী নিয়ে সাধন।' মাতৃভাব শুদ্ধ ভাব; কিন্তু সাধকের অবস্থায় দূর থেকে প্রণাম।

কলিকাতা, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ খৃঃ
২৬শে ভাদ্র, ১৩৩০ সাল, বুধবার।

তৃতীয় অধ্যায়

কালীঘাটে গদাধর আশ্রমে শ্রীম

জ্ঞানীর দিন অজ্ঞানীর রজনী — মন্মথ উদ্ধার

১

শ্রীম ভবানীপুরে গদাধর আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। একটি ভক্ত রাত্রি দশটার সময় কলিকাতা হইতে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। রাত্রিবাস এখানেই হইবে। শীতকাল, খুব ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। সহরের কোলাহল প্রায় শান্ত। আশ্রমে দুই একজন সাধু ব্রহ্মচারী আছেন। ঠাকুরের শয়ন হইয়া গিয়াছে। ভক্ত বারান্দা হইতে ঠাকুর প্রণাম করিয়া শ্রীম-র গৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলের ঘর মেজেতে কার্পেট পাতা। ভক্তগণ মেজেতে বসেন। এই ঘরে আশ্রমের মহন্ত স্বামী কমলেশ্বরানন্দ থাকেন। গৃহে আলমারী আছে তাহা ধর্মগ্রন্থে পরিপূর্ণ। শ্রীমকে এই ঘর ছাড়িয়া দিয়া মহন্ত ত্রিতলের টিনের ঘরে আশ্রয় নিয়াছেন। মহন্ত ঐ ঘরের সম্মুখে তন্ত্র মতে দেবীপীঠ রচনা করিয়াছেন। কিছুদিন ধরিয়া সারারাত্রি জাগ্রত থাকিয়া দেবীর অর্চনা করিতেছেন।

শ্রীম মেজেতে কম্বল আসনে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া একখানা গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। গৃহে বিজলীর আলো জ্বলিতেছে। ভক্ত গৃহে প্রবেশ করিতেই পুস্তক বন্ধ করিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া শ্রীম তাহাকে সস্নেহে আহ্বান করিয়া নিকটে বসাইলেন। এই শীতের রাত্রিতে কলিকাতা হইতে কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া শ্রীম তাহার সহিত অত্যন্ত আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই দেখুন, গীতায় ভগবান বলছেন, যা সংসারীর অর্থাৎ অজ্ঞানীর নিকট রাত্রি, তাই জ্ঞানীদের নিকট

দিবা। যা অজ্ঞানীদের দিবা জ্ঞানীদের নিকট তা রাত্রি। কথাটি হচ্ছে ঈশ্বর। জ্ঞানীদের কাছে তিনি প্রকাশিত, তারা দেখতে পাচ্ছে, অন্যরা তা পাচ্ছে না। ‘দিবা’ মানে প্রকাশিত, ‘রাত্রি’ মানে ঢাকা। তাঁকে দেখাই জীবনের উদ্দেশ্য। এই জন্য কেউ কেউ উঠে পড়ে লাগে। রাতকে দিন করে, আলস্য নাই অতন্দ্রিত হয়ে সব করে। শরীর থাকবে না কিনা — কখন যায় ঠিক নাই। তাই তাড়াতাড়ি করে নিতে চায়। যারা সংসারে আছে তারা ঠিক উল্টো পথে চলছে ধনলাভের জন্য, পুত্রকন্যার জন্য রাতকে দিন করছে — ঠিক বিপরীত পথ। ঈশ্বর উপরে, আর মৃত্যু সঙ্গে — এ বোধ নাই। তাই যখন সৎসঙ্গে মন যায়, উঠেপড়ে লাগতে হয়। অন্য কাজ পরে হবে। অন্য কাজ বন্ধ রাখা যায়। ঈশ্বর ভজন বন্ধ রাখা যায় না। লোকে হিসাব ক’রে কাজ করে। যাতে বেশী লাভ হয় তাই করে। অবতার বলছেন, ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর লাভ করা সব চাইতে বড় লাভ। ঠাকুর গাইতেন — ‘কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।’ এক ক্লাশ লোক এই সব মণির ব্যাপার করে। তাদের সংখ্যা কম। অন্যরা বলে এরা বোকা। সামনের মণি অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চন ভোগ ফেলে দিয়ে, কোথায় যার দেখা নাই এমন মণির সন্ধানে ফিরে। তারা বলে হাতের গোড়ায় যা পাওয়া যাচ্ছে, তা ভোগ করে নাও! কিন্তু এতে মন থাকলে ঐ ধন লাভ হয় না। একটা ছাড়লে অপরটা লাভ হবে। এক সঙ্গে দুটো হয় না। ঠাকুর ভক্তদের, অন্তরঙ্গদের বলতেন, তোমরা ‘চিন্তামণি’র খদ্দের। দেখতেন কিনা সব ভক্তরা ছুটে ছুটে যেতো। কত কষ্ট করে যেতো! হয়তো পায়ে হেঁটে মাঝ রাত্রিতে গিয়ে হাজির। পয়সা নাই, কি করে তাই হাঁটা। এই দেখেই বলতেন, ঐ কথা — ‘তোমরা চিন্তামণির খদ্দের।’ এই গানটি গেয়ে শুনাতেন — অন্তরঙ্গদের।

শ্রীম গাহিতে লাগিলেন —

গান। আপনাতে আপনি থাকো মন যেওনাকো কারো ঘরে।
যা’ চা’বি (চাইবি) তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।

পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চা'বি তা দিতে পারে।
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥

(কথামৃত ১/১২/৯)

জনৈক ব্রহ্মচারী প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখাইয়া শ্রীম ভক্তকে কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম — ইনি ভোর চারটা থেকে আরম্ভ করে সারাদিন, আর রাত্রি এখন পর্যন্ত কাজ করছেন। কয় ঘন্টা হলো? (গণনা করিয়া) আঠার ঘন্টা।

ব্রহ্মচারী — ঠাকুর তো কাজ করার কথা বলতেন না — ধ্যান ধারণার কথা বলতেন। তবে মঠে এসব কাজ কেন হচ্ছে — অত কাজ?

শ্রীম — এও তাঁরই ইচ্ছা। আর সবই তাঁর কাজ। সর্বভূতে তিনি আছেন এই ভেবে কাজ হচ্ছে — রিলিফ, স্কুল, হাসপাতাল, এই সবে। এই ভাবনাটি সঙ্গে থাকলে এ কাজই সাধন হয়ে যাচ্ছে, তাতে চিত্তশুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে তাঁর ধ্যান হয়। তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে যে কাজই করা যায়, তা ধ্যান জপের মতই হয়। এরূপ ভাবে কাজ না করলে ধ্যান হয় না। সামনে যা পড়বে তা করতেই হবে। তবে কাজ কাজ করে পাড়া বেড়ানো না হয়।

ব্রহ্মচারী — আমাদের তো অনেকটা এইরূপই হয়ে পড়েছে।

শ্রীম — এতেও তাঁরই ইচ্ছা আছে বলতে হবে। তিনি যখন কারোকে দিয়ে protest (আপত্তি) করাচ্ছেন না, তখন বুঝতে হবে তাঁর মত আছে। অমত হলে কোন strong man (বড় লোক) দাঁড় করিয়ে protest (আপত্তি) করাতেন।

ব্রহ্মচারী — আগে সাধনভজন না করলে কি করে বোঝা যাবে তিনি সর্বভূতে আছেন?

শ্রীম — হাঁ, আগে সাধন ভজন করা খুব দরকার। তা না হলে কি করে বোঝা যাবে? তিনি বুঝিয়ে না দিলে বোঝবার যো নাই। কাজ ও ভজন একসঙ্গে চলবে। মাঝে মাঝে কাজ ছেড়ে দিয়ে

কেবল ভজন। এইভাবে ভিতরে একটা ভাব স্থায়ী হলে তখন কাজই ভজন হয়ে যায়। প্রথম work and worship (কর্ম ও উপাসনা) করতে হয়। পরে work is worship (কর্মই উপাসনা) হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম গুরুবাক্য শুনে কাজে লাগা, কাজ করা। সঙ্গে ভজন থাকলে গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হয়। ক্রমে যখন কাজ উপাসনা হয় — ধ্যানের কাজ করে।

২

পরদিন সকালবেলা সাড়ে আটটা। শ্রীম বিনয় ও জগবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া গদাধর আশ্রম হইতে বাহির হইলেন। এদিক ওদিক বেড়াইয়া বলিলেন, "আজ দক্ষিণেশ্বরে গেলে হয়।" তারপরই তিনজনে আসিয়া ট্রামে উঠিলেন। বিনয়কে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। জগবন্ধুকে কোন কার্যে কলিকাতা পাঠাইলেন।

এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মর্টন স্কুলে অবস্থান করিতেছেন। চারতলার ঘরে চেয়ারে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য — ভক্তগণ পূর্বমুখী। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত। বড় জিতেন ও ছোট জিতেন আসিয়াছেন। একটু পরে এটর্ণি বীরেন আসিলেন। আজ খুব শীত পড়িয়াছে। কথা প্রসঙ্গে নিষ্কাম কর্মের কথা উঠিল।

শ্রীম (বীরেনের প্রতি) — 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'। (গীতা ২/৪৭) (কর্মে তোমার অধিকার — ফলে নহে) এর দৃষ্টান্ত ভরত। রাজ্য শাসন করছেন কিন্তু নিজে কিছুই ভোগ নিচ্ছেন না। আবার রাজধানীতে রইলেন না পাছে ভোগবিলাসে মন যায়। সেইজন্য নন্দীগ্রামে কুটীরে রইলেন। ফলমূল আহার করে চৌদ্দ বৎসর কাটালেন। সারাদিন মাটিতে বসে 'রাম রাম' করছেন। এক আধবার রাজ্যের কথা হচ্ছে, বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র এঁরা গেলে। এই হলো গৃহে থেকে নিষ্কাম কর্মের আদর্শ।

বীরেন — তেমন কি আমরা পারি?

বড় জিতেন — আমাদের দেহের জন্য ভাবতে হয়। তারপর যারা কর্মফলে সঙ্গে আছে তাদের ভাবনা। আমাদের কি নিষ্কাম হওয়া সহজ?

শ্রীম — তাই ঠাকুর বলেছিলেন বিবেকানন্দকে। ইনি বলতেন, এইসব কথা — টাকাকড়ি, মা ভাই বোন, পিতৃবিয়োগের পর। তিনি শুনে বললেন, দেখ লোক দু'রকম শোক করে আত্মীয়স্বজন মরলে। একরকম আছে শরীরের সব অলঙ্কার খুলে বাক্সে তুলে রাখলো — সামান্য কগাছা খারাপ চুড়ি হাতে রেখে দিলো। আর ময়লা একখানা কাপড় পরলো। তখন চীৎকার করে বলতে লাগলো — 'ওগো, আমার কি হবে গো — সর্বনাশ হয়ে গেল গো।' এ হলো সেজেগুজে শোক — stage-managed. আর একরকম আছে, আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে একেবারে বেহুঁস, বাহ্যজ্ঞানশূন্য — পোষাক-পরিচ্ছদ সব নিয়ে মাটিতে পড়ে আর্তনাদ করে অজ্ঞান। এটি খাঁটি শোক। (বীরেনের প্রতি) তাঁর জন্য ব্যাকুলতা থাকলে হয়। ভরতের হলো কি করে রাজা হয়েও? নিষ্কাম কর্মের উজ্জ্বল উদাহরণ ভরত।

বড় জিতেন — মশায়, আমাদের আলস্য হয়।

শ্রীম — ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম যে করবে তার শত হস্তীর বল হয় — যেমন হনুমান। রামের কাছে দীনহীন — কিন্তু লঙ্কায় একা কি কাণ্ড করলেন ! হবে না কেন — রামচিন্তা যে তাঁর রয়েছে, ঈশ্বরের জন্য যে করছেন, তাই অত শক্তি। আলস্য তমোগুণের লক্ষণ। নিষ্কাম কর্মীর কথা ভগবান বলেছেন গীতায় —

'মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে'।।

(গীতা ১৮/২৬)

ধৃতি মানে patience, উৎসাহ enthusiasm থাকবে প্রচুর নিষ্কাম কর্মীর। কারণ তাঁর আদর্শ কত বড় — ঈশ্বর।

শ্রীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পুনরায় কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আর ভাল লাগছে না এইসব কর্মস্থলে

থাকতে। গদাধর আশ্রমে বেশ থাকা যাচ্ছে। কালীক্ষেত্র, গঙ্গাতীর, ঠাকুর, সাধুসঙ্গ সব আছে। আবার প্রসাদ ভক্ষণ সর্বদা। এ সব কর্মস্থলে থাকতে গেলেই আর এক রকম হয়ে যায় মন। এ বয়সে কি আর কাজ ভাল লাগে? তার চাইতে মাঝে মাঝে এসে instruction (উপদেশ) দিয়ে যাওয়া — এ বেশ।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — মণ্ডল মোটর সারভিসে গিছলাম আলমবাজার, বাগবাজার থেকে। সেখান থেকে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর যাই। কি সুবিধা হয়েছে এতে। দক্ষিণেশ্বর মন্দির পর্যন্ত যায় তো বেশ হয়। (জগবন্ধুর প্রতি) আপনারা পঞ্চাশ নম্বর আমহার্ষ্ট স্ট্রীট থেকে একটা দরখাস্ত করে দিন কতকগুলি নাম সই করে। আর কাশীপুর থেকে ডাক্তারবাবুরা একটা করুক। ছেড়ে দেওয়া যাক দু'টো। লোকের সুবিধা হবে খুব। চেষ্টা করে দেখা যাক না। আলমবাজার তো যাচ্ছে আর ঐটুকু গেলেই হয় — মাইলটাক।

জগবন্ধু — 'আনন্দবাজার' আর 'দৈনিক বসুমতী'তে লিখলে হয়। সত্যেনবাবু ঠাকুরের ভক্ত, আর বসুমতীর মালিক সতীশবাবুও ভক্ত।

শ্রীম — হাঁ, ঠিক কথা। আমাদের নাম করে সত্যেনবাবুকে আর উপেনবাবুর ছেলেকে বলবেন। ওঁরাও ভক্তলোক। নিজেদেরই interest (স্বার্থ) আছে। একজনকে লেগে থাকতে হয় এইসব কাজে। ভাড়াও বাড়াতে পারে, কোন আপত্তি হবে না। আমরা কত কষ্ট করে যেতাম ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বর। ফিরবার সময় হেঁটে বরানগর এসে শেয়ারের গাড়ীতে শোভাবাজার। গাড়ী না পেলে দক্ষিণেশ্বর থেকে সারাপথ হেঁটে কলকাতায় ফিরতাম — সাত আট মাইল রাস্তা। সেই কষ্টের তুলনায়, এখন কত সুখ — স্বর্গ সুখ। তাই ভাবছি, weekএ (সপ্তাহে) দু'বার করে যেতে চেষ্টা করবো if not thrice (না হলে তিনবার)।

১১-১-২৪

৩

গদাধর আশ্রম। রাত্রি পৌনে দশটা। শ্রীম মেঝেতে কার্পেটে বসা — কাছে লালবিহারীবাবু বসা। ঘরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। শ্রীম-র মাথায় অ্যাশ কালারের কমফোর্টার, গায়ে লালইমলির সোয়েটার, তার উপর ওয়ার ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবী। এ সবের উপর একটি র‍্যাপার জড়ান। কলিকাতা হইতে একটি ভক্ত আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন। ভক্ত বেদান্ত সোসাইটিতে গিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দজী বলিয়াছেন — 'অবতার যাকে যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। যখন ইচ্ছা তখনই করতে পারেন — সময়ের ঠিক নেই। মন্মথ ভট্চাযকে ঠাকুর ইচ্ছামাত্র বদলিয়ে দিলেন। আবার গিরিশ — কোথায় ছিলেন, ঠাকুরের কৃপায় কোথায় উঠলেন! তখন ঠাকুর বলতেন, 'গিরিশের কি বিশ্বাস, আঁকড়ে ধরা যায় না — পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠিক কথা। ঠাকুর মন্মথবাবুকে এমন করে দিছলেন — শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুখে খালি, 'প্রিয়নাথ প্রিয়নাথ'। সর্বদা এই মন্ত্র জপ চলছে। অন্যদিকে খেয়াল নেই। প্রথম যখন যান ঠাকুরের কাছে তখন দূর থেকে দেখে বলেছিলেন, 'ঐ একটি ভক্ত আসছে।' এই কথা শুনে ভক্তরা ঐদিকে তাকিয়ে নবাগত ভক্তকে দেখতে লাগলেন। তাঁরা দেখলেন, নবাগত একনম্বরের বাবু। গায়ে আদ্দির ফিনফিনে পাঞ্জাবী, পায়ে কাল বার্নিশ পাম্প সু আর মাথায় বাঁকা টেরী। ভক্তরা দেখে ভাবতে লাগলেন, এ ব্যক্তি কি করে বড় ভক্ত হতে পারে? যেমন ইয়ারের সঙ্গে লোক ব্যবহার করে থাকে, তেমনি ঠাকুর তার গলা জড়িয়ে ধরলেন হাত দিয়ে। মন্মথবাবু খুব পালোয়ান লোক ছিলেন — তাঁর হাতে গুলি ছিল। ঠাকুরের সঙ্গে কালীবাড়ির ভিতরের উঠোনে বেড়াতে বেড়াতে তিনি বলছিলেন, 'একদিন শিবপূজার বেলপাতা নেই। ভারি ভাবিত হয়েছি — কি দিয়ে পূজা হবে। এমন সময় একতাড়া সাজানো বেলপাতা — একেবারে তাজা — সঙ্গে দু একটা কাঁটা আছে, ধপ করে উপর

থেকে পড়ে গেল।' শিবভক্ত ছিলেন। ঠাকুর অনেকদিন ভক্তদের ঐ ঘটনাটি উল্লেখ করে বলতেন, 'বল দেখি, অমন হলো কেন? বাবুটি বলছিল, বেলপাতা উপর থেকে পড়লো।'

শ্রীম (ব্রহ্মচারীর প্রতি) — ওটি বলতেন কেন? লোকের এমনি বিশ্বাস হয় না — অলৌকিক কিছু না দেখলে। তাই ঐ আশ্চর্য ঘটনার কথা বলতেন, যদি বা একটু বিশ্বাস হয়। আরে আশ্চর্য তো সবই! — চক্ষু দেখছে, কান শুনছে, মুখ ও জিভ শরীরের আহার ও আস্বাদ যোগাচ্ছে। তারপর লিভার, স্প্লিন, স্নায়ুমণ্ডল — nervous system এই সবই তো আশ্চর্য। এইটুকু সরষের মত বীজ থেকে, এতবড় অশ্বত্থ বৃক্ষ। সূর্য আলো দিচ্ছে তবে জগৎ বেঁচে আছে। চন্দ্রকিরণে শস্য হচ্ছে। সবই আশ্চর্য। রোজ হচ্ছে বলে লক্ষ্য নাই। দেখ না আমাদের জন্ম — এতটুকু বীজ, চক্ষে দেখা যায় না এত ছোট — মায়ের পেটে ঢুকলো, তা থেকে — এই হাড়, এত মাংস আর এই প্রকাণ্ড দেহটা হলো। আবার এরই সঙ্গে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার। আবার কামক্রোধাদি রিপু যার জ্বালায় লোক অস্থির। এদিকে আমাদের খেয়াল নাই। এতো আশ্চর্য সব তবুও আর একটু না দেখলে হয় না। রোজ দেখে এগুলি আশ্চর্য বলে মনে হয় না। সব আশ্চর্য। আমরা আশ্চর্যসাগরে ভাসমান। চৈতন্য তো হয় না মানুষের এত দেখেও, তাই বলতেন ঐ বেলপাতার কথা। শিখেরা তাই ঈশ্বরকে 'বা (ওয়া) গুরু' বলেন। মানে জগৎটিই আশ্চর্য — তার কর্তাও আশ্চর্য — সব আশ্চর্য!ঋ

শ্রীম (ভক্তের প্রতি) — একদিন আমরা গেছি বাগবাজার মন্মথবাবুর কাছে। দেখেই চিনলেন। আমরা ঠাকুরের কাছে যেতাম দেখেছেন, শুনেওছেন অপরের কাছে, তাই প্রণাম করলেন। শুধু প্রণামই করলেন। কিন্তু অন্য কোনও কথা জিজ্ঞেস করেন নাই। মুখে সর্বদা — 'প্রিয়নাথ প্রিয়নাথ।' অন্য কথা বলবার অবসর কোথা। অন্যাঃ বাচঃ বিমুঞ্চথ — (মুণ্ডক ২/২/৫) এই অবস্থা এঁর। শিবমন্দিরের বারান্দায় বসে সদা এই মন্ত্র জপ করছেন। মেঝেতে

বসে বসে অসুখ হলো। শেষে কলেরায় দেহত্যাগ হয়। সর্বদা ঐ আসনে আছেন। স্নান ও শৌচের সময় একটু সরে যেতেন বোধ হয়। শেষ মুহূর্তেও ‘প্রিয়নাথ’ এই মন্ত্র জপ করেছিলেন। ওঁর এক বন্ধু ছিল — তার নাম প্রিয়নাথ। লোকে বলতো ঐ বন্ধুর নাম জপ করছেন। কিন্তু তা নয় — ‘প্রিয়নাথ’ মানে Dear Lord — প্রিয় ঈশ্বর। ঈশ্বর, আত্মা সকলের প্রিয়। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই কথা বলেছিলেন। পতিপুত্র, ধনজন সব প্রিয় কেন? প্রিয় আত্মা, প্রিয়নাথ সকলের ভিতরে রয়েছেন তাই। সেই প্রিয়নাথকে জানা। তা হলেই মনুষ্য জীবনের কার্য শেষ হলো। মন্মথবাবু তাই করছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন যার যে নামটি ভাল লাগে সেই নাম জপ করবে। মন্মথবাবুর এটি ভাল লাগে, তাই সদা বলতেন ‘প্রিয়নাথ’।

শ্রীম কিছুকাল মৌন হইয়া রহিলেন — কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (মোহনের প্রতি) — পড়েন ঐ poem-টি (কবিতাটি) — 'He will not come' (তিনি আর ফিরে আসবেন না)। একটি কুকুর তার মাষ্টারের সমাধির উপর বসে থাকতো সর্বদা — আহার-বিহার সব ত্যাগ করে। ক্রমে শীত এলো। রোগা হয়ে গেল। স্কুলের ছেলেরা গ্রীষ্মে কখনও খাবার দিত আর আদর করে বলতো — 'He will not come' (তিনি আর ফিরে আসবেন না)। খুব শীত ওদেশে, আর চেষ্টা নাই আহারের। স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, ছেলেরাও খাদ্য দিচ্ছে না। তাই খুব রোগা হয়ে গেছে — মুমূর্ষু অবস্থা। সমাধির নিচে গড়িয়ে পড়ে গেল। ওখানেই বসে আছে। কিন্তু যেই প্রাণ যাবার সময় হয়েছে, সেই মুহূর্তে একলাফে সমাধির উপর গিয়ে পড়লো। তখনই সেখানে প্রাণ বিসর্জন হলো। এটি পূর্ণ প্রেমের উদাহরণ। দেহ যে অত প্রিয় তার উপরও লক্ষ্য নাই — জানোয়ার হয়েও এমন জিনিষ প্রেম, ভালবাসা।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ললিত মহারাজের এখন এই অবস্থা — সকলে বলছে, পাগল। এ বললে তো আরোও পাগল হয়ে যাবে।

ফ্রেণ্ডস্‌দের উচিত এখন যাতে ভাল সেবা পায় তা দেখা। বেশী ঈশ্বর চিন্তা করে করে ও রকম হয়। কি খাটুনী — সারারাত জেগে পূজো করছে দিনের পর দিন। তারপর মঠ চালানোর জন্য টাকা তোলার চেষ্টা রয়েছে। দু'টি দল আছে। একদল ভাবটাব মানে না, জ্ঞানমার্গী। আর একদল মানে। বাবুরাম মহারাজেরও মাঝে মাঝে এ রকম হতো। ঐ দলের লোক ভালবাসতো না। তা তুমি ভালবাস আর নাই ভালবাস। ঠাকুর যখন এ দিয়েই এত করে গেছেন, তখন কি করে আর একে অমান্য করা যায়? ঠাকুরের ভাব দেখে একজন বলেছিলেন, 'আপনার যা অবস্থা দেখছি, তাতে মনে হয় আঙ্গুর যেমন তুলোর উপর রাখে তেমনি আপনাকে রাখা দরকার।'

১৩-১-২৪

৪

মর্টন স্কুল। পঞ্চাশ নম্বর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, চারতলা বাড়ি। দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির ডানের দিকের ঘরে ভক্তদের বসিবার স্থান। এখানে স্কুলের একটি ক্লাশ বসে। ঘরে ছয়টি বসিবার লম্বা বেঞ্চ আছে এবং তাহার সহিত পুস্তকাদি রাখিবার হাইবেঞ্চ সংযুক্ত রহিয়াছে। চারখানা বেঞ্চে উত্তরাস্য হইয়া বসিতে হয়। আর দুইখানা পূর্বের দেয়ালের গায়ে উত্তর দক্ষিণ লম্বমান রহিয়াছে। এতে যারা বসে তাহাদের মুখ পশ্চিমাস্য হয়। শিক্ষকের বসিবার চেয়ার গৃহের উত্তর দিকে। ইনি দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া বসেন। গৃহটি বিশ বাইশ ফুট দীর্ঘ প্রস্থে। চারিটি দরজা — দুইটি দক্ষিণের বারান্দায় আর দুইটি উত্তরের বারান্দায়। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উত্তরের দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। কখনও ছুটিতে সব বেঞ্চ বাহির করিয়া মেঝেতে মাদুরে বসেন সকলে। এই গৃহের দক্ষিণ দিকে নিচে দরিদ্র শ্রমজীবীদের পল্লী। গৃহে প্রবেশ করিবার উত্তর পূর্ব দরজার পাশে বেঞ্চিতে শ্রীম বসিয়া আছেন — সম্মুখে সংযুক্ত হাইবেঞ্চ। তিনি পশ্চিমাস্য। শ্রীম-র বাঁদিকে ভক্তগণ উত্তরাস্য হইয়া বেঞ্চিতে বসা। বড় জিতেন, ছোট

জিতেন, বড় অমূল্য, ছোট অমূল্য, রমণী, বন্ধুসহ সুখেন্দু, গদাধর, অশ্বিনী, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তগণ রহিয়াছেন। শ্রীম আজকাল ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে থাকেন, মাঝে মাঝে এখানে আসেন। ভক্তগণ রোজই এখানে একত্রিত হন। কেউ কেউ রোজ গদাধর আশ্রমে গমন করিয়া থাকেন।

আজ শুক্রবার। গত মঙ্গলবার গদাধর আশ্রম হইতে আসিবার সময় কথামৃতের manuscript (পাণ্ডুলিপি) শ্রীম-র ডায়েরীর একটি খাতা কালীঘাটের ট্রামে এ্যাসপ্লেনেডে ভুলক্রমে ফেলিয়া আসেন। বহু কষ্টে উহা পাওয়া গিয়াছে। পুস্তকখানা হারানোর পর শ্রীম যেন শতপুত্রশোকে জর্জরিত ছিলেন। পাওয়া যাওয়ায় আনন্দ হইয়াছে। আজ ভক্তদের সঙ্গে এই সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দু'দিন কি শোক গেছে — পুত্রশোকেরও অধিক। গত মঙ্গলবার গদাধর আশ্রম থেকে ফিরবার সময় ট্রামে কথামৃতের ডায়েরী ফেলে এলাম ভুলে। ঠাকুরবাড়ি এসে মনে হয় তখন বেলা প্রায় এগারটা। তখনই তাড়াতাড়ি ঠনঠনে কালীবাড়িতে গেলুম। ট্রাম থেকে নেমে মাকে দর্শন করে এসেছিলাম। ভাবলুম যদি বা ওখানে ফেলে আসা হয়। ওখানে বসে পণ্ডিতরা সব পাঠাদি করেন। তাঁদের জিজ্ঞেস করলুম বই দেখেছেন কিনা। কেহ কোন সন্ধান দিতে পারলেন না। তখন ট্রামের টিকিটের খোঁজ করলুম। ওটা ছিঁড়ে ফেলে দিছলাম । ঐ টুকরোগুলো সব খুঁজে রাস্তা থেকে নিয়ে এলুম। পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগলো। বাড়ি এনে ঐগুলো ময়দার আটা দিয়ে কাগজে লাগাই। তখন নম্বর পাওয়া গেল। তারপর ভবানীপুর আশ্রমে ফিরে যাই। টিকিটের নম্বর দিয়ে ট্রামের কনডাক্টারের সন্ধান পাওয়া গেল। গদাধর আশ্রমের ভক্তরা সন্ধ্যার সময় কালীঘাট ডিপোতে গিয়ে খোঁজ করেন। পরদিন, বুধবার সকালবেলা সংবাদ এলো পুস্তক পাওয়া গেছে। কনডাক্টার ডিপোতে জমা দেয়। তখন উহা ওভারসিয়ারের হাতে পড়ে। ইনি ভক্তলোক। বইয়ের উপর লেখা আছে 'ঁজয়রাম বাটী' — এই দেখে ইনি খুব

যত্ন করে রেখেছেন।

শ্রীম (অশ্বিনীর প্রতি) — সন্ধ্যার সময় ঠাকুরের কাছে কত প্রার্থনা করেছি। বই পাওয়া গেছে শুনেও ভয় যাচ্ছে না। আনবার সময় আবার হারিয়ে না ফেলে। কত ভয়, কত ভাবনা গেছে। কত প্রার্থনা করেছি। হাতে যখন ফিরে এলো তখন কি আনন্দ! কিন্তু তখন মনের আর একটি অবস্থা হলো। তখন ভাবতে লাগলাম, কি আর তেমন হলো। ভুলে ফেলে এসেছি ট্রামে, কনডাক্‌টর তুলে নিয়ে অফিসে জমা দিল। এতো most natural (খুব স্বাভাবিক)। এতো যে প্রার্থনা করলাম, বই পাওয়ার পর এর কোন অর্থ আছে বলে মনে হতে চায় না। এমনতর মন আমাদের। পেলে অন্য রকম হয়ে যায়। কত রকম accident (দুর্ঘটনা) হতে পারতো। কন্ডাক্টারের বাহ্যে পেতে পারতো, কি গাড়ী একটা মানুষ চাপা দিতে পারতো। তখন কে এই সামান্য জিনিষ, হাতে লেখা বইয়ের, খবর করতো?

বড় জিতেন — ঝাড়ুদারদের হাতে পড়তে পারতো।

শ্রীম — হাঁ, তা হতে পারতো, কি অন্যে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারতো। পড়ে আছে উঠিয়ে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল। কত রকম হতে পারতো। বই পাওয়ার পর এ সব কথা ভুল হয়ে গেল। তখন মন বলছে, কি আর হয়েছে, ফেলে এসেছ আইনমত ঐ জিনিষ অফিসে জমা হয়ে গেছে — সেখান থেকে ফিরে পেয়েছ। কি আর এতে আশ্চর্য! এই মন নিয়েই ঘরে বাস — ভেলকী খেলায়। তাই সর্বদা প্রার্থনা, লক্ষ্যভ্রষ্ট না করান। আজ গুরুবাক্যে বিশ্বাস হলো কালই বললে মন — এতে লাভ নাই ছেড়ে দাও পথ। মন মানুষকে নাচাচ্ছে। মন যার হাতে তাঁর শরণ নেওয়া। তাই লোকশিক্ষার জন্য ঠাকুর সর্বদা বলতেন, 'ভুলিও না মা, ভুলিও না'।

সংসার চলছে এই রকম। কার্য উদ্ধার হয়ে গেলে তখন ঈশ্বরকে ভুলে যায় মানুষ। প্রার্থনা, কান্নাকাটা, হত্যাদেওয়া কত কি! যেই ছেলেটি হয়ে গেল, অমনি কে আর যায় তারকনাথে! তখন তাঁকে ভুলে যায়। ছেলেটি পেয়ে তাঁকে ভুল হয়ে গেল। তিনিই করাচ্ছেন

এ খেলা — নয়তো সংসার চলে না। সকলে তাঁকে শরণ রাখলে কি করে খেলা হবে? তাই ভুলিয়ে দেন। আবার দুঃখে পড়ে কাঁদে — আবার দুঃখ দূর করেন। এইরূপে চলতে থাকে। শেষে যখন এতে বিরক্ত হয়ে যায় তখন তাঁকে খালি চায়। অন্য জিনিষে মন থাকে না — একটানা ভাব বইতে থাকে। তাঁর দর্শনের পরও মনের অবস্থা বদলায়। মনের স্বভাবই এই। কিন্তু তখন আর পথভ্রষ্ট করতে পারে না। কিন্তু বদলানো মনের ধর্ম।

শ্রীম আহার করিতে তিনতলায় উঠিতেছেন। ভক্তদের বলিতেছেন, Rejoice ye all, for I have got the lost son (হারিয়ে যাওয়া ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে, তোমরা এবার আনন্দ কর!) আহারান্তে ফিরিয়া আসিলেন। এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। জগবন্ধু দরখাস্তে সকলের সহি লইতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — হাঁ, সই করিয়ে নিন। কাজটি হয়ে গেলে খুব ভাল হয়। তাঁর ইচ্ছা হলে হয়ে যাবে হয়তো — এইটুকু রাস্তা আলমবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বর। এইটুকু বাসকোম্পানী বাড়িয়ে দিতে পারে অনায়াসে। আগে এসব সুবিধা থাকলে রোজ যেতাম। এখন যে কত বড় সুযোগ তা বেশ বুঝতে পারছি। শোভাবাজার থেকে পাঁচ পয়সার শেয়ারে বরানগর, সেখান থেকে একক্রোশ হেঁটে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যেতাম। কোনও দিন শেয়ারের গাড়ী পাওয়া যেতো না, তখন ফিরে আসতাম বাড়ি। দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরবার সময় প্রায়ই সারারাস্তা হেঁটে কলকাতা আসতাম। এখনকার মত সুবিধা থাকলে রোজ সঙ্গে থেকে তাঁর সব অবস্থা দেখতাম। আমরা তো সব অবস্থা দেখতে পারি নাই — তাঁর মুখে শুনেছি। নিজেই বলতেন, আমার এই এই অবস্থা হয়েছিল।

বড় জিতেন — ঐ আশ্বিনের ঝড়ের সময়ের সব কথা (ঠাকুরের কঠোর সাধনার কথা)।

শ্রীম — হাঁ ঠাকুর বলেছিলেন, 'ঐ সময় সকলে মনে করলে আমি পাগল হয়ে গেছি।' ১৮৫৮-৫৯-এ। তারপর বিয়ে হলো —

যদি ভাল হন। ব্রাহ্মণীই প্রথম বললেন, ‘এ পাগল নয় — প্রেমোন্মাদ। চৈতন্যদেবের এ অবস্থা হতো — ইহা মহাভাব। এসব শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।’ কিন্তু যে পর্যন্ত না বৈষ্ণবচরণও এই কথা বললেন ততদিন কারোও বিশ্বাস হয় নাই। দুজনের কথা মিল হয়ে গেলে তখন সকলের বিশ্বাস হতে লাগলো।

বড় জিতেন — অন্তরঙ্গরা যাবার আগে কেউ যায় নাই কি?

শ্রীম — শম্ভু মল্লিক, কেশব সেন, নারায়ণ শাস্ত্রী — আরো কেউ কেউ যেতেন। অন্তরঙ্গরা বাইশ তেইশ বছর পরে গেলেন — সকলেই প্রায় একসঙ্গে। তিনি বলেছিলেন, কুটীর ছাদ থেকে কেঁদে কেঁদে বলতাম আরতির সময়, ‘তোরা কে কোথায় আছিস আয়রে। আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে’। তাঁরা যখন গেলেন তখন কত আনন্দ, কি ভালবাসা! আবার ভাবনাও, পালিয়ে না যায়। একবার শ্যামাপূজার পরদিন সকালে যাত্রাগান হচ্ছে মন্দিরে। আমি প্রণাম করলাম কলকাতায় ফিরে আসবো। ঠাকুর বললেন, ‘এতো শীগ্‌গীর যাবে?’ আমি বললাম, ‘সিঁথিতে বেণী পালের বাগানে দেখা করবার চেষ্টা করবো তাই আগে যাচ্ছি। ঠাকুর ঐ দিন বিকালে যাবেন ওখানে — ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। সর্বদা ভয় আবার অন্তরঙ্গরাও পালিয়ে না যায়।

শ্রীম মৌন হইয়া কি ভাবিতেছেন, পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মানুষের প্রকৃতি দুরকম। এক প্রকৃতির লোক দিয়ে সংসার করাচ্ছেন। আর এক প্রকৃতির লোকের সংসার ভাল লাগে না। এ থাকের লোকদের কাজকর্ম কমে গেছে। কিসে তাঁকে পাওয়া যায় তার জন্য তাঁরা ব্যাকুল। এঁরা যোগী। আবার আর এক রকম প্রকৃতি আছে, এদের দুই-ই আছে — যোগ ও ভোগ। যোগই প্রধান। তাই এরাও যোগীদের দলে। তাদেরই বিয়ে করতে হয় — সংসারধর্ম করতে হয়। কাজ না করলে সংস্কার ঘোচে কি করে? তাই বিয়ে তাঁকে লাভ করার জন্য, কাম সেবার জন্য নয়। আর একরকম প্রকৃতি তারা খালি ভোগ চায়। এরও দু’ভাগ আছে। একভাগ খালি ভোগী, উচ্চ চিন্তা নাই — যেমন পশুদের উচ্চ চিন্তা

নাই। আহার বিহারাদিতে তুষ্ট। আর একভাগ আছে তারা বলে ঈশ্বর আছেন, তিনি সব দেন চাইলে। তাই তাঁর কাছে ধনদৌলত পুত্র নামযশ এ সব চায়। জ্ঞান ভক্তি চায় না। এরাও ভোগী, কিন্তু ঈশ্বরকে কর্তা বলে জানে, এরা কতকটা ভাল। যোগী আর ভোগী এ দু'টি প্রধান ভাগ। যোগী আবার দু'ভাগে — শুদ্ধ যোগী যেমন মৌমাছি, যেমন শুকদেব, আর যোগী-ভোগী যেমন পাণ্ডবগণ। ভোগীও দুই থাকের — এক থাক্ ঈশ্বরকে স্বীকার করে — অন্য থাক্ তা করে না। এদের, এই শেষ থাকের কথাই গীতায় আসুরিক সম্পদ বলেছেন। প্রথম দু' থাকের নিষ্কাম ভক্তি আছে, এরাই তাঁকে চায় আগে — এ ভাল।

কলিকাতা, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯২৪ ৪ঠা মাঘ, ১৩৩০
শুক্রবার, শুক্লপক্ষ দ্বাদশীতিথি।

চতুর্থ অধ্যায়
'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'

১

মর্টন স্কুল। সকাল সাড়ে নয়টা। শ্রীম দ্বিতলের সিঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন পূর্বাস্য। তাঁহার বাম হাতে বড় জিতেন দক্ষিণাস্য। উভয়ে কথা কহিতেছেন। একটি ভক্ত সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া শুনিলেন ঃ

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ঠাকুর হাসতে হাসতে বলতেন, যে যতই বোঝ, যতই খেলোয়াড় হও, সব তাঁর 'অণ্ডারে' (আণ্ডারে — অধীনে)। লোকে কত কষ্ট করে একটা সত্য বোঝে। আর তিনি সব সত্য বুঝে ভরপুর হয়েও এই কথা বলছেন। যে যতটুকু বোঝ, গর্ব করবার, অহঙ্কার করবার যো নাই। অনন্ত কাণ্ড — আরো কত কি আছে। একথা কি সকলে বুঝতে পারে। 'He that is able to receive it, let him receive it' (যে অধিকারী সেই বুঝতে পারে।)

এখন অপরাহ্ন পাঁচটা। শ্রীম ঠাকুরবাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। আজ সারাদিনই কলিকাতায়। গদাধর আশ্রমে যাওয়া হয় নাই। শনিবার বলিয়া ভক্তগণ অনেকেই আসিয়াছেন — কেহ স্কুলবাড়িতে কেহ ঠাকুরবাড়ীতে। বড় জিতেন দুইটি ছোট মেয়ে লইয়া স্কুলবাড়িতে আসেন। বিনয়, ছোট অমূল্য, ভাটপাড়ার ললিত, বসন্ত ও সঙ্গী, সিদ্ধেশ্বর, জগবন্ধু প্রভৃতি কেহ ঠাকুবাড়ির ভিতরে, কেহ সামনের গলিতে অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীম উপর হইতে বিনয়কে বলিলেন, 'সকলকে নিয়ে স্কুলবাড়ি যাও — আমি আসছি।' ওখানেও বহু লোক। ফরিদপুরের একজন ভক্ত আসিয়াছেন, যতীনের সঙ্গেও

একজন নূতন লোক আসিয়াছেন। সকলে দ্বিতলের সিঁড়ির ডানদিকের ঘরে বসিয়াছেন। শ্রীম মেঝেতে উপবিষ্ট। বড় ললিত বাল্মীকিকৃত গঙ্গার স্তব পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন।

মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি, বসুধা-শৃঙ্গারহারাবলি
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং, ভাগীরথীং প্রার্থয়ে। (স্তোত্র-১)

বড় ললিত (পাঠান্তে শ্রীম-র প্রতি) — আপনার শরীরটা কিন্তু বড়ই খারাপ দেখছি। বসন্তবাবু বলছিলেন, বাগবাজারে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকলে বেশ হয়। টানা-হেঁচরাতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়। এক জায়গায় থাকলে কেমন হয়?

শ্রীম — না, এ দু'তিন দিন একটা শোক করছিলাম। তাতেই শরীর এমন দেখাচ্ছে। পুত্রকন্যার প্রতি যেমন লোকের মমতা হয় একসঙ্গে থাকতে থাকতে, তেমনি আমরা যাঁকে ধ্যান করছি বিয়াল্লিশ বছর ধরে, যার একটি কথা শুনবার জন্য চাতকের মত চেয়ে থাকতাম সেই 'কথামৃত' হারিয়ে গিছলো। ভক্ত-ভাগবত-ভগবান এক — এ তাঁরই কথা। তাঁর কথামৃত, তাঁর ভাগবত হারিয়ে গিছলো। তাঁর একটি কথার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতাম। আর এই বইয়ে কত কথা ছিল! এতদিন ধরে সেই ভাগবতের চিন্তা করেছি, পূজা করেছি, সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা রেখেছি — এতো ঘর করেছি তা আর তার জন্য মমতা হবে না? সেই ভাগবত হারিয়ে যাওয়ায় শোক হয়েছিল। আবার তাঁর ইচ্ছাতেই পাওয়া গিয়েছে। তিনি শব্দব্রহ্মরূপেও আছেন। তাই ভাগবত আর ভগবান এক। ভাগবত মানে তাঁর কথামৃত। তাই শরীরটা খারাপ দেখাচ্ছে, খুব ধাক্কা গেছে।

টানা হেঁচরাতে কষ্ট হচ্ছে না, বরং ভাল হচ্ছে। ট্রামে চলতে বেশ ভাল লাগে। Weakness (দুর্বলতা) ক্রমে যাচ্ছে। গড়ের মাঠের ভিতর দিয়ে চলতে বেশ ভাল লাগে — change of sights and scenes হয় নূতন নূতন স্থান ও দৃশ্য দেখা যায়। আর বেশ fresh (টাট্‌কা) হাওয়া পাওয়া যায় মাঠে। ট্রামে চলাতে কোনও অসুবিধা নাই, আর ওখানে সাধুসঙ্গে থাকা যাচ্ছে।

ললিত — বাগবাজার থাকলেও 'উদ্বোধনে' যাওয়া যায়। ঐ তো খুব কাছে।

শ্রীম — না ওখানে বেশ, — গদাধর আশ্রমে। সারাদিনই ওখানে ঠাকুরের সেবাপূজা নিয়ে থাকে সব। 'উদ্বোধনে' তবুও টাকাকড়ি, বই বিক্রী এসব আছে। ওখানে ওসব কিছুই নাই।

সাধুসঙ্গের কি মাহাত্ম্য এঁদের সঙ্গে থাকলে বোঝা যায়। ওঁদের সারাদিনই অবসর। সারাদিন ভগবান চিন্তা হচ্ছে। পূজা, পাঠ, জপ, ধ্যান হচ্ছে। আশ্রমের যত কাজ, সব তাঁকে নিয়ে, তাই কাজের সঙ্গে তাঁর চিন্তা জড়িত রয়েছে। অবসর নেয় কেন? তাঁর চিন্তার জন্য। যে কাজে তাঁর চিন্তা হয় তাও অবসর বলা চলে। সেদিন হিসাব করে দেখা গেল একজন সাধু সকাল চারটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত আঠার ঘন্টা কাজ করছেন রোজ। এ কাজও অবসরতুল্য কেন না তাতে ভগবান চিন্তা হচ্ছে। তাঁর মঙ্গল আরতি, ভোগ, পূজা, নৈবেদ্য প্রস্তুত, ফুলতোলা, ঠাকুর ঘর ঝাড়ু দেওয়া এসব কাজ সহায় — কাজের মধ্যে নয়, তাই অবসর।

আর আমরা সব কি নিয়ে রয়েছি। চাকরী বাকরী, কাজকর্ম, ছেলেপুলে এসবে লোক tired (শ্রান্ত) হয়ে পড়ে, মন দুর্বল হয়ে যায়। আমাদের অবসর কোথায়? যাহোক রাত্রিতে বসলেও হয় ছাদের কোণে, কিন্তু তা হবার যো নাই — শরীর থাকবে না। সারাদিন খেটে খেটে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ি। সাধুদের তা নেই, তাঁদের সারাদিনই ঈশ্বরচিন্তা চলছে। ওঁদের কাছে থাকলে বোঝা যায় কি তফাৎ। আমি ওখানে থেকে বুঝতে পারছি কত তফাৎ। যোগে থাকা যায় ওঁদের ওখানে। নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় যোগে থাকেন ওঁরা। যোগ মানে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। আর কোনও বিষয়ে মন নেই; শুধু তাঁ'তে। আমি একবার ছিলাম কনখলে (১৯১২ খৃঃ) ছ'মাস। তখনও দেখেছি কি তফাৎ। কত অবসর তাঁদের। তার জন্যই সাধুসঙ্গ দরকার।

সোনা গালাতে বসেছে — পায়ে হাপর চালাচ্ছে, চোঙ্গে ফুঁ

দিচ্ছে, আবার হাওয়া করছে, একজনে একসঙ্গে সব হচ্ছে। তার মধ্যে যদি ডাক্তার ডাকতে হয়, ওষুধ আনতে হয় তা হলে আর সোনা গালান হয় না। সংসারীদের এইরূপ বাজে কাজে সময় চলে যায়। বাজে চিন্তায় মন থাকলে যোগ হবে কি করে? Concentration (একাগ্রতা) কোথায়?

ঠাকুর বলতেন, দুধ নির্জনে পেতে দই করে তা থেকে মাখন তুলে ফেললে আর ভয় থাকে না। হুররুর্ হুররুর্ শব্দ থেমে গেলে মাখন তোলা হয় না। ছেলেরা এম.এ, বি-এ, পাশ করে। একজন ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়ছে। তার কোনও বিঘ্ন নেই। আর একজন বাড়ির পাঁচটা কাজ করছে, অনেক বিঘ্ন। ডাক্তার ডাকতে হয়, অতিথিদের সৎকার করতে হচ্ছে, অনেক কাজ তার। এতো disturbance (বিঘ্ন), তা হলে কি করে পাশ হবে? তবে দু'একজন আছে এতো disturbance-এর (বিঘ্নের) ভিতরও পাশ করে। কিন্তু সে খুব কম।

শ্রীম (বসন্তের প্রতি) — গদাগর আশ্রমটি বেশ। উদ্বোধনও ভাল। তবে সেখানে টাকাকড়ির ব্যাপার আছে। প্রথম অবস্থায় ঐখানে নয়। যাঁরা সিদ্ধ হয়ে গেছেন, তাঁদের টাকাকড়ি নামযশের ভিতর থাকলেও কিছু হানি হয় না। প্রথম অবস্থায় এসব থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়। ঠাকুর বলতেন, গাছ যখন ছোট থাকে, পাছে ছাগল গরুতে খেয়ে ফলে, তাই বেড়া দিতে হয় চারদিকে। বড় হয়ে গেলে, তাতে হাতী বাঁধলেও কিছু হয় না। তাই প্রথম দূরে থাকতে হয়। সংসারীদের পথ বড় কঠিন। তাদের অতি সাবধানে চলতে হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — নারকেলের শাঁস আলাদা, খোল আলাদা। ভগবান দর্শন হলে, আত্মা আলাদা দেহ আলাদা বোধ হয়। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিনটি দেহ। এই তিনটিই আত্মা থেকে পৃথক। দেহ ও আত্মা এই দু'টি দুই জিনিষ। একটি নিত্য একটি অনিত্য। এ বোধ কেবল গুরু কৃপাতেই সম্ভব। সংসারীদের পক্ষে বড়ই কঠিন। কেশব সেনের মত লোককেই ঠাকুর কি বললেন! আমরা

তাঁকে পূজা করতুম — পূজনীয় ব্যক্তি। আর তিনি religion-এর (ধর্মের) একজন authority (সুযোগ্য অধিকারী) ছিলেন। তাঁকেই ঠাকুর বললেন, 'তুমি ঘরের একটি মাত্রা chink — (ফাঁক) দিয়ে আলো দেখছো।' আর সাধুরা flood of light (আলোর বন্যায়) এর মধ্যে আছে একেবারে উন্মুক্ত মাঠে।

শ্রীম (বড় ললিতের প্রতি) — প্রতাপ মজুমদার, কেশব সেনের শরীর, ত্যাগের পর বেদি নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করলেন! দু'টি দল হয়ে গেল। সুরেশবাবুর বাগানে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁকে বললেন, 'লেকচার-ফেকচার তো কত হোল, এখন দিন কতক ঈশ্বরকে ডাক।' একথা শুনে প্রতাপবাবু হয়তো অবাক হয়ে গেলেন। তিনি হয়তো মনে করলেন, 'ওমা উনি বলেন কি? তবে কি আমি ঈশ্বরকে এতদিন ডাকিনি!' ঠাকুর দেখতে পারতেন কিনা মানুষের infirmities (দুর্বলতা)। তাঁর কাছে চালাকি চলে না। একেবারে হক্ কথা শুনিয়ে দিলেন। Sense-world (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ) থেকে perfectly detached (সম্পূর্ণ নির্মুক্ত) না হলে তাঁর দর্শন হয় না। কেমন করে তিনি অন্য একটি light (দৃষ্টিভঙ্গী) দিয়ে দেখিয়ে দিলেন — এতদিন যা করেছ, এসব কিছুই নয়। এতে ভগবান লাভ হয় না। তাঁকে লাভ করতে হলে, ব্যাকুল হয়ে সব ছেড়ে কাঁদ, তবে সাক্ষাৎকার হয়।

২

ছোট নলিনী কালীঘাটের প্রসাদ আনিয়াছেন। ভক্তসঙ্গে শ্রীম প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পুনরায় গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন। ফরিদপুরের একজন ভক্ত বড় রমেশের পত্র লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাকে বলিতেছেন, 'আপনি আমাদের নাম করে লিখে দিন — আমাদের মত আছে। এখানে এসে কাকার সঙ্গে থেকে পড়াশোনা করতে পারে। ওখানে যখন শরীর ঠিক থাকছে না।' বড় জিতেন মেয়ে দু'টিকে বাড়িতে রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিতেই

শ্রীম তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — বুঝেছেন, ভক্ত ভগবান ভাগবত এক। ঠাকুর আরো বলতেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। বাবু সর্বত্র আসা যাওয়া করেন, কিন্তু বৈঠকখানায় দেখা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কারণ বেশীর ভাগ থাকেন ওখানে।

বড় জিতেন — তাই কি ক্রাইষ্ট বলেছিলেন — '.....he that hath seen me, hath seen the Father;' (St. John 14:9). (আমায় যখন দেখেছো তখন ঈশ্বরকে দেখার বাকী রইলো কীঃ?

শ্রীম — না, অন্য অর্থে বলেছেন একথা। এখানে অবতারের কথা বলছেন। ঠাকুর এই অর্থে ব্যবহার করেননি। ‘ভক্ত ভগবান ভাগবত এক’, ‘ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা’— এ সব স্থানে ‘ভক্ত’ general sense-এ (সাধারণভাবে) ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রাহ্মদের বলতেন ঐ সব কথা। ওরা তো অবতার মানে না কিনা তাই! সবাইকে তো আর এক কথা বলা চলে না। যে যেমন তার সঙ্গে তেমন। এ না করলে যে তার অপকার হবে। বিভিন্ন প্রকৃতি বিভিন্ন নাড়ী — তাই রুচি ভেদ। যার পেটে যেমন সয় তাকে তেমনি দিতে হবে। কারুকে মাছের ঝোল কারুকে ঝাল, কারুকে অম্বল — যাতে যার প্রবৃত্তি আর রুচি তাকে তাই দেওয়া উচিত। সকলের এক চলে না।

বিবেকানন্দ বিলেত থেকে ফিরে এসে আমায় বলেছিলেন, বলরামবাবুর বাড়ির ছাদে বেড়াতে বেড়াতে — ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, ‘তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়, এটা এখনও বুঝতে পারলুম না।’ মানে বেদান্তের সোঽহং আর অবতারতত্ত্ব এক নয়। এ আলাদা জিনিষ। কিন্তু পরে যখন বুঝলেন, তখন দেখ, কি স্তব লিখেছেন! বিবেকানন্দ স্তবস্তুতিতে যা বলেছেন, এর উপর আর কথা নেই। তুমিই বাক্য মনের অতীত পরমব্রহ্ম, তুমি সাকার, তুমি নিরাকার, তুমিই ইদানীং রামকৃষ্ণ বিগ্রহ — নররূপধারী। তোমার শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করলে মরণোর্মি নাশ হয়। পদ্মফুল ফুটতে দেরী

হয়। একবার ফুটলে অনেকদিন থাকে — সৌরভ দান করে। অন্য ফুল এই ফুটলো, এই শেষ। অবতারকে বোঝা কার সাধ্য! তিনি যাকে বোঝান সেই বোঝে। তাই ব্রাহ্মদের বলতেন ঐ কথা। তারা তো অবতার মানে না। ভক্ত বলে মানলেও কাজ হবে — কারণ ভক্ত ভগবান ভাগবত এক।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — Avatar is the highest manifestation of the Absolute (অবতার পরব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠ নররূপ)। ঈশ্বর মানুষরূপ ধরে আসেন, তারই নাম অবতার। তিনি মানুষের সব infirmities (দুর্বলতা) গ্রহণ করেন। তাঁর দুঃখকষ্ট দেখে, ত্রিতাপ দেখে, তবে তো মানুষ ভরসা পাবে। ভক্তগণ দেখেন, অবতার এত দুঃখকষ্টের ভিতরও সর্বদা মহাযোগে রয়েছেন — নিজের স্বরূপ জ্ঞান জাগ্রত রেখেছেন। তবে তো তারাও এইরূপ হতে চেষ্টা করবে। দুঃখকষ্টের ভিতর তাঁকে স্মরণ রাখবে। মানুষ সাধারণতঃ ভগবানের কাছে দেহসুখের দ্রব্যাদি চায় — ধন দৌলত মান যশ। এরূপ লোক দুঃখকষ্টে প'ড়ে বলে, ঈশ্বর নেই, থাকলে এত বললাম, শুনছে না। সকাম ভক্ত এইসব লোক। নিষ্কাম ভক্ত আছে। তারা দুঃখকষ্টেও তাঁকে চায় যেমন পাণ্ডবরা। তাঁদের কাছে আগে ঈশ্বর পরে সংসার। ঐ তাদেরই ভরসার জন্য, ভগবান দুঃখকষ্ট সব বরণ করেন নিজে। এই দেখুন না ঠাকুর — রোগ নিয়ে এলেন ক্যানসার। এ অবস্থায় সাধারণ লোক বুঝবে, ইনি একজন ঈশ্বর ভক্ত মাত্র। হয়তো রোগ দেখে কেউ কেউ দয়াও প্রকাশ করবে এদের মধ্যে যারা ভাল। এরা মনে করবে ইনি আমাদেরই মত একজন মানুষ, তবে ভক্ত-সাধু এর বেশী দাম দিতে পারবে না — ন'শ টাকা পর্যন্ত দিতে পারে। বেগুনওয়ালার চাইতেও ভাল এ দাম। সে তো ন'সের বেগুন দিচ্ছিল মাত্র। কিন্তু জহুরী, নিষ্কাম ভক্তগণ, অন্তরঙ্গগণ বলতে লাগলেন, ইনি অবতার। তারা চিনে ফেললো। একেবারে একলাখ টাকা দাম দিয়ে দিলো।

শুধু কি রোগ, আবার শোকে বশীভূত দেখালেন। অক্ষয়ের

মৃত্যুতে শোক করলেন; অধরবাবু, কেশব সেন এঁদের মৃত্যুতে শোক দেখেছি। রাম, সীতার শোকে কাঁদলেন। অবতারকে বোঝা খুব কষ্টকর — অসম্ভব। তবে যদি তিনি বোঝান তবে হয়। গৃহে যারা থাকে তাদের পক্ষে বোঝা আরোও কঠিন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, গৃহীদের মধ্যে কেউ কেউ সব দিক ঠিক রাখতে পেরেছিলেন — 'জনকাদয়ঃ'। তা বলে সবাই পারে না। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।' তাঁর মহামায়ার সঙ্গে চালাকী করা চলে না। হাজার বাজী দেখ, অর্থাৎ যত বড় ভক্তই হও, অবতার হলেও তবু তাঁর 'অণ্ডারে' (আণ্ডারে — অধীনে)।

বড় জিতেন — আচ্ছা এও তো হতে পারে — একজন বাইরে সিগারেট ফুঁকছে, হাতে ছড়ি আর ভিতরে ভিতরে সব সময় তাঁকে ডাকছে।

শ্রীম (তৎক্ষণাৎ) — হাঁ, ঠাকুর বলতেন, তার মাত্র দু'আনা মদ খাওয়া হয়েছে। বেশী খেলে আপনা আপনি এ সব পড়ে যায়। কাপড়খানা পর্যন্ত রাখতে পারলেন না ঠাকুর!

৩

শ্রীম মৌন। কি ভাবিতেছেন। ভক্তরা কেহ কেহ ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছেন। একজন অস্ফুট স্বরে বলিলেন, ওঁ। শ্রীম বুঝি উহা শুনিতে পাইলেন! ক্ষণকাল পর কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই যে শব্দ আমরা শুনতে পাই তাতেও তিনি আছেন। তিনিই শব্দব্রহ্ম। এইজন্য ভাগবত তাঁর একটি রূপ বলেছেন। ভাগবত কতকগুলি শব্দের সমষ্টি। ঐ ভাগবত সেদিন হারিয়ে গিছলো। শব্দের importance (প্রাধান্য) কত! শব্দদ্বারা আমাদের জ্ঞান হয়, অন্তঃকরণ reformed (পরিশুদ্ধ) হয়। মা আনন্দ করছে, টেলিগ্রাম এলো 'রাম মারা গেছে।' শুনে মূর্চ্ছিতা। পরে বোঝা গেল এ তার ছেলে রাম নয় অপর রাম। ভুল করে টেলিগ্রাম এখানে এসেছে। বহুকষ্টে তার জ্ঞান হলো। তখন সকলে

মাকে পুত্রের চিঠি দেখালে। রাম লিখেছে কাল সে বাড়ি আসছে। বিকালে মা সিনেমা দেখতে গেল।

শব্দের এমনি শক্তি। ইঙ্গিতেও কতকটা হয়, কিন্তু শব্দ দ্বারা বেশি হয়। Brain-এ (মস্তিষ্কে) নিয়ে যায় sound (শব্দ) একটা ভাবকে। সেখানে effect (প্রতিক্রিয়া) ক'রে মনে যায়, তখন জ্ঞান হয়।

দু' মাসের একটি শিশু দেখলাম এক জায়গায় — মন অস্থির দৃষ্টিও অস্থির। যেই কোন শব্দ কি স্পর্শ হচ্ছে অমনি ওদিকে দৃষ্টি। এইরূপ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ দ্বারা গঠিত আমাদের দেহমন। মাছ যেমন জলে বাড়ে তেমনি আমাদের দেহমন বাড়ে বিষয়ে। মোড় ফিরিয়ে দিলে এই মনেই ঈশ্বর দর্শন হয়। Mind is the aggregate of external sensations (বাহ্য বৃত্তিসমূহের সমষ্টি মন)। তাই মন পঞ্চভূতাশ্রিত। যেমন sensations (ভাব) প্রবেশ করে অন্তরে, সেই রং-এ রঙ্গিয়ে উঠে মন। ঈশ্বরীয় ভাব, ঈশ্বরীয় রূপাদি দ্বারা মন ঈশ্বর মুখীন হয়। (দুই হাতে নাটাইয়ে সূতা জড়ান ও খোলার অভিনয় করিয়া) এই করে সূতা জড়ায় আবার এই করে খোলে। লাল সূতা খুলে ফেলে দিলে তবে সাদা সূতা ধরবে। লালসূতা মানে বৈষয়িক ভাব, সাদা, ঈশ্বরীয় ভাব। যা খেয়েছে বমি করে ফেলে দিলে তবে শান্তি। কথাটা হচ্ছে — জড়ান সূতা খুলে ফেলা, অখাদ্য বমি করে ফেলে দেওয়া — এরই নাম সমাধি, মুক্তি। যে নাটাইয়ে বদ্ধ করে, সে নাটাইয়ে মুক্তও করে — process (প্রক্রিয়া) মাত্র ভিন্ন। মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত।

সমাধি হলেই কেবল তাঁকে দর্শন হয়। তখন মনুষ্য জীবনের problem solved (সমস্যা পূরণ) হয়ে গেল। সোনা অনেক ঝুড়ি মাটিতে চাপা আছে। মাটি সরালে তো সোনা মিলবে? যত learn (শিক্ষা) করেছো, তত unlearn (উৎসার) করতে পারলে তবে তাঁকে পাওয়া যাবে। সেই জন্য সাধন ভজনের দরকার। সাধন করলে পূর্ব সংস্কার দূর হয়।

শ্রীম (বড় ললিতের প্রতি) — ডাক্তাররাও তাই বলে — চেঞ্জে

যাও। চেঞ্জ মানে জলবায়ু scenary (দৃশ্য) বদল করা। এতে খুব improve (উন্নতি) করে। যাতে রোগীর interest (কৌতূহল) হয় এমন সব জিনিষ দেখলে মনে আনন্দ হয়। তাতেই শরীর ভাল হয়। মনটাকে ছেড়ে শুধু শরীরের যত্ন নিলে ভাল হবে না। যাতে মনে আনন্দ হয় প্রথম তা করা, পরে অন্য সব। নূতন sights and scenes (স্থান ও নৈসর্গিক দৃশ্য) আর fresh invigorating (বিশুদ্ধ প্রাণপ্রদ) হাওয়া এ দুটো মিলে উপকার হয়। মেডিকেল সায়েন্সের এই মত। ডাক্তাররা Inductive way-তে (ভূমিকা স্বরূপে) এ কথা বলেন। অনেক রোগী দেখেছে ঐরূপে ভাল হয়, তাই হাওয়া বদলাতে বলে। কিন্তু এর philosophy (তত্ত্ব) হলো ঐ — আমাদের মন grow করে (বর্ধিত হয়) রূপ, রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ দ্বারা। নূতন জায়গায়, নূতন হাওয়ার স্পর্শে নূতন রূপে মন ভাল হয়, শরীরও সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়।

পরমহংস অবস্থায় তাই চার পাঁচ বছরের শিশুদের সঙ্গে থাকতে ভাল লাগে। তাদের মন এখনও ভাল করে গড়ে নাই। ভগবান দর্শন হলে পরমহংস অবস্থা হয়। ইহা শিশুর মত অবস্থা। ঠাকুর বলতেন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ। এগুলি মনের এক একটা অবস্থা।

এই মন নাশ করতে হলে সাধন, তপস্যার দরকার। শুধু আরাম-চেয়ারে বসে কি আর তা হয়? কিছুই করলুম না মোটে, আর এমনি মেরে দেব, এও কি কখনও হয়? সাধন করতে হবে। এ তাঁরই নিয়ম। একজন সাধন করছে দেখলে অপরেও করবে। লোকশিক্ষার জন্যও সাধন দরকার। তাঁর এমনি ব্যবস্থা — মাছের তেলে মাছ ভাজেন। একজন সাধন করছে দেখে, ship-wrecked, forlorn brothers-রাও (সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত অসহায় সহযাত্রীগণও) সাহস পাবে এবং সাধন করবে।

তিনি কারুকে কারুকে এমনি কৃপা করেন। তারও কারণ আছে। তিনি তা disclose (প্রকাশ) করেন না। লোক spoiled (নষ্ট) হয়ে

যাবে বলে। যারা এই জন্মে অহেতুক কৃপা লাভ করে তারা হয়তো পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা করেছিল। কিম্বা তারা পার্ষদ অথবা সাঙ্গোপাঙ্গ হবে। এইজন্য special favour (বিশেষ করুণা) তাদের উপর। তাছাড়া, সাধন ভজন ছাড়া কৃপা হয় না। নানা বিদ্যা, নানা শাস্ত্র ঈশ্বর লাভ করাতে পারে না। শুধু সাধনও পারে না। তাঁর কৃপা চাই। সাধন করলে, তাঁর কৃপা হতে পারে। হবেই একথাও বলা চলে না। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁকে 'কেন' বলা চলে না। ইচ্ছাময় তিনি। ঋষিরা বুঝতে না পেরে বলেছেন সব তাঁর লীলা। সহজ কথায় বললে এই দাঁড়ায় — তাঁকে কেউ লাভ করতে পারে না, তিনি স্বয়ং ধরা না দিলে। তথাপি সাধন ভজনের দরকার। Special case (অহেতুক কৃপা লাভ যারা করেছেন তাঁদের) ছাড়া সকলকেই কঠোর সাধন করতে হয়েছে। তাই সাধনের দরকার।

শ্রীম (জনৈক যুবকের প্রতি) — 'আরাম-চেয়ার-মেণ্টালিটি' (আরামের মনোবৃত্তি) দিয়ে হয় না এ কাজ। কোন কাজই হয় না। আশু মুখুয্যে যখন পড়তেন, তখন শুনতাম উঁচু বেঞ্চিতে বই আছে আর উনি নিচে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। তবে তো এতো সব ডিগ্রী পেয়েছেন। ব্রাহ্ম সমাজের ওঁরা বলতেন, 'মশায় আমাদের জনক রাজার মত।' ঠাকুর বললেন, 'তা তো শুনলুম। তা যদি হয় তবে জনক রাজার মত তপস্যাও করে ন্যাও।' জনক কত তপস্যা করেছেন — হেটমুণ্ড হয়ে তপস্যা করেছেন ঠাকুর বলতেন। সাধন নাই, তপস্যা নাই আর অমনি জনক হয়ে যাবে? ঠাকুর এবারে all conceivable problems of human life solve (মনুষ্য-জীবন-সুলভ সকল সমস্যার সমাধান) করে বসে আছেন।

৪

শ্রীম (সকলের প্রতি) — দেহই হলো যত বিঘ্ন সাধন পথের। দেহ ধারণ করলেই পঞ্চভূতের অধীনে এসে গেল। গুরুকৃপায় দেহবুদ্ধি লোপ পেলে তখন ঈশ্বর দর্শন হয়।

'অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।' (গীতা ৬/৪৫) অনেক জন্ম ধরে চেষ্টা করতে করতে তারপর তাঁর কৃপায় লাভ হয় তাঁকে। এটাই সাধারণ নিয়ম। আবার কারো কারো দুই এক জন্মেও হয়ে যায়। ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন, 'এর এই জন্মে হবে না।' আর একজন ঠাকুরকে, বলেছিল, 'মশায়, আমি কিছু করতে পারবো না, খুশী হয় করে দিন।' এই কথার পরই ঠাকুরের সমাধি হলো। সমাধির পর মা'র সঙ্গে কথা কইছেন, 'মা, ও কিছু করবে না, আমি দুধ থেকে দই করে, তা থেকে মাখন তুলে ওর মুখে দিব?' এই রকম চলছে। কারো কারো শীঘ্র হয় কারো অনেকবার আসতে হয়।

পঞ্চভূত কি কম! দেখুন, রাম সীতার শোকে কাঁদছেন। শ্রীমন্ত দেবীর বরপুত্র — শ্মশানে বসে কাঁদছেন। শ্রীমন্ত সদাগর ছিলেন — ষোল বছরের যুবক। 'কমলে কামিনী' দেখাবেন বলে রাজার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। দেখাতে পারলেন না। শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে কাটবে বলে। চুক্তি করেছিল, দেবীদর্শন করাতে না পারলে শিরচ্ছেদ হবে। বালক সাক্ষাৎ মৃত্যু সম্মুখে দেখে শোকার্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, মহামায়ার খেলা আমি বুঝতে পারিনি, আমায় ক্ষমা করুন।' পরে মা দর্শন দিয়েছিলেন। দেখুন, অত বড় ভক্ত হয়েও দেহ যাবার ভয়ে কাঁদছেন।

পিটার, যার বিশ্বাসের কুলকিনারা ছিল না। যার সম্বন্ধে ক্রাইষ্ট বলেছিলেন, '......and upon this rock I will build my church' (St. Matthew 16:18) — মানে এই বিশ্বাসের পাহাড়ের উপর আমার ধর্মমন্দির স্থাপন করবো, তাকেই অন্য সময় বললেন, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice' (St. Matthew 26:34) (আজ রাত শেষ প্রহরের পূর্বেই তুমি তিনবার আমায় চিন না বলে সর্বসমক্ষে বলবে) ক্রাইষ্টকে ধরে নিয়ে গেল জজের বাড়িতে। পিটারও পেছু পেছু গেলেন। একজন পিটারকে চিনতে পেরে বললো, 'তুমি তো ক্রাইষ্টের লোক?' পিটার উত্তর করলেন, 'না আমি তাঁকে জানি না'। এইরূপে আরো

দু'বার জিজ্ঞাসা করলে দু'বারই বললেন, 'আমি তাঁকে জানি না।' তারপর নিজের এই দুর্বলতার কথা স্মরণ করে পিটার কাঁদতে লাগলেন। দেহবুদ্ধি এমনি জিনিষ। কিন্তু ক্রাইষ্ট জানতেন মানুষের এই দুর্বলতা। পিটার গর্ব করে বলেছিলেন, 'প্রভো, আমি আপনার জন্য জীবন বিসর্জন দিব। তবুও আপনাকে ছাড়তে পারবো না।' ক্রাইষ্ট হেসে তখন ঐ কথা বলেন — রাত ভোর হবার পূর্বেই তিনবার আমায় অস্বীকার করবে। কিন্তু তিনি সব দুর্বলতা জেনেও দুঃখিত হননি — for he (Jesus) knew what was in man. (St. John 2:25) ক্রাইষ্ট নিজের জীবনেও দেখালেন — দেহ যেমনি সহায় তেমনি প্রতিবন্ধক। মৃত্যুর পূর্বে নিমেষের জন্য তিনিও শোকার্ত হলেন। বলেছিলেন, 'Father, ...remove this cup from me' (St. Luke 22:42) (অর্থাৎ আমায় এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর)। ক্ষণকাল মাত্র ছিল তাঁতে এই ভাব। তারপরই বললেন, 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক — 'Thine be done' (St. Luke 22:42) শরীর ধারণ করে এসেছেন যে তা করতেই হবে। ঠাকুরও বলেছিলেন, শরীরটা দিন কতক থাকলে গোটা কতক লোকের চৈতন্য হতো। কিন্তু মা রাখবেন না। এসব দৃষ্টান্ত — 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে' — ঠাকুরের এই মহাবাক্যের।

We are bending under the load of this grand mystery (জীবন মরণের এই সমস্যা অতি দুর্বোধ্য)। মহামায়ার এ খেলা বোঝা ভার। তাই তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা। তাই ঠাকুর বলতেন, 'মা, আমি নানান খানা জানতেও চাই না। আমায় তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।'

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি) — একদিন একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'মশায়, আশ্চর্য কি সব চাইতে?' ঝট্ করে ঠাকুর উত্তর করলেন — 'সাধুর জীবন।' সকলে চলছে এক পথে — মনুষ্য দেবতা গন্ধর্ব পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতা পর্যন্ত — কিন্তু সাধু চলছে অন্য পথে, ঠিক উল্টো পথে — উজান পথে। সর্বত্র স্ত্রীপুরুষের মিলন — কিন্তু

সাধু চলছে একলা। একলা না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। কতক দূর পর্যন্ত সাধু সঙ্গে, গুরু সঙ্গে চলে শেষ অবধি নিজেকে যেতে হয় একাকী। ঠাকুর গান গাইতেন একটি — 'চল গুরু দুজন যাই পারে, আমার একলা যেতে ভয় করে।' তাই সাধু আশ্চর্য। উপনিষদেও এই কথা আছে — 'আশ্চর্যবৎ শৃণোতি চান্য' — অন্য মানে শিষ্য, সাধু। এই সাধুই আশ্চর্য। এক নিমেষ না ভেবে, ঝট্ করে বললেন এই কথা। এটিও ঈশ্বর করছেন। যিনি বদ্ধ করেছেন মুক্তির জন্য তাঁকেই বলা উচিত। তিনি যে দিকে চালান তাঁকে স্মরণ করে সেদিকে চললে ভয় থাকে না তত। আত্মাকে চিনিয়ে দেন গুরু। ঠাকুর ভক্তদের জানিয়ে দিয়েছেন। এইজন্য ঈশ্বর অবতার হয়ে এসেছেন গুরুরূপে। তিনি যে গুরু — এইটি ইঙ্গিত করতেন একটি গল্প বলে। বাঘের বাচ্চা ছাগলের সঙ্গে থেকে থেকে ভেঁ ভেঁ করতো। আর একটা বাঘ এসে তাকে বুঝিয়ে দিলে তুই বাঘ, ছাগল নস্। তার কথা শুনতে চায় না, ছাগলের মত ভয়ে চীৎকার করছে। শেষে জলের কাছে নিয়ে প্রতিবিম্ব দেখায় আর মুখে মাংস গুঁজে দেয়। তখন তার জ্ঞান হলো আমি বাঘ। পূর্বেও বাঘ পরেও বাঘ — মাঝখানটা ছাগল। মহামায়ার এমনি কাণ্ড — এইরূপ প্ল্যান।

গুরু বৈ উপায় নাই। 'সৎগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে'। গুরু লাভ হয়ে গেলে প্রায় নিশ্চিন্তি।

> 'কখনও বিপথে যদি ভ্রমিতে চায় এ হৃদি,
> তখনই তোমার ঐ মুখ হেরি সরমেতে হইগো সারা।'

রবিবাবুর গানে এটি আছে। গুরুর মুখ মনে পড়লে তখন আর অন্য কাজ করা চলে না। গুরু কর্ণধার।

ইতিমধ্যে নিত্যকার ভক্তরা আসিয়া অনেকেই উপস্থিত হইয়াছেন। ডাক্তার বক্সী, ছোট নলিনী, রমণী, সুখেন্দু, অমৃত, সুরেন গাঙ্গুলী প্রভৃতি। এখন রাত্রি সোওয়া নয়টা।

শ্রীম ফরিদপুরের ভক্তকে বলিলেন, 'আপনারা তো গান জানেন।

গান না একটি গান।' নূতন লোক আসিলে শ্রীম গান গাইতে বলেন। গানে তাদের কি ভাব বুঝিয়া লন। ভক্তটি গাহিতেছেন —

গান। মন চল নিজ নিকতনে,
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে মিছে ভ্রম অকারণে।।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,সব তোর পর, কেউ নয় আপন।
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন ভুলিছ আপন জনে।।

('প্রার্থনা ও সঙ্গীত' রামকৃষ্ণমিশন সারদাপীঠ, বেলুড়মঠ)

শ্রীম আহার করিয়া ফিরিয়াছেন। রাত্রি এখন দশটা। ছোট অমূল্য গাহিতেছেন —

'কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গিণী।'

রমণী গাহিলেন —

'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়।।'

(কথামৃত ৫/৮/২)

কলিকাতা,
১৯শে জানুয়ারী, ১৯২৪ খৃঃ।৫ই মাঘ, ১৩৩০ সাল।
শনিবার — শুক্লা ত্রয়োদশী।

পঞ্চম অধ্যায়
শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীম-প্রতিভা

১

আজ শ্রীম মর্টন স্কুলে অবস্থান করিতেছেন। মধ্যাহ্নে গদাধর আশ্রম হইতে এখানে আসিয়াছেন। তিনতলার উত্তরের কোণের ঘরে বসিয়া আছেন। কাছে ডাক্তার ও জগবন্ধু। এখন অপরাহ্ন সোওয়া ছ'টা। ডাক্তারের সঙ্গে কথা হইতেছে।

ডাক্তার (শ্রীম-র প্রতি) — ফি কি করে নেব, ঠিক করতে পারছি না। বুঝতে পারি না কে ধনী কে গরীব — এমন অনেক 'কেস' (case) হয়। শেষে মনে কষ্ট হয়। আজ একটা কলেরার 'কেসে' কুড়িটা ইনজেকশানের চার্জ করায় কলই' দেয় নি। পাড়ার অপর একজনের নিকট শুনতে পেলাম নিত্ আনে নিত্ খায়। তাই নিজেই গেলাম। দেখি, রোগী sink (নিস্তেজ মরমর) করছে — পেচ্ছাব বন্ধ হয়ে যায় যায় অবস্থা। তখন নিজেই বিনি পয়সায় বেলা দুটো আড়াইটা থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলি ইনজেকশান করে দিয়ে এই এলাম। বেঁচে যাবে। এখন অনেকটা ভাল। ঐ পাড়ার কতকগুলি 'কেস্' আমার হাতে ভাল হয়েছে বলে ওদের খুব বিশ্বাস আমি ধরলে এটাও ভাল হবে। কিন্তু পয়সার অভাবে আমায় ডাকতে পারছে না। তিন টাকার ঔষধ কিনতে হবে তাতেই এটা বাঁধা ওটা বাঁধা লেগে গেছে। আবার অনেক স্থলে কম আনলে সে পাড়ার সকলেই কম দিতে চায়! ডাক্তার নীলরতন সরকার পঞ্চাশ টাকা নিয়ে বাগবাজার খালের ওপারে গিছলেন। আমায় বললেন, কম নিলে প্র্যাকটিসে shine (উন্নতি) করতে পারবে না। তা ছাড়া, জুনিয়ারদের উপর injustice (অন্যায়) করা হবে। এখন কি করবো

বুঝতে পারছি না।

জগবন্ধু (শ্রীম-র প্রতি) — মহাপুরুষ মহারাজ আমায় বলেছিলেন ডাক্তার কাঞ্জিলালের কথা। খেয়াঘাটের ভট্চায্যির অসুখ। মঠের লোকই দেখাশোনা করছেন। মহাপুরুষ মহারাজ নিজে কাঞ্জিলালকে ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার paying call (অর্থপ্রাপ্তির রোগী দেখা) সেরে যখন এলেন তখন ভট্চায্যির হয়ে গেছে — দাহ পর্যন্ত শেষ। বললেন, দেখ, অতবড় ভক্ত কিন্তু পয়সার ডাক ছেড়ে আসতে পারলেন না।

শ্রীম (সহাস্যে) — ঠাকুর বলছিলেন একটি গল্প। এক গুরুর এক টুকরা কাপড়ের দরকার — ভক্তিগ্রন্থ সব বাঁধতে হবে। শিষ্যের কাপড়ের দোকান আছে। শিষ্যকে বলায়, বললে টুকরো পড়ুক তখন দেব (হাস্য)। টুকরো আর পড়ছে না ক'মাস হয়ে গেল। আর একবার গুরুপত্নী মাছ চেয়ে পাঠিয়েছিল। বললে, এখন সব বড় বড় রুই ধরা হয়েছে — কাটিবাটা পড়ুক দেওয়া যাবে। (সহাস্যে) সংসারের এই অবস্থা!

শ্রীম (স্বগতঃ উচ্চহাস্যের সহিত) — জুনিয়ারদের উপর অন্যায় হবে বলে তো কম নেওয়া হবে না। জুনিয়ারদের তো উপকার হলো, কিন্তু এদিকে যে গরীব রোগী মুমূর্ষু। তার কি হলো? (গম্ভীর ভাবে) ধনীর নিকট থেকে নেওয়া আর গরীবের বাড়িতে কাজ করে দেওয়া, এ দুটো ঠিক হলো। এখন intermediate (মাঝখানের) গুলি ঠিক করাই শক্ত। ভগবান যেমন করান ঐ অবস্থায় তাই হবে। তবে করা যেতে পারে ক'জন লোক, ক'ভাই, কি করে — এই সব জেনে। একটা চার্ট করলে হয় না?

ডাক্তার — আমি মুখে জিজ্ঞেস করি।

শ্রীম — ওরা সব lay men (আনাড়ী লোক) সব বুঝতে পারে না। (ক্ষণকাল ভাবিয়া) গরীব 'কেস্' জেনে attend (পরিচর্যা) না করা — ও মা, এ যে murder (হত্যা) করা হবে। ঠাকুর কিন্তু মধু ডাক্তারকে ফি দিতেন।

জগবন্ধু — ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার তো নিতেন না।

শ্রীম — offer করা (দেওয়া) হয়েছিল, কিন্তু অনেকেই আসেন দেখে নিলেন না। (গম্ভীর ভাবে) ডাক্তারবাবু, এই কলেরার রোগীর খবর নেওয়া উচিত আপনার।

ডাক্তার — আজ্ঞে হাঁ, সন্ধ্যাবেলা ওরা খবর দিবে বলেছে।

শ্রীম — তা হলে আপনি এক্ষুনি উঠুন। গাড়ী তো সঙ্গে রয়েছে — রোগীটাকে দেখে একেবারে বাড়ি ফিরে গেলেও হয়।

ডাক্তার 'আজ্ঞে, আচ্ছা' বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। বিনা 'কলে' রোগী দেখিতে গেলেন। শ্রীম অনেকক্ষণ ধরিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। ডাক্তারের খুব সুনাম রোগীদের কাছে। আর উনিও ভক্তলোক। প্রায় সমস্ত বিষয় শ্রীম-র সহিত পরামর্শ করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। শ্রীম বুঝি তাঁরই কথা ভাবিতেছেন। কিছুকাল পর জগবন্ধুর সহিত উকীল ও ডাক্তারের কথা হইতেছে।

জগবন্ধু — রোমান 'ল' তে 'লেকস্ একুইটা' (Lex Aquitia) বলে একটা বিধান আছে। এর মতে — একজন ডাক্তার যদি একটা অপারেশন করে অথবা কোন 'কেস্' take up (গ্রহণ) ক'রে, attend (মনোযোগ) না করে, এতে যদি কোন slave (কৃতদাস) বা pecudus (কর্মচারী) মারা যায় তবে ডাক্তার liable (দায়ী)। আবার কিছুদিন পরে এমন হয়েছিল, কেউ যদি কৃতদাস কিংবা চতুষ্পদ জন্তুকে একটুও আঘাত করতো তা হলে আঘাতকারীর শাস্তি হতো।

শ্রীম — এতে বোঝা যায় এদের বেশ দয়া ছিল। আজ এই কথায় বড় আহ্লাদ হচ্ছে যে এদের এত দয়া ছিল।

জগবন্ধু — এটা advanced stage of civilisation-এ (সভ্যতার খুব উন্নত অবস্থায়) হয়েছিল। প্লিবিয়ানরা যখন শক্তিলাভ করলে তখন।

শ্রীম — 'লেক্স লিচিনিয়াম রেরোগেশানে' (Lex Liciniam Rerogation-এ) Plebians could select a consulate from

among them (জনসাধারণ স্বীয় শাসনকর্তা নির্বাচন করিবার অধিকার লাভ করেছিল)।

জগবন্ধু — এটা হয় ৩৭৭ বি.সি-তে। লিচিনিয়াস্ ষ্টলো (Licinius Stolo) নামে জনৈক প্লিবিয়ানের নামানুসারে এই আইনটি পরিচিত। এল. সেকসটাস (L. Sextius) আর সি. লিচিনিয়াস (C. Licinius) এই দু'জন মিলে এই আইন প্রণয়ন করেন। একজনের নামে এই আইনটি পরিচিত, অপরজন সর্বপ্রথম প্লিবিয়ান শাসনকর্তা (consul) নিযুক্ত হন।

শ্রীম — এই কথাপ্রসঙ্গে একটা কথা মনে হলো। আমরা তখন হেয়ার স্কুলে পড়ি। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসার লেফটানেন্ট আইভিজ আমাদের রোমান আর গ্রীক ইতিহাসের প্রশ্ন করেছিলেন। একটি প্রশ্ন ছিল — What is Lex Licinian (লেক্স লিচিনিয়ান কি?) আর একটি প্রশ্ন ছিল Write a note on the battle of Thermopoly (থারমোপলীর যুদ্ধের বিবরণ সংক্ষেপে লিখ) (সহাস্যে) আমার মুখস্থ ছিল, আর ঐ দিন পড়ে গিছলাম — খুব লিখে দিলাম। আমাকে তাই খুব ভালবাসতেন। আরোও দুইজন প্রফেসার আমাদের পরীক্ষা করেন। একজন মেথ্‌মেটিকসের (গণিতে) পরীক্ষা করেন। ইনি একটি প্রশ্ন করেছিলেন, 'A bankrupt had assets so much, and debts so much, how much could he pay to a pound (একজন দেউলিয়ার এত সম্পত্তি আর এত ঋণ, সে এক পাউণ্ডে কত দিতে পারবে?)। ফোরথ ক্লাসের ছাত্র bankrupt (দেউলিয়া) মানে জানে না — ব্যাঙ্ক মানেই জানে না, তাকে এই প্রশ্ন করা? কি খারাপ system (ব্যবস্থা)? এদের কি সাংঘাতিক বোকামী। Rule of three (ত্রৈরাশিক) জানা ছিল বলে কেউ কেউ আন্দাজে ঐ দিয়ে অঙ্কটা কষে দিলে।

২

শ্রীম মর্টন ইনষ্টিটিউসানের স্বত্বাধিকারী এবং কর্মে উহার রেক্টর। ঐ বিদ্যালয়ের জনৈক যুবক শিক্ষকের সহিত শিক্ষা বিষয়ক কথা হইতেছে।

শ্রীম (শিক্ষকের প্রতি) — কাল ইউনিভারসিটিতে vernacular medium (শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা) হবার কথা উঠেছে। কংগ্রেসও তাই বলেছে।

শিক্ষক — এতদিনে বুঝতে পারছি substance (সারাংশ) লেখার মানে কি? পাঠ্যাবস্থায় মুখস্থ করে খালি উদ্গার করে এসেছি।

শ্রীম — দেখুন কি কাণ্ড! ছি ছি, ইংরেজী তুলে দিলে হয়। আচ্ছা, আমরা যে method (শিক্ষাপ্রণালী) চালিয়েছি এতে কিরূপ কাজ হচ্ছে?

শিক্ষক — খুব কাজ হচ্ছে। এখন না বুঝে মুখস্থ করতে হয় না ছেলেদের। ইতিহাস পড়াবার সময় নূতন প্রণালী অবলম্বন করায় ছেলেদের খুব উপকার হচ্ছে। প্রশ্ন করে মুখে মুখে উত্তর বলে দি পয়েন্টস ধরে, আর ম্যাপে স্থান দেখিয়ে দি। এতে দেখছি ছেলেরা মুখে মুখে শিখে ফেলে, বই প্রায় পড়তে হয় না। ইংলিশও বেশ হচ্ছে। কোনও একটা পাঠ আরম্ভ করবার পূর্বে সমস্ত বিষয়টা বাংলায় গল্পের মত বলে দি। তারপর প্রধান প্রশ্নগুলি কি হতে পারে উত্তর সহ সেগুলিও বলি। মাঝে মাঝে দু'একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করাও হয়। এতে মনোযোগও হয় আর শুনে বলার অভ্যাস হয়। এরপর পাঠ আরম্ভ হয়।

শ্রীম — এতেও ম্যাপ পয়েন্ট করাবেন স্থানের নাম থাকলে, কিংবা লোকের নাম থাকলে। এতে চোখে দেখে কানে শুনে শিখে ফেলবে। অযথা মস্তিষ্ক ভার করতে হবে না। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য এই সব বিষয়ে ম্যাপ দেখিয়ে পড়ান খুব ভাল। এতে idea (ভাব) localised (স্থায়ী) হয়ে যায়। ছবিতেও কাজ হয়। কানে শুনে মস্তিষ্কে যাওয়ার চাইতে চোখে দেখে কানে শুনে গেলে কাজ

বেশী হয় — দু'টি ইন্দ্রিয়ের কাজ হয় বলে। ঘটনার স্থানে যেতে পারলে আরও ভাল হয়, স্পর্শ হয়ে যায়। পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে কয়টা কাজে লাগানো যাবে জ্ঞান লাভ তত সহজ হবে। মস্তিষ্কের কাজ বেঁচে যাবে। 'সন্দেশ' কি, লেকচার না দিয়ে তাকে চোখে দেখিয়ে নাকে শুকিয়ে মুখে দিলে ছেলে চট্ করে সন্দেশের জ্ঞান লাভ করবে। রস, আর গন্ধ এ দুটোতে সব ঠিক করে দিবে সহজে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের যতগুলি ব্যবহার করবে তত সহজ হবে জ্ঞান লাভ করা। সাবস্টেন্স্ কি করে লেখাচ্ছেন?

শিক্ষক — একটা অংশের মোটামুটি সার কথা বাংলায় বলে দি। ছেলেরা বাংলায় সেটা লিখে তারপর সেটার অনুবাদ করে ইংরেজীতে। বাংলায় চিন্তা করে ভাবটা শীঘ্র ধরতে পারছে দেখা যায়। ভাবটা ঠিক থাকলে ভাষায় প্রকাশের সময় কষ্ট কম হচ্ছে, আর ভুলও কম হচ্ছে।

শ্রীম — শুধু আমরাই যে বাংলায় আরম্ভ করে দিয়েছি তা নয়। এখন কলকাতা ইউনিভারসিটিতেও সেই সম্বন্ধে আলোচনা করছে। এতে greatest amount of work (সব চেয়ে বেশি কাজ) পাওয়া যায় shortest time-এ (খুব অল্প সময়ে) আর easiest way-তে (অতি সহজে)।

শ্রীম — বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে ছেলেদের mortality (মৃত্যুর হার) খুব বেড়ে গেছে। হঠাৎ জ্বর হলো আর অমনি মৃত্যু। বাপ বুঝতে পারলে না কেন এরূপ হলো। একে nutrition-এর (পুষ্টিকর খাদ্যের) অভাব, তাতে আবার মুখস্থ করে করে মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তাতেই সমস্ত জীবনীশক্তির উপর ধাক্কা লাগছে। Vitality (জীবনীশক্তি) কম হয়ে যাচ্ছে। সামান্য আঘাতেই হয়ে যায় — resist (প্রতিরোধ) করবার শক্তি থাকে না। তা'তে এতো সব অসময়ে মৃত্যু হচ্ছে। সমস্ত দেশের এই দুরবস্থা — শুধু কি বাংলায় — সমস্ত ভারতে। একে অল্পাহার অনাহার তার উপর অস্বাভাবিক প্রণালী শিক্ষায়। এইজন্য ছাত্রদের মৃত্যুর হার বেড়েছে।

শিক্ষক — আজকাল ছোট ছেলেদের চশমা নেওয়াও বেড়ে গেছে খুব।

শ্রীম — তা তো হলো, কিন্তু একেবারে যে মরে যাচ্ছে। ছি ছি, ঐ শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ তুলে দিতে হবে! এ সব কথা রেকর্ড করতে হবে।

ইংরেজী পড়বে, তার জন্য অতবড় মস্ত গ্রামার (ব্যাকরণ) পড়িয়ে কি লাভ? ম্যাট্রিকে এই ক'টা আসে — Difference of meaning, Appropriate preposition, Parsing (শব্দের বিভিন্ন অর্থ, উপসর্গের প্রয়োগ আর পদান্বয়)। আর কয়েকটা টেবল (তালিকা) মুখস্থ করলেই হলো।

শিক্ষক — সেভেন্থ ক্লাশেও গ্রামার, কি অদ্ভুত ব্যবস্থা?

শ্রীম — ওদের মুখে মুখে খালি বলে দেওয়া বইয়ের দরকার কি? এই ক'টা শিখালেই যথেষ্ট — Parts of speech, verb, voice আর number (কারক, ক্রিয়া, বাক্য ও বচন)। একটা বই দেবেন আমায় আমি সব দেগে দেব। না, দেখছি — সব ক্লাশে গিয়ে একদিন করে পড়িয়ে আসতে হবে। আমাদের এই নূতন নিয়ম চালাতেই হবে। শিক্ষকরা খাটুনীর ভয়ে প্রথমটা বাধা দেবে। কিন্তু যে করেই হোক চালাতেই হবে।

শ্রীম দীর্ঘকাল আনমনা হয়ে কি ভাবিতেছেন। চক্ষু স্থির অতি দূরে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত। পিছন ফিরে মনে কি দেখিতেছেন। প্রায় আধ ঘন্টা পর পুনরায় কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (স্বগতঃ) — জীবন প্রহেলিকাময়। কোথায় এইটিন্ ছিকস্‌টি সেভেন — ফোরথ ক্লাশ; ফিফটিটু ইয়ার্স বিফোর! (আঠারশো সাতষট্টি খৃষ্টাব্দ, চতুর্থ শ্রেণী — বায়ান্ন বছর পূর্বে)। সেই গ্যালারী, সেই চেয়ার — ল্যাফটানেন্ট আইভিস তার উপর বসে, আর ছেলেরা সব বেঞ্চে বসে। সেই ঘর আজও মনে পড়ছে। ট্রামে যেতে দেখি সেই ঘর আর নেই। এ্যালবার্ট ইনষ্টিটিউট যেখানে সেখানে ছিল স্কুল। সংস্কৃত কলেজে ফারষ্ট, সেকেণ্ড, থার্ড ফোরথ (*বর্তমান*

দশম, নবম, অষ্টম ও সপ্তম শ্রেণী) — এই চারটে ক্লাশ হতো। তখন ঠাকুর কামারপুকুরে বিয়ের আট বছর পর গেলেন। আমি তখন 'লিচিনিয়ান্ রেরোগেশন' লিখছি। তখন কে জানতো ঠাকুর কামারপুকুরে, এখন হিসেব করে বলছি।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি) — অভ্যাস এমনি দেখুন, মুমূর্ষু রোগী হাতে আর ডাক্তারবাবু এসে এখানে বসে আছেন! সর্বক্ষণ তার বাড়িতে থাকা উচিত।

৩

এখন সন্ধ্যা সাতটা। শ্রীম দ্বিতলের সিঁড়ির পাশের ঘরে বসিয়া আছেন। বড় জিতেন, দুর্গাপদ, বড় অমূল্য, রমণী, সুখেন্দু, জগবন্ধু, প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে উপবিষ্ট। সন্ধ্যার ধ্যানান্তে শ্রীম-র ইচ্ছায় পত্রিকা হইতে একজন ভক্ত নাগ মহাশয়ের জীবনচরিত পড়িয়া শুনাইতেছেন — লেখক শ্রীমতী রায়। পাঠ শেষ হইলে শ্রীম ঐ পবিত্র জীবনভাণ্ডার হইতে মাধুকরী সংগ্রহ করিয়া ভক্তগণের নিকট পরিবেশন করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)— নাগমশায় একবার বাজার করতে গেছেন। কৃষক দাম বেশী নিয়েছে — যা চায় তাই উনি দিয়ে দেন। অন্য লোকেরা বললে, 'ওরে উনি যে সাধু বেশী নিলি কেন?' কৃষক দৌড়ে গিয়ে পয়সা ফিরিয়ে দিতে চাইলো। নাগমশায় বললেন, 'না, না, আপনি নিয়ে যান। আপনার লোকসান্ হবে।' নিলেন না। খড়ের কুটীরে থাকেন। ঘর ছাইতে ঘরামি চালে উঠেছে। রৌদ্রে ঘেমে গেছে। তা দেখে নাগমশায়, ব্যস্ত হয়ে বলছেন 'আপনি নেমে আসুন, নেমে আসুন, আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে।' তারপর হাতে পাখা নিয়ে বাতাস করেন আর নিজে তামাক সেজে খাওয়ান। বাড়িতে ঘাসে সব উঠুন ভরে গেছে — তা কাটবার যো নাই। এরই নাম সেবা, সমদর্শন।

শ্রীম স্থির হইয়া ক্ষণকাল বসিয়া রহিলেন মুখে কথা নাই — দৃষ্টি অন্তরে নিবদ্ধ। কিছুকাল পরে 'দেওভোগ', 'নাগমশায়' — নিজে

নিজে অস্ফুটস্বরে এই দুইটি শব্দ অসংযুক্ত ভাবে উচ্চারণ করিতেছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখলুম, ওঁর মৃতদেহের ফটো নিয়েছেন ভক্তরা। এ সব ইংরেজী ফ্যাসান্। এতে শোক হয় দেখলে। মনে রাখার কি এই উপায়! এর চাইতে ভাল উপায় কি আর নেই? যীশুর ক্রুসিফিকেশনের ছবি চার্চে রাখে। এ সব ইরেজী ফ্যাসান্ ভাল নয়। জীবিত থাকতে ফটো নিলেই হয়।

শ্রীম-র ফটোর জন্য ভক্তরা অনেক অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সম্মত নহেন। তাই এই সুযোগে বড় জিতেনবাবু ঐ প্রস্তাব ইঙ্গিতে উত্থাপন করিলেন।

বড় জিতেন (শ্রীম-র প্রতি) — জীবিত থাকতে যদি না দেন তবে আর কি করে! বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ভক্তদের সকলের। না হয় selected few-র (বেছে কয়েকজনের) জন্য ছবি তুলে রেখে নেগেটিভ ভেঙ্গে ফেলানো যাবে।

শ্রীম — ঠাকুরের ছবি থাকতে অপরের (আমার) ছবির দরকার কি? ঠাকুর বলতেন, 'অন্য ফুলেও মধু আছে। কিন্তু পদ্মফুলে মধু বেশী।' এমন পদ্মফুল থাকতে কে যায় অন্য ফুলের ঐটুকু মধু চুষতে? ঠাকুর যে কি জিনিষ ছিলেন, আপনারা দেখেন নি কিনা তাই ওরূপ বলেন।

বড় জিতেন — যদি কেউ ঐরূপ (শ্রীমকে পদ্মফুল এবং ঠাকুরের সহিত অভিন্ন) দেখে?

শ্রীম (বিরক্তভাবে) — কেশব সেনকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোমার কথা নিতে পারলুম না। তুমি নামযশ কামিনীকাঞ্চন নিয়ে রয়েছো। নারদ শুকদেব বললে বরং কতকটা হতো।'

যারা বলছে একথা তাদের কি authority (অধিকার) আছে বলবার? তারা কি নারদ, শুকদেব — না, ত্যাগী? যারা কামিনীকাঞ্চন লয়ে রয়েছে তাদের কথার worth (মূল্য) কি?

এখন রাত্রি প্রায় নয়টা। শ্রীম স্বামী বোধানন্দজীর বক্তৃতার রিপোর্ট

শুনিতেছেন। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। ধর্মপ্রচারার্থ আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে থাকেন। সতের বৎসর পর ভারতবর্ষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কলিকাতাবাসী আজ তাঁহাকে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন। উহার উত্তর দিতে গিয়া তিনি অতিশয় তেজোময়ী একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বড় অমূল্য শর্টহ্যাণ্ডে লিখিয়া আনিয়া শ্রীমকে সব শুনাইতেছেন। সব শুনিয়া শ্রীম মন্তব্য করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এসব লোক এদেশে এলে তবে দেশের strength (শক্তি) বাড়বে। দেশ কোথায় চলছে, কি দুর্দশা! অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, দেহ নাই, গৃহ নাই, শিক্ষা নাই, সব শ্রীহীন। ওসব দেশ থেকে materials (মাল) এদেশে আনার দরকার হয়ে পড়েছে। ওঁরা দীর্ঘকাল ওদেশে আছেন কেউ আঠার বছর কেউ পঁচিশ বছর। এঁদের যে অতদিন ঐ দেশে থাকতে ভাল লেগেছে, এ তাঁরই কাজ। তিনি মাছের তেলে মাছ ভাজেন। এঁরা এদেশে যত বেশী আনাগোনা করবেন, তত ভাল। ওদেশ থেকে সায়েন্স, কৃষি, শিল্পবাণিজ্য, দেশপ্রেম এসব এখানে আসবে। আর ভারতবর্ষ থেকে spirituality (ধর্মভাব) ওদেশে যাবে। ঈশ্বরের কাজ বোঝা কঠিন। এই কার্যের জন্যই ঠাকুর উপযুক্ত পাত্র বুঝে স্বামীজীকে ঐদেশে পাঠান। স্বামীজীকে দিয়ে তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন করিয়েছেন। মিলনভূমি তিনি স্বয়ং। এদেশের আধ্যাত্মিক যতগুলি সত্য আছে সব নিজ জীবনে সাধন করে উপলব্ধি করে — 'যত মত তত পথ' এই মহা সত্য আবিষ্কার করেন। স্বামীজীকে দিয়ে ঐটি ওদেশে প্রচার করান। ভবিষ্যৎ জগৎ তাঁর মহান সত্যের উপর একত্রিত হবে। এইজন্যই তাঁর সর্বধর্ম সাধন। নচেৎ তাঁর এসব করার কোন প্রয়োজন ছিল না। স্বামীজীকে দিয়ে ওদেশের প্রাণকেন্দ্র আক্রমণ ও জয় করিয়ে লয়েছেন। সূক্ষ্মে হয়েছে, বাইরে ক্রমে প্রকাশ হবে। স্বামীজী কি শুধু মুখে বলেছেন? না, নিজে আত্মদর্শন করে বুঝে বলেছেন। তাঁর অতিমানুষিক বিদ্যা, Personality (ব্যক্তিত্ব), হৃদয়, পবিত্রতা,

ত্যাগ এই সব বহুবিধ দৈবী সম্পদ সহায়ে ঐ দেশের প্রাণকে বশীভূত করে ফেলেছেন। স্বামীজী ছাড়া এ কর্মটি অন্য কাউকে দিয়ে হতো না। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গেলে peace (শান্তি) করতে পারেন আর কারো সাধ্য নাই। তাই তাঁর ইচ্ছায় এখনও ওদেশে মঠের লোক সব যাচ্ছেন। যতক্ষণ opposed (বাধাপ্রাপ্ত) না হচ্ছে, বুঝতে হবে এতে ঠাকুরের মত আছে। আবার হয়তো একজন strong man-কে (ক্ষমতাশীল লোক) দাঁড় করিয়ে বলাবেন, 'নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বল — তাঁর দর্শন হবে। তাঁকে দর্শন করাই মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।'

শ্রীম (স্বগতঃ) — দু'টি পথ আছে — একটি ভাবভক্তি আর একটি নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলে তাঁতে মন যাবে সবটা। (সহাস্যে) এরা ওঁদের পছন্দ করে না। একজনের (ঠাকুরের সময়কার) মাঝে মাঝে ভাব হতো। অন্যরা বলতো পাগল হয়েছে। কিন্তু ঠাকুর যে ভাবেতেই সব করে গেলেন গো! পুরোনো লোকরা যাঁরা আছেন তাঁর সময়কার, তাঁরাই তাঁর ভাব ঠিক রেখেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — 'For all these things do the nations of the world seek after... But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you' (St. Luke 12:30 and 31).

অজ্ঞানীরাই সাংসারিক অনিত্য বস্তু চায়। ...তোমরা কেবল ভগবানকে চাও। তোমাদের যা দরকার তা ভগবান জানেন এবং দিবেন। ক্রাইস্ট বলেছিলেন অন্তরঙ্গদের এই কথা। ঠাকুরও তারই প্রতিধ্বনি করে বলছেন, 'ওগুলো অত ভেবো না, তিনি জানেন এর দরকার আছে। তুমি বরং কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হয়ে বল, দর্শন দাও।' তাঁকে দর্শন করা — এই যথার্থ ধর্ম। ক্রাইস্টের ধর্মের definition দেখুন, বলছেন — আগে ঈশ্বর লাভ তারপর অন্য সব কর। Development of agriculture, industry trade, commerce, technical education, science-এর (কৃষি, শিল্প,

বাণিজ্য, যন্ত্রশিক্ষা, বিজ্ঞান), এ সবেরও দরকার আছে। কিন্তু এর জন্য আলাদা থাকের লোক রয়েছে। এইগুলিকে ক্রাইস্ট বলেছেন, 'these things' (শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, 'ওগুলো') মানে হেয়, নিকৃষ্ট জিনিষ। এরও উপর আছে ঈশ্বর। তোমরা ঐটি চাও কেবল। সকলকে বলেননি, যারা অধিকারী সেই অন্তরঙ্গদের বলছেন। (স্বগতঃ) — তোমরা আমার অতি প্রিয় তাই উৎকৃষ্ট বস্তুর সন্ধান বলে দিলাম। ঐ সব আছে আর চিরকাল থাকবে। তারজন্য লোক আছে। তোমরা ঈশ্বরকে ধর। Death abolish (অতিমৃত্যু) না হওয়া পর্যন্ত ওসব কিছু নয়। আগে নিজে পার পাও — 'আমায় ধরে।'

১২-১-২৪

৪

শ্রীম-র শরীর আজ অসুস্থ। তাই ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটে মর্টন স্কুলের তিন তলায় উত্তরের ঘরে শুইয়া আছেন — তক্তপোষে। কখনও কখনও বালিস দেয়ালে ঠেশ দিয়া বসিতেছেন। শ্রীম-র খাট ঘরের পূর্ব-দক্ষিণে — শিয়র দক্ষিণে। অপরাহ্ন পাঁচটা। বেশ শীত পড়িয়াছে। ঘরের পশ্চিমে লম্বা বেঞ্চে ভক্তরা বসিয়া আছেন।

শ্রীম (শিক্ষক ভক্তের প্রতি) — আজ কি সব কথা হলো, — আমাদের স্কুলের টিচার কনফারেন্সে?

শিক্ষক — দেখলাম, বৃদ্ধ শিক্ষকগণ আপনার প্রবর্তিত মাতৃভাষায় নূতন শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। সাবষ্টেন্স বাংলায় লিখিয়ে ইংরেজী অনুবাদ করান, আর সব বিষয়ে বাংলায় পড়ান এতে রাজী নন। মনে হয় principle-টা (নীতিটা) মেনে নিয়েছেন কিন্তু অভ্যাস বদলাতে চান না, আর খাটুনি বেড়ে যাবারও ভয় আছে!

শ্রীম — আজ না হলেও কাল করতেই হবে। মাতৃভাষা ভিন্ন শিক্ষা হতে পারে না। ইংরেজরা জোর করে চালিয়েছে। এ থাকবে না, থাকতে পারে না। অস্বাভাবিক জিনিষ স্থায়ী হয় না। জগতের সকলে আপন মাতৃভাষায় শিক্ষা পায় — এটা স্বাভাবিক। আর

আমরাই যে শুধু এ বিষয় ভাবছি তা নয়। আমাদের দোষ আমরা পূর্ব থেকেই বাংলায় পড়ানো introduce (প্রচলন) করেছি। আশুবাবুও এ বিষয়ে খুব ভাবছেন। তাঁর প্রেরণায় ইউনিভারসিটিতেও এ বিষয়ে জোর আলোচনা হচ্ছে। আশুবাবু সেদিন লাহোর ইউনিভারসিটির convocation Address-এ (সমাবর্তন ভাষণে) মাতৃভাষায় পড়ানোর প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান — fraught with possibilities which even the best amongst us cannot foresee (মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল, তা আমাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিশারদগণ এখনও বুঝতে পারছেন না।)

শ্রীম মৌন হইয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন। এবার কথার প্রবাহ পরিবর্তিত হইয়া গেল। ঈশ্বরীয় কথা হইতে লাগিল।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — আজ একটু আগে তিনজন সাধু এসেছিলেন বেলুড় মঠ থেকে। একজন বম্বে থেকে এসেছেন — মহারাষ্ট্রের লোক, ব্রহ্মচর্য নেবেন।

ভক্ত — ও দেশের সাধু খুব কম মঠে।

শ্রীম — না, অনেক সাধু আছে। মঠে কম। আমরা যখন ঋষিকেশে ছিলাম তখন ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব করা গেল। ওরাই, মহারাষ্ট্রের সাধুরা সব leading part (নেতৃত্ব) নিলেন। ঠাকুরকে ওঁরা খুব মানেন। তাই আমাদের কত ভালবাসতেন — রোজ রুটি করে এনে দিতেন। আজকাল ঠাকুরের নাম চারদিকে ছড়াচ্ছে। ভারতের সাধুরা সকলে জানে।

মঠে যিনি এসেছেন দেখলাম বেশ লোক, সব জানেন — well informed. বাংলা বোঝেন না সংস্কৃতের akin (সজাতীয়) শব্দগুলি বোঝেন। ওরা খুব advanced (প্রগতিশীল)।

শ্রীম (ভক্তের প্রতি) — কাল আপনারা আদি ব্রাহ্মসমাজে যেতে পারবেন? সিন্‌টি দেখলে বেশ হয়। সময় হয়ে এলো, বড় জিতেনবাবুর ওষুধটা দিন। এখন খাই নয়তো উনি এসে বক্‌বেন। (পিপ্পল চূর্ণের

সহিত ঔষধ সেবন করিতে করিতে) পিপ্পলচূর্ণ দেখলেই স্বামীজীর কথা মনে পড়ে। ঋষিকেশে ওঁর নাড়ি চলে গিছলো — যায় যায় অবস্থা। একজন সাধু পিপ্পলচূর্ণ নিয়ে এলেন। আবার নাড়ি ফিরে এলো — মুখে দেওয়ায় মধুর সঙ্গে। কেউ কেউ ভেবেছিল, বুঝি বা আর ফিরে আসবেন না। কিন্তু ঠাকুরের কাজ বাকী ছিল, তাই যোগাযোগ হলো। শোনা যায়, ঐ সাধুটি পিপ্পলচূর্ণ নিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর কাজ মানুষ কি বুঝবে? সব অলৌকিক!

বড় জিতেন প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — বুঝলেন জিতেনবাবু, আমার এমনি হয়ে গেছে স্বভাব, ঠাকুরের কথা ছাড়া আর কিছু মনে থাকছে না। সিন্ মনে থাকে — তাই ব্রাহ্মসমাজে সিন্‌টি দেখতে যাই।

বড় জিতেন — তা তো স্বাভাবিক। (বিনীতভাবে) ঠাকুরের কৃপায় আমরা যতটা দেখতে পেরেছি তাতেই দেখছি অন্য কিছু ভাল লাগে না তাঁর কথা ছাড়া, আর আপনার কথা কি?

ভৃত্য তেজু রাত্রির আহার লইয়া আসিয়াছে। ভক্তগণ দ্বিতলের ঘরে নামিয়া গিয়াছেন। একজন মাত্র রহিলেন। তিনি আহারের স্থান প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আহার দুধ আর রুটি। শ্রীম আহার করিতে বসিয়াছেন। একটু পর ভক্তকে কহিলেন, 'আপনিও নিচে যান কথামৃত নিয়ে। গিয়েই পড়তে আরম্ভ করে দিন। তা হলে আর বাজে কথা হতে পারবে না।' নিচে কথামৃত পাঠ চলিতে লাগিল; চতুর্থ ভাগ একাদশ খণ্ড সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এবার দ্বাদশ খণ্ড আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে শ্রীম অসুস্থ শরীর লইয়াই নিচে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছায় দ্বাদশ খণ্ড পুনরায় প্রথম হইতে পাঠ হইতে লাগিল। এখন দ্বিতীয় অধ্যায় চলিতেছে।

ঠাকুরদাদা (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) — তাঁকে ডাকি, মাঝে মাঝে অশান্তি হয় কেন? দু' পাঁচ দিন বেশ আনন্দে যায় তারপর অশান্তি কেন? ...আজ্ঞা, এখন কি করবো বলে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — হাততালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম করবে,

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল বলে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখুন, কিভাবে এই মহামন্ত্র দিলেন ঠাকুরদাদাকে। কেউ জপ করলে সিদ্ধ হয়ে যাবে — অশান্তি সব দূরে পালাবে। — 'হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল'।

পাঠ চলিতেছে। মহিমাচরণ ঠাকুরের আদেশে নারদ পঞ্চরাত্রির একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন। ইহাতে হরিভক্তির কথা আছে —

'অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।' (কথামৃত ৪/১২/২)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, সহাস্যে) — কি অদ্ভুত উপায় ঠাকুরের। ঠাকুরদাদা গান গাইতে ভালবাসেন। তাঁকে গান গাওয়াতেই রুচি করে দিলেন। মহিমাচরণ পণ্ডিত আবৃত্তি ভালবাসেন। তাঁকে তাতেই রুচি করিয়ে দিচ্ছেন। যার যে গুণ আছে তাকে সেইটি দিয়েই ঈশ্বরের দিকে lead (চালিত) করছেন — দৈবী উপায়। এমন একটি জিনিষ আছে ঠাকুরের কাছে যাকে যা বলছেন তাই হচ্ছে। (পাঠকের প্রতি) — কি সেইটি?

পাঠক — ঈশ্বরের will power (ইচ্ছাশক্তি)।

শ্রীম — হাঁ, যে will power (ইচ্ছাশক্তি) দিয়ে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় চলছে। কিন্তু এদিকে মানুষ— ছ' টাকা মাইনের পূজারী। রোগ, শোক-তাপ, দারিদ্র্য সব আছে। কি প্রহেলিকা!

শ্রীম নির্বাক ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিছুকাল পর আপন মনে গান গাহিতে লাগিলেন।

গান। প্রেম গিরি-কন্দরে যোগী হয়ে রহিব।
আনন্দনির্ঝর পাশে যোগধ্যানে থাকিব।।
তত্ত্বফল আহরিয়ে জ্ঞান-ক্ষুধা নিবারিয়ে,
বৈরাগ্য-কুসুম দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম পূজিব।
মিটাতে বিরহ-তৃষা কূপ জলে আর যাব না;

হৃদয়-করঙ্গভ'রে শান্তিবারি তুলিব।
কভু ভাবশৃঙ্গ 'পরে, পদামৃত পান ক'রে,
হাসিব কাঁদিব (আবার) নাচিব গাইব।। (কথামৃত ৪/১২/২)

শ্রীম (সহাস্যে) — ঠাকুরদাদার কাছ থেকে এই গানটি শিখে একদিন অতি সাধ করে অশ্বিনী দত্তকে শুনালাম। তিনি স্থির হয়ে শুনছেন। আমরা ভাবলাম, বন্ধুকে একটি অতি উপাদেয় নূতন জিনিষ দিয়ে তুষ্ট করা হলো। ওমা একটু পরে অশ্বিনীবাবু বললেন, 'ওটি আমারই রচিত' (শ্রীম ও সকলের অতি উচ্চহাস্য)। অত আশা করে নূতন জিনিষ শিখেছি — শুনিয়েছি, শেষে কিনা বলে ওটি আমারই (শ্রীম-র হাসির লহর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে থামিল)। ওঁর সঙ্গে আমাদের প্রায়ই দেখা হতো — একসঙ্গে পড়তাম। ওঁরও একটু খেপাটে ভাব ছিল, ঠাকুর যেমন বলতেন। তা না হলে কেন আসবেন ঠাকুরের কাছে! ওঁর বাবাকেও ঠাকুর ভালবাসতেন — তিন দিন কাছে রেখে দিছলেন ওঁর বাবাকে দক্ষিণেশ্বরে। যাঁদের লক্ষণ ভাল দেখতেন তাঁদের কাছে রেখে দিতেন অন্ততঃ তিন দিন — সংস্কার বদলিয়ে দিতেন এই করে।

৫

জনৈক ভক্ত — নর্থ বেঙ্গল রিলিফের জন্য বাজারের মেয়েরা কলকাতার রাস্তায় ভিক্ষা করেছিল। অশ্বিনীবাবু এতে আপত্তি করেন। তাঁর মত এতে সাধারণের নৈতিক অবনতি হতে পারে।

শ্রীম — তা বলবেন বৈকি। তিনি কি কেবল দেশসেবক? — মহাভক্ত লোক। (সহাস্যে) কেউ কেউ ভাইবোনের মিলন করে। থিয়েটারওয়ালারা সেটাকে রঙ্গ করে বেশ বলে — 'ভাইবোন হালু--চালু! এরা অনেক সময় হক্ কথা বলে। এতে অবনতির সম্ভাবনা খুব। কেন হবে না? — স্বভাবতঃই একটি অপরটিকে চায়। দূর থেকেই রক্ষা নাই — কাছে থাকলে কথা কি! এইজন্য ঠাকুর এ বিষয়ে অত সতর্ক।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — এই দেখুন না দু'রকম লোক আছে। একরকম লোক হবে হচ্ছে করে, আঁট নাই। আর এক থাক্ কচ্ছপের মত সব ইন্দ্রিয় ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। কেটে ফেল তবুও বের করবে না। এদের দ্বারাই কাজ হয় — ঈশ্বর দর্শন। কথামৃত পাঠ শেষ হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'তাঁকে পেতে হলে বহু বীর্য ধারণ করতে হয়।... স্ত্রীলোক একেবারে ত্যাগ — সন্ন্যাসীর পক্ষে... শেষে যা থাকে তা খুব refined (শুদ্ধ) হয়ে থাকে। লাহাদের ওখানে গুড়ের নাগরী সব রেখেছিল — নিচে একটু ফুটো করে। একবছর পর দেখলে সব দানা বেঁধে গেছে — মিছরীর মত। রস যা বেরিয়ে যাবার তা ফুটো দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আচ্ছা দেখুন অবতার ছাড়া কার এ দৃষ্টি আছে? কবে দেখেছেন লাহাদের বাড়িতে গুড়ের নাগরী। সেইটি মনে করে রেখেছেন। কি করে ঐটি কাজে লাগানো যায় তার চিন্তা করছেন। আর এখন কি সুন্দর দৃষ্টান্তরূপে ঐ দৃশ্যটি তাঁর কাজে লাগিয়েছেন। এই একটি দৃষ্টান্ত মনে থাকলে কাজ হয়ে যায় — ঈশ্বরে মনে যায়।

ব্রহ্মচর্য ছাড়া ঈশ্বরলাভ হয় না। পালন করতে গেলেও মহা বিপদ, বিশেষ গৃহস্থদের পক্ষে। স্বভাব হয়ে গেছে অন্যরূপ অভ্যাসের দ্বারা। বদলাতে হলে মনের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। তা ছাড়াও শারীরিক উপসর্গও দেখা দেয় — স্বপ্নদোষ। এই দেখে পাছে ভক্তরা ভয় পেয়ে যায় তাই এই দৃষ্টান্তটি দিয়ে অভয় দিচ্ছেন। যা যাবার যাক — নিজে চেষ্টা করে নষ্ট করো না। তা হলেই হবে। বাকী যা থাকবে তাতেই কাজ হবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঈশ্বর দর্শন — উপায় চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির জন্য ব্রহ্মচর্য আবশ্যক। চিত্ত মানে মন বুদ্ধি। একে গড়তে হলে নূতন করে, প্রথম শারীরিক পবিত্রতার দরকার। প্রথম শরীর-শুদ্ধি, তারপর চিত্তশুদ্ধি। এইজন্য সাধুদের অত কড়া নিয়ম। ভক্তদের ভরসার জন্য — ঊর্ধরেতার কথা তুলেছেন। নারদ শুকদেব — ঊর্ধরেতা, এঁদের আদপেই বীর্যপাত হয় নাই। বালককাল

থেকে অটুট ব্রহ্মচারী। আর একরকম ধৈর্যরেতা। এদের অনেক ক্ষয় হয়ে গেছে এখন আর করবে না। বলতেন, বার বছর বীর্য ধারণ করলে একটি মেধা নাড়ী হয়। সেটি হলে শাস্ত্রের মর্মার্থ ধারণ হয়। গুরুর কথার অর্থ বুঝতে পারে আর পালন করবার শক্তি লাভ হয়। তখন সর্বদা ঈশ্বরের কথা স্মরণ থাকে।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — ডাক্তারের পরামর্শ নেও, ওরা বলবে অন্য কথা। স্বপ্নদোষ হচ্ছে শুনে হয়তো বলবে বেশ্যা বাড়ি যাও। ঠাকুর তা বললেন না। তাঁর ব্যবস্থা, যায় যাক্ বের হয়ে খানিকটা আপনা থেকে। এসব ভাতের দোষে হয় বলতেন। বাকী যা থাকবে তা refined (শুদ্ধ) হয়ে থাকবে অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শনের শক্তি লাভ হবে মনে। সংযম না থাকলে মন স্থির হয় না — একাগ্রতা থাকে না। তাই ঈশ্বরের ভাব ধারণ করতে পারে না, হয়তো শুনছে কিন্তু ভুলে যাচ্ছে। প্রথম, মনে ঈশ্বরের বীজ পুঁততে হবে। জমি হলো মন। এটি উর্বর আর সারবান না হলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। মনরূপ জমিকে তৈরী করার জন্য ব্রহ্মচর্য অতি আবশ্যক। এছাড়া হয় না। ভয় দূর করে ভরসার জন্য অত সব কথা। ঠাকুর কিছু বাকী রেখে যান নাই। ভক্তদের যা যা প্রয়োজন সব দিয়ে গেছেন।

শ্রীম (সহাস্য ডাক্তারের প্রতি) — এই বই (কথামৃত) যখন বের হয়, অনেকে কত অভিশাপ করেছে। এমন বলেছে, লোকটার মরবারও ভয় নাই, অত ভাল লোকের সঙ্গে থেকেও। তারা ভেবেছে এ সব মিথ্যা কথা। আমাদের বানানো কথা — ঠাকুরের কথা নয়। অনেকের অসুবিধা হয়েছে কিনা এসব কথা প্রকাশ পাওয়ায়। সব তিনি বলে গেছেন আগে থাকতে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বিয়ের ব্যবস্থা কেন করলেন ভগবান? এ তো আর মানুষ করে নাই। তিনিই করিয়েছেন। কেন? না, সকলে একেবারে ত্যাগ করতে পারে না। তাই বিয়ে করে ত্যাগ কর ক্রমে। এ ব্যবস্থা ভক্তদের জন্য — সকলের জন্য নয়। অন্যদের তাঁর

সৃষ্টিরক্ষা কাজে লাগান। ভক্তরা হয়তো চেষ্টা করলো। ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে পারলে না, ভেঙ্গে গেল। ঠাকুরের এই কথা শুনে আবার নূতন উদ্যমে চেষ্টা করবে। চেষ্টা করতে করতে শেষে কৃতকার্য হয়। তখন সম্পূর্ণ ত্যাগ হয়ে যায়। তাদেরই বলে ধৈর্যরেতা।

মহিমাচরণকে বলছেন এই কথা — ক্রমে ত্যাগের কথা। 'তোমাদের সংসার ত্যাগের কি দরকার ... এতো বেশ, কেল্লা থেকে যুদ্ধ।' একেবারে পারবে না, তাই ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করতে বলছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে highest ideal-টি (উচ্চতম আদর্শটি) সামনে ধরে দিলেন — শুকদেব ঊর্ধরেতা। এ হলো শেষ কথা। এ আদর্শটি চোখের সামনে রাখলে তবে উপরে উঠতে পারবে। নিজের footingএ (আশ্রয় স্থানে) থেকে আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখলে, পরে নিজের চেষ্টা ও তাঁর কৃপায়, অল্পস্বল্প ভোটটোগ হয়ে যাবার পর, ক্রমে ভগবানের দিকে এগুবে। তারপর তাঁর দর্শন হবে। একটি পথে সম্পূর্ণ ত্যাগ, বাহির ভিতর উভয় ত্যাগ। অপরটি ক্রমে ক্রমে ত্যাগ প্রথমে ভিতরে ত্যাগ তারপর বাইরে। অমন মায়ের মত স্নেহে কে আর আমাদের উপদেশ দিবে ঠাকুর ছাড়া! মা কোন ছেলেকেই ছাড়তে পারেন না — পঙ্গু যে তাকেও রক্ষা করছেন। কেউ একবারে, কেউ ক্রমে উঠবে।

শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরদাদা সাধু হয়ে বের হয়ে গিছলেন। আবার ফিরে এলেন। তাই পূর্বেই তাকে বৈরাগ্যের, সন্ন্যাসের প্রতিবন্ধক কি তা বলে দিচ্ছেন। একটু তাড়াতাড়ি করায় থাকতে পারলেন না, ফিরে আসতে হলো ঘরে। ঠাকুর কিন্তু সাবধান করে দিছলেন। কি অন্তর্দৃষ্টি!

এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। শ্রীম আপন মনে হাসিতেছেন। আজ সারাটা সময় ভক্তসঙ্গে হাস্যরসে অতিবাহিত করিয়াছেন। মাঝে মাঝে গম্ভীর হইতেছেন। এখন পুনরায় কৌতুক আরম্ভ হইল।

শ্রীম — কৌতুক হাস্যে বলছেন, 'রমণীবাবু, আপনার ভাত যে

জুড়িয়ে যাচ্ছে?' কথার সঙ্গে সঙ্গেই হাসির উচ্চরোল উত্থিত হইল — সমুদ্র যেন তরঙ্গায়িত। হাসি আর থামে না, কুক্ষিতে ব্যথা ধরিয়াছে। উচ্চ হইতে উচ্চতর হাসি — আবার হাসির তরঙ্গ কয়েক মিনিট ধরিয়া চলিতে লাগিল। এখন থামিয়াছে — কিন্তু মুখমণ্ডলে হাসির ক্ষীণ রেখা দেখা যাইতেছে।

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) — ভাত জুড়াবার কথায় আর এক কথা মনে হচ্ছে। (আবার হাস্য) সিন্‌টা লঙ্কায় হচ্ছে। শ্রীমন্তকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে কাটবে বলে। যারা কাটবে তাদের সাতরাজার ধন দিয়েছে শ্রীমন্ত যাতে একটু অবসর দেয় এরি মধ্যে মাকে ডেকে নেবার। শ্রীমন্ত দেবীর বরপুত্র, বড় ভক্তিমান। মাকে চিন্তা করবে (আবার হাস্য) আর ওরা বলছে (হাস্য) — 'শীগ্‌গীর কর শীগ্‌গীর কর।' (দীর্ঘ হাস্য)। শ্রীমন্ত বলছে, 'তোমাদের সাতরাজার ধন দিলুম, আমায় একটু সময় দাও।' (সহাস্যে) ওরা বলছে, 'তুমি শীগ্‌গীর কর — এতক্ষণে আমরা পঞ্চাশটা মাথা কেটে ফেলতাম্‌। (সহাস্যে) 'ডেকে ন্যাও তাড়াতাড়ি। আমাদের ভাত জুড়িয়ে যাচ্ছে' (সকলের উচ্চহাস্য আর শ্রীম-র গভীর বিলম্বিত উচ্চহাস্য)। অনেকক্ষণ পর হাসি থামিল—যেন ঝড়ের পর সব শান্তি...। শ্রীম এইবার গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। বলিতেছেন, 'ভাত তো জুড়িয়ে গেল—কিন্তু জীবনের কত বড় problem solved (সমস্যার সমাধান) হয়ে গেল!'

শ্রীম বৃদ্ধ, তাতে আজ আবার অসুস্থ। কিন্তু এ বালসুলভ নির্মল আনন্দোচ্ছ্বাস কোথা হইতে আসিল? ইহাই কি পরমহংস পরিবারের বনেদি চাল — দেহ থেকে মনটাকে তুলে ফেলা তূণীর থেকে তীরের-মত, ইচ্ছামত!

কলিকাতা, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯২৪।
১০ই মাঘ, ১৩৩০, বৃহস্পতিবার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মনে ত্যাগ ও সর্বত্যাগ, গান্ধী মহারাজ

১

সূর্য এখনও উঠে নাই। শ্রীম উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে বসিয়া জগবন্ধু, বিনয়, ছোট অমূল্য, ছোট জিতেন ক্রমে ক্রমে আসিয়া বসিয়াছেন। 'ব্রাহ্মধর্ম' হইতে পড়িতেছেন বৈদিক সুরে —

ওঁ ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥
অনেজদেকং মনসোজবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবনপূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা-দধাতি।।

(ঈশাবাস্যোপনিষদ ১ এবং ৪)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — প্রশ্ন হয়েছে, সংসারে কি করে থাকতে হবে? যে প্রশ্ন করেছে তার সংসার সম্বন্ধে কতক জ্ঞান হয়েছে, বুঝেছে এ বড় মুস্কিলের স্থান। এখানে মন সর্বদা নীচের দিকে যাচ্ছে ভোগে আর পরিণাম কষ্ট। গুরু মুখে শুনেছে ঈশ্বর সুখস্বরূপ। তাঁকে দর্শন করে সুখ প্রাপ্তিই — যে সুখের সঙ্গে দুঃখ জড়িত নাই সেই সুখ প্রাপ্তি — মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। এ দোটানায় পড়ে শ্রীগুরুর শরণ নিয়েছে। তাই প্রশ্ন, কি করে চললে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়, চিরসুখ লাভ হয়। ঋষি উত্তর করিলেন, 'ঈশাবাস্যং' অর্থাৎ ঈশ্বর দৃষ্টি কর সংসারে। 'ইদং সর্বং' ইত্যাদির মানে সংসার অনিত্য দু'দিনের। আবার সংসার মনকে বিষয়ে বদ্ধ করে। তা হলেই দাঁড়াল, ঈশ্বর সত্য, জগৎ অনিত্য। অনিত্য সংসারে অর্থাৎ মায়ার এলাকায় থেকে কি করে মায়াতীত হওয়া যায় — কি করে তাঁর দর্শন হয়? তাই উপায় বলছেন 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'

— অর্থাৎ ভোগ নিও না এখানকার, তা হলে পারবে। সংসার কামিনীকাঞ্চনময়। এখানকার ভোগ না নিলে বড় জিনিষ লাভ করতে পার — ভূমা, ব্রহ্মানন্দ।

অনাসক্ত হয়ে থাকা। ঠাকুর বলেছিলেন, মনে ত্যাগ করবে। তাঁতে আত্মসমর্পণ করে থাকতে হয় — ঝড়ের এঁটো পাতার মত। মনে কি ত্যাগ হয়? একেবারে ত্যাগের কথা বললে ভয় পাবে তাই বলছেন, মনে ত্যাগ করবে। এ যেন কলার ভিতর কুইনাইন। মনে ত্যাগের চেষ্টা করে যখন পারবে, তখন বাইরেও ত্যাগ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথম বললে শুনবে না তাই বললেন, মনে ত্যাগ কর। এটি ক্রমে ত্যাগের পথ — gradual.

চৈতন্যদেব বলেছিলেন ভক্তদের কারু কারুকে — 'যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈঞা।' এটা একটা middle stage (মধ্যস্থল) — ভোগ ও সম্পূর্ণত্যাগের মাঝখানে এটা। রঘুনাথ দাস এই উপদেশ কিছুদিন পালন করলেন। শেষ অবধি আর পেরে উঠলেন না। একদিন দে ছুট। একেবারে পুরীতে মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে উপস্থিত। রাজ-ঐশ্বর্য আর পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রী, সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হলেন।

দু' একজনকে ঘরেও রাখেন কখনও কখনও মনে সব ত্যাগ করিয়ে — লোকশিক্ষার জন্য। কিন্তু বড় কঠিন। এটি যোগভোগের পথ — সেকেণ্ড ক্লাশ। ভোগ নিলেই বদ্ধ হয়ে গেল। তা নিজের উপার্জিতই হউক, অথবা পরের দেওয়া জিনিষই হউক। 'কস্যস্বিৎ ধনং' মানে অন্য কাহারও ধনে লোভ করবে না। তবে কি নিজের ধনে লোভ করবে — অর্থাৎ ভোগ করবে? না, তাও না। নিজের বা পরের সব ঈশ্বরের মনে করতে হবে। আমি সেবক — সাধারণ আহার ও বাসস্থানের দাবী আছে, এর বেশী নয়। যেমন বড় লোকের বাড়ির দাসী হয়ে থাকে। তাই ঠাকুর এই কথা ভক্তদের বলেছিলেন। স্থান কাল অবস্থা অনুযায়ী যতটা না নিলে নয় ততটা নেওয়া।

আর একটা আছে যোগীর থাক — তাদের শুধু যোগ, ভোগ

নাই। মৌমাছির মত শুধু মধু খাবে ফুলে বসে — যেমন নারদ, শুকদেব। সংসার অনিত্য বোধ হলে কেন যাবে থাকতে এখানে। কি দায় পড়েছে? এ অগ্নিকুণ্ডে, জ্বলন্ত দাবানলে কেন ঝাঁপ দিতে যাবে? তারা একেবারে ত্যাগ করে আত্মচিন্তা করবে। তবে কারুকে কারুকে ভিতর ফাঁক করে সংসারে রেখে দেন তাঁর কাজের জন্য — যেমন জনকাদি।

জনৈক ভক্ত — যোগীরাও আহার বাসস্থানের চিন্তা করেন। তা হলে কি করে ভোগ ত্যাগ হলো? আবার অসুখবিসুখে দেহের সুখেরও দরকার হয়।

শ্রীম — ঐ তো বলা হয়েছে যতটা দেহ ধারণের জন্য দরকার ততটা নেওয়া, এর বেশী নয়। অসুখবিসুখে দেহসুখে বদ্ধ করে না। তাদের এ ভোগ ভোগের মধ্যে নয়। দেহ থাকলে ঐ থাকে, দোষ নাই। কিন্তু আমরা — সংসারীদের, ভোগে প্রায় ষোল আনা মন। যোগীদের হয়তো এক আধ পয়সা। আবার তাঁর দর্শন হলে আদপেই থাকে না দেহে মন — দেখায় মাত্র যেন আছে। তাদের জন্য তখন ঈশ্বরের ভাবনা — 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্। (গীতা ৯/২২) তিনি অপর লোকের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি রূপে উদিত হয়ে তাদের দেহ রক্ষা করেন। ঠাকুর এই দুই থাকেরই লোক করেছেন। নরেন্দ্রকে দিয়ে যোগী থাকের সৃষ্টি করেছেন। আবার কয়েকজনকে গৃহেও রেখেছেন। সকলকেই ত্যাগ করতে হবে কামিনীকাঞ্চন একদিন। তা না হলে তাঁর দর্শন হয় না। যোগীদের পথটা direct (সোজা), আর যোগ ভোগের পথ gradual (ক্রমশীল)। তিনি বলতেন, আর একটা থাক আছে — ভোগী। আকারে মানুষ বটে কিন্তু কার্য পশুর মত। ভগবানে বিশ্বাস নাই, খালি ভোগ নিয়ে থাকে পশুর মত। ওদেশে আছে নিওহেগেলিয়ান্। তারা বলে, ঈশ্বরই যখন সব হয়ে রয়েছেন, তখন যত পার ভোগ কর — enjoyment with a vengeance (সকলের হাস্য)।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি) — ঈশ্বর অচল অটল সুমেরুবৎ।

আবার মনের চাইতেও বেগবান্। মন এক নিমেষে, সারা জগৎ ঘুরে আসে। ঈশ্বর এই মনের চাইতেও ক্ষিপ্রগামী। মানে, উনি সর্বব্যাপী। এমন স্থান নাই যেখানে ইনি নাই। মনের গতি time and space-এর (স্থান কালের) ভিতর হয়ে থাকে। তিনি যে এরও পারে, অর্থাৎ এরও কারণ। আজ এইটে স্বপ্ন দেখলুম — তিনি অচল অটল আবার মন থেকেও চঞ্চল। এই যে breathing-টি (শ্বাসপ্রশ্বাস) হচ্ছে — কি করে হচ্ছে? তিনি ভিতরে আছেন বলে হচ্ছে।

বড় জিতেনের চতুর্থ পুত্র আসিয়াছে, সঙ্গে একটি খুড়তুতো ভাই — বয়েস আট নয় বছর। এরাও শ্রীম-র উপনিষদ্ ব্যাখ্যা শুনিতেছে, বড় জিতেন এদের হাতে শ্রীম-র জন্য কিছু মনাক্কা আর একটি নূতন হাতপাখা পাঠিয়েছেন। ছোট ছেলেটি ভক্তদের পাখার বাতাস করিতেছে — ছেলেটির কয়েক মাস হয় পিতৃবিয়োগ হয়েছে।

শ্রীম (ছেলের প্রতি) — আমরা কি পড়ছি? বেদের নাম শুনেছ? এ সেই বেদ — উপনিষদ্। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পড় নাই বেদের কথা? এ সেই। (বইখানা ছেলের হাতে দিয়া) এই দেখ। তোমরাও বড় হলে পড়বে। এতে আছে মানুষ মরে ঈশ্বরের কাছে যায়। কার কাছে যায়?

ছেলে — ঈশ্বরের কাছে।

শ্রীম — কেন যায়? না, ঈশ্বর যে মানুষের সকলের চাইতেও আপনার তাই তাঁর কাছে যায়। আচ্ছা, আমরা কার কাছে যাই? আপনার লোকের কাছে যাই — মা, ভাই, বাপ, জেঠামশায় — এঁদের কাছে। তেমনি ঈশ্বরই মানুষের আপনার লোক। তাই মরে তাঁর কাছে যায়। আমাদের সঙ্গে দেখা হবে এর পর।

২

এক্ষণ সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন — চৈত্রমাসের উদ্বোধনের পাতা উল্টাইতেছেন। দুইজন নূতন ভক্ত আসিয়াছেন। এঁরা উহা আনিয়াছেন। আলো আসিতেই তিনি উহা

বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন চেয়ারে উত্তরাস্য। আজ ভাটপাড়ার ভক্তরাও আসিয়াছেন। বসন্ত, ভীম, বলাই, মাখন, শচী ও সুশীল আসিয়াছেন। লক্ষ্মণ, ছোট অমূল্য, ছোট জিতেন, বড় জিতেন, জগবন্ধু প্রভৃতি পূর্ব থেকেই রহিয়াছেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ডাক্তার ও বিনয় আসিলেন। এখন সোওয়া সাতটা বাজিয়াছে। শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের এক একটি কথার world of meaning (গভীর অর্থপূর্ণ)। আমাদের এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে অন্য সব পড়তে পারি না, ওঁর কথা ছাড়া। দেখুন না, সাধু বলছেন কাকে! যেমন মৌমাছি ফুল বৈ বসে না — অন্য মাছি অন্য জিনিষেও বসে — তেমনি সাধু ঈশ্বর বৈ কিছুই নেবে না। আর একটি বলেছিলেন, 'স্বাতী নক্ষত্রের ফটিক জল ছাড়া চাতক অন্য জল খাবে না। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু সব জলে ভরপুর, কিন্তু এ জল খাবে না — 'ফটিক জল' অর্থাৎ ঈশ্বর চাই!

(স্বগতঃ) 'শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণ কারণং'। মহারণ্য লোককে বের হতে দেয় না, তেমনি শাস্ত্রটাস্ত্র বেশী পড়লে গোল বেঁধে যায় — মন confused (সংশয়াচ্ছন্ন) হয়ে যায়। গুরুমুখে শোনা আর কাজ করা চাই। আর সাধুসঙ্গ চাই। তা না হলে শাস্ত্রের অর্থ বোঝা যায় না — clear idea (চিন্তাধারা নির্মল) হয় না।

শ্রীম (মাখনের প্রতি) — concrete case (বাস্তব অবস্থা) দেখতে চায় মানুষ। Abstract idea (অবাস্তব ধারণা) concrete form (স্থূল রূপ) নেয়। ত্যাগ ত্যাগ হাজার বল হৃদয়ঙ্গম হবে না। যে সব ত্যাগ করে দূরে দাঁড়িয়েছে তাকে দেখলে হয়। তাই আমরা নারায়ণ আয়াঙ্গারের কথা ভাবছি কয়দিন। কত বড় ত্যাগ করেছেন! দেখতে হয় এঁদের। নিজেরই কল্যাণ। শীঘ্র চলে যাবেন হিমালয়ে কোনও স্থানে।

আবার কেমন সব provide (ব্যবস্থা) করে দিয়ে এসেছেন পরিবারের ডালভাতের যোগাড় করেছেন। বাঙ্গালোরে ঠাকুরের মঠ করে দিয়েছেন। তাতে আবার endowment (দান) করেছেন যাতে

মাসে একশ’ টাকা আয় হতে পারে। কারুকে কষ্টে রেখে আসেন নাই। সব ঠিক ঠাক করে এসেছেন। কত বড় আধার! ঠাকুর এমনতর দুই একটা তৈরী করেন লোকশিক্ষার জন্য। ইনি, মনে করুন, এখন world (জগতের) এর মধ্যে one of the greatest men (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অন্যতম)। এঁকে দেখে অন্য লোক কি শিখবে? তাড়াতাড়ি পরিবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁকে ডাকতে চেষ্টা করবে নিশ্চিন্ত মনে। পরিবার কি সারাজীবন দেখতে হবে? দায় পড়েছে।

ক্ষণকাল শ্রীম চুপ করিয়া রহিলেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এমনি কাণ্ড। ঠাকুরবাড়ির কাছে একটি ছেলে মারা গেছে বছর দেড়েকের। মার এমন কান্না, শুনে আমিও কাঁদতে লাগলুম, আমি ছেলেও দেখি নাই, মাকেও না। দেখুন, কি যন্ত্রটি তিনি করেছেন। স্নেহ দিয়ে জগতকে বেঁধে রেখেছেন। এই স্নেহবন্ধন ছিন্ন করা কি ছেলেখেলা! তাই বলি, নারায়ণ আয়াঙ্গার কত বড় মহৎ লোক!

অর্থও বন্ধনের হেতু। চৈতন্যদেব টাকাওয়ালা লোকের সঙ্গে কথা কইতেন না। প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে দেখা করলেন না। পীড়াপীড়ি করে ধরায় অমনি উঠে চললেন আলালনাথে। ওঁর তো আর কিছুই বন্ধন নাই — বলা মাত্রই রওনা। আমরা গিছলাম আলালনাথে, পুরী থেকে এগার মাইল — খুব নির্জন স্থান।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে সমস্ত ভারতে এক নব জাগরণের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ফৌজদারী ব্যারিষ্টার বাংলার সি.আর. দাস সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া স্বরাজলাভে ব্রতী হইয়াছেন। এলাহাবাদের শ্রেষ্ঠ উকীল মতিলাল নেহেরুও ব্যবসা ত্যাগ করিয়া ঐ কার্যে ব্রতী। তাঁহারা উভয়ে স্বরাজ্যপার্টি গঠন করিয়া প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভাতে প্রবেশ করিয়াছেন। অবশ্য গান্ধীজীর মত নাই এতে। তাঁহারা বাংলার ব্রিটিশ সরকারকে আইনসভায় হারাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতায় এইজন্য খুব উত্তেজনা। ভক্তসভাতেও তাহার

ঢেউ আসিয়াছে!

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এঁদের কত জোর spirituality (আধ্যাত্মিক শক্তি) রয়েছে on the background (পেছনে), আর ancient civilisation (প্রাচীন সভ্যতা)। তাঁরা হারাবেন না? তাঁদের জোর কত! ওরা (ব্রিটিশ) ভোগ নিয়ে আছে, ওদের ভয়। ওদের civilisation (সভ্যতা) material (ভোগপ্রধান)। আহা, দাসমশায়ের কথা পড়তে ইচ্ছা হয় — বেঙ্গল কাউন্সিলে যা বলেছেন। কাগজখানা আনলে হয় মণিবাবুর বাড়ি থেকে।

একটি ভক্ত কাগজ আনিতে নিচে গেলেন। পাশের মেসে শুনিলেন বিকালের এ সংবাদ 'নিউ এম্পায়ারে' বের হয়েছে অন্য কাগজে নয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — গান্ধী মহারাজকে cite (উদ্ধৃত) করলেই বোঝা গেল sprituality-কে (আত্মতত্ত্বকে) cite (উদ্ধৃত) করেছে। এই সব যা হচ্ছে — এ হলো spirit-এর (আত্মচৈতন্যের) সঙ্গে matter-এর (জড়ের) বিবাদ। এঁদের (ভারতীয়দের) সঙ্গে ওরা (পাশ্চাত্যরা) পারবে না। সেন্ট্রাল লেজিস্লেটিভ এসেমব্লির সভাপতি ব্যাঙ্কুয়েটে (ভোজ সভায়) বলেছেন — নন্ কো অপারেশন আন্দোলন সম্বন্ধে — It is unique in the history of the world (জগতে অদ্বিতীয়)। এদেশ ত্যাগের দেশ কিনা — তাই এখানকার সব ঈশ্বরকে নিয়ে। কোন্ দেশে কে শুনেছে যে রাজনীতির বিবাদ করতে গেছে ঈশ্বর বিশ্বাসরূপ মহাস্ত্র নিয়ে। এই আত্মশক্তির কাছে ব্রিটিশের কামান হীনবল হয়ে যাবে। এ কি মানুষ করছে! ঈশ্বরই এ ধর্মপ্রস্থ ভারতবর্ষকে রক্ষার জন্য গান্ধী মহারাজকে দিয়ে এই অভিনব পথ বের করিয়েছেন। ভারতের জয় নিশ্চয় — কেউ রুখতে পারবে না। ঠাকুর এসেছেন। এইজন্য, ভারতকে উঠাবেন বলে। ভারত উঠলে সমস্ত জগতের শান্তি।

৩

রাত্রি নয়টা — কথামৃত পাঠ হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব দিবসে বিজয় কেদারাদি সহ পঞ্চবটীতে বসিয়া আছেন। আনন্দে ভক্তদের উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদির প্রতি) — মাগ-সুখ যে ত্যাগ করেছে সে জগৎ-সুখ ত্যাগ করেছে। ঈশ্বর তাঁর অতি নিকট। এই কামিনীকাঞ্চনই আবরণ। তোমাদের তো অত বড় বড় গোঁফ, তবুও তোমরা ঐতে রয়েছো... গীতা, ভাগবত, বেদান্ত সব ওর ভিতর!... যাকে ভূতে পায় সে জানতে পারে না যে আমায় ভূতে পেয়েছে। সে ভাবে আমি বেশ আছি। ...যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে, 'আজ্ঞে হাঁ' আমার স্ত্রীটি ভাল। একজনেরও স্ত্রী মন্দ নয়! (সকলের হাস্য)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এইটি hard unpalatable truth (কঠোর অপ্রিয় সত্য)! কে নেয় এই diagnosis আর prescription (রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা)! হক্ কথা বললে বন্ধু বেজার! এ কথা ক'জন বুঝতে পারে? পালন করা তো দূরের কথা। কখন কখন naked truth (নগ্ন সত্য) বলে ফেলতেন — কল্যাণের জন্য। এ না বললে যে ব্যারাম আরাম হবে না। সার্জন যখন ল্যানসেট (ছুরি) চালায় তখন রোগী চীৎকার করে আর গালাগাল দেয়। আবার আরাম হয়ে গেলে তখন ডাক্তারের বাড়িতে ভেট নিয়ে যায় আর বলে, আপনি আমার প্রাণদাতা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) — তোমরা পরস্পর প্রণয় করে থাকবে তবেই মঙ্গল হবে। ... ঈশ্বরে বেশী মন রেখে খানিকটা দিয়ে সংসারের কাজ করবে। সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা আর কাজে চার আনা।

শ্রীম — গৃহকে আশ্রম বানিয়ে থাকতে বলছেন। এইটি উপায়। সর্বদা তাঁর পূজা পাঠ নাম কীর্তন হবে। আবার সাধুরও উপায় বলছেন — পড় তো।

শ্রীরামকৃষ্ণ — সন্ন্যাসী নারীর চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। এমনি

কঠিন নিয়ম। রমণীর সঙ্গ তো করবে না — মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করবে না। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন যেমন, সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোটকা গন্ধ। ও গন্ধ থাকলে বৃথা সৌন্দর্য। বলেছিলেন, 'মারোয়াড়ী আমার নামে টাকা লিখে দিতে চাইলো, মথুর জমি লিখে দিতে চাইলো, তা ল'তে পারলাম না।'

শ্রীম — নিজে পূর্ণ সন্ন্যাসী কি না তাই, তাঁর আচরণ সন্ন্যাসীর ধর্ম। তাই নিজের কথা বলে সন্ন্যাসীর কর্তব্য বলে দিচ্ছেন। কোনও দিক বাদ দেন নাই। সন্ন্যাসী নিজের আদর্শ ঠিক রাখলে নিজেরও কল্যাণ, জগতেরও কল্যাণ। সন্ন্যাসী জগদ্‌গুরু — তার আচরণ লোকশিক্ষার জন্য।

কলিকাতা ২৯শে মার্চ, ১৯২৪
১৫ই চৈত্র, ১৩৩০, শনিবার।

সপ্তম অধ্যায়

পার্শী ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ও কাশীপুর উদ্যানে শ্রীম

১

রবিবার। শ্রীম দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া আছেন — সিঁড়ির সম্মুখে বেঞ্চিতে দক্ষিণাস্য। নিচে প্রাঙ্গণে মর্টন স্কুলের সাপ্তাহিক সৎপ্রসঙ্গ সভার আয়োজন হইতেছে। গত রাত্রিতে বেঙ্গল এসেমব্লিতে ব্রিটিশ সরকার পক্ষের পরাজয় সংবাদ পড়িবার জন্য শ্রীম ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাই আজ অতি প্রত্যুষে বিনয় ও জগবন্ধু সংবাদপত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তাহারা শ্রীম-র হাতে একখানা কাগজ আনিয়া দিলেন। তিনি মনোযোগপূর্বক পড়িতেছেন। এখন প্রায় সাতটা। শচীনন্দন আসিলেন, তাহার পর মোহনবাসী ও তাহার ভাগিনেয়। একটু পর গদাধর আশ্রমের মোহান্ত স্বামী কমলেশ্বরানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন — সঙ্গে একজন ভক্ত শিক্ষক। 'এঁদের মিষ্টিমুখ করাও' — এই বলিয়া শ্রীম সমাগত ভক্তদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্ত শিক্ষকের প্রতি) — সাধুসঙ্গ ছাড়া আমাদের উপায় নাই। আমরা গৃহে রয়েছি কিনা তাই সাধুসঙ্গ দরকার। এ যেন right (ঠিক) ঘড়ির সঙ্গে wrong (ভুল) ঘড়ি মিলানো। সাধুদের ঘড়ি ঠিক। শুধু এঁদের নিকট আসা যাওয়া করলেই চৈতন্য হয়ে যায়।

কথা শেষ না হইতেই বম্বের ভক্ত শ্রীজিনওয়ালা তদীয় পত্নীসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি বিখ্যাত পার্শী এটর্ণি। তাঁদের লইয়া আসিয়াছেন ডাক্তার ডি. মেলো। ইনি গোয়া নিবাসী ভারতীয় খ্রীশ্চিয়ান্। ইদানীং সংসার পরিত্যাগ করিয়া বেলুড়মঠে বাস করিতেছেন — নাম ব্রহ্মচারী হরিদাস। ইহাদের উদ্দেশ্য শ্রীমকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বর

মন্দির দর্শন করিবেন। এখন সকাল আটটা বাজিয়া সাত মিনিট। মধ্যাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে থাকা হইবে এইজন্য শ্রীম একজন সেবককে সঙ্গে লইলেন। সকলে নিম্নতলে আসিয়া মোটরকারে উঠিলেন। শ্রীম পশ্চাতের আসনে ডানহাতে বসিলেন বামদিকে জিনওয়ালাদম্পতী। সম্মুখে ব্রহ্মচারী হরিদাস ও সেবক। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া গাড়ী বাগবাজারে আসিল। বিখ্যাত নবীনের দোকান হইতে সন্দেশ ও রসগোল্লা লওয়া হইল — শ্রীশ্রী মাকালী ও ঠাকুরের ভোগের জন্য। কাশীপুর, বরানগর বাজার, রামরাজাতলা হইয়া চটকলের গা ঘেঁষিয়া গাড়ী আলমবাজারের মোড়ে উপস্থিত হইল, সেখান হইতে দক্ষিণেশ্বর।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির। কি মনোরম স্থান! কত সুন্দর ও পবিত্র। সম্মুখে পতিতপাবনী জাহ্নবী। তারই পূর্বতটে সুবিস্তৃত উদ্যান, তাতে মন্দির। মা কালী ভবতারিণী, রাধাকৃষ্ণ ও দ্বাদশ শিবের পৃথক্ পৃথক্ মন্দির রহিয়াছে। এই উদ্যান মধ্যে নবযুগের অবতার জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহ, তাঁহার তপোভূমি পঞ্চবটী ও বিল্বতল বিদ্যমান। প্রায় নিত্য জগতের সুদূর প্রান্ত হইতে এই পবিত্র ভূমি দর্শন করিতে বহু লোক আসিয়া থাকে — জাতিধর্মনির্বিশেষে। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় ত্রিশ বৎসর এ মন্দিরে বাস করেন। কত কঠোর তপস্যা করেন — দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া। তৎপর কত রূপে, কত কথায় শ্রীভগবানের বহুবিধ দিব্যবিলাস উপভোগ করেন। এইখানেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত যিনি, এই পরমব্রহ্মকে ইনি দর্শন করেন। তাঁহার সহিত জগদম্বারূপে — স্নেহময়ী জননীরূপে সর্বদা দর্শন, স্পর্শন ও আলাপন করেন। স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়াও মাতৃঅঙ্কে শিশুবৎ জগন্মাতার আশ্রয়ে থাকিয়া ভক্তবৎ সারা জীবন অতিবাহিত করেন। পরমব্রহ্মের বিলাসরূপ — শিব, কালী, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁদের সঙ্গে আলাপ ও আনন্দ করেন। ঈশামুশা ও মহম্মদ রূপ এইখানেই দর্শন হয়। এ পবিত্র ভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের প্রধান ধর্মমতগুলির সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। হিন্দুর শাক্ত, বৈষ্ণবাদি শাখাপ্রশাখা মতের সাধনও এখানেই

হয়। আবার ক্রিশ্চিয়ান ও মুসলমান মতের সাধনেও সিদ্ধিলাভ করেন। তাই এ স্থান অতি পবিত্র সকল ধর্মাবলম্বীর নিকট। এই স্থান নবযুগের নবীনতীর্থ — অধ্যাত্ম জগতে যেন ডায়নামো। অনুকূল মনোভাব লইয়া গেলে আজও ভক্তগণ ঈশ্বরীয় শক্তির আকর্ষণ অনুভব করেন। 'যত মত তত পথ' — ধর্মসমন্বয়ের এই উদার বৈদিক বাণী এস্থান হইতেই পুনঃ উত্থিত হয়। ভবিষ্যৎ জগতের সর্বজাতির সম্মিলন সূক্ষ্মরূপে এইখানেই সংসাধিত হয়। এইস্থানই অধ্যাত্মবহ্নি জ্ঞানঘনমূর্তি শ্রীবিবেকানন্দের উদ্ভবস্থল। তাই এখানকার প্রতি ধূলিকণা পবিত্র, বায়ুমণ্ডল পবিত্র, বৃক্ষলতা পবিত্র, পশুপক্ষী, জনমানব সকলই পবিত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ শ্রীম ঠাকুরঘরের উত্তর দিকে উদ্যানে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। কি আশ্চর্য, এক মুহূর্তে শ্রীম যেন বালক হইয়া গেলেন — সপ্ততিবর্ষীয় এই বৃদ্ধ! তিনি কি শ্রীগুরু রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শিশুভাব ধারণ করিলেন?

২

এইবার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ আরম্ভ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহের উত্তরের বারান্দার বাহিরে পূর্ব-উত্তর কোণে ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীম প্রণাম করিতেছেন। এইস্থানে দাঁড়াইয়া ঠাকুর ভক্তদের বিদায় দিতেন, তাই উহা পবিত্র। ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া ছোটখাটের সম্মুখে মধ্যস্থলে পুনরায় ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। ভক্তগণও শ্রীম-র অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এইবারে উত্তরের দরজা দিয়া নহবতে আসিলেন। শ্রীজিনওয়ালাকে বলিলেন, 'এই গৃহে আমাদের জননী শ্রীশ্রীমা বাস করতেন।' অত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কি করিয়া মানুষ থাকিতে পারে ভক্তগণ উহা ভাবিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীম অগ্রে চলিতেছেন, পশ্চাতে জিনওয়ালা, তদীয় পত্নী, ডাক্তার ডি.মেলো ও সেবক। পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন — পশ্চিমে বাম হস্তে গঙ্গা। সকলে নহবতের ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া শ্রীম বলিতেছেন, "এই আমাদের মায়ের স্নানঘাট। অতি প্রত্যুষে স্নানাদি সেরে নিয়ে নহবতের সিঁড়ির উপর বসে তিনি মালা জপ করতেন। ঠাকুরের সেবার জন্যই কেবল অত কষ্ট করে তিনি এখানে বাস করতেন।' শ্রীম হস্তদ্বারা ঘাট স্পর্শ করিলেন। অদূরে অল্প উত্তরে গঙ্গাতীরে একটি ইষ্টক নির্মিত বসিবার স্থান আছে, তাহাও হস্তস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। আর বলিলেন, 'এই আসনে একদিন ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে বসেছিলেন।' এইবার পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন। পঞ্চবটীর অশ্বত্থের পাদমূলে প্রণাম করিলেন — পূর্বাস্য হইয়া। ভক্তদের বলিলেন, 'এই পবিত্র পঞ্চবটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্বহস্তে রোপণ করেন।' ধ্যান-ঘরের দ্বারদেশে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া — গৃহ প্রদক্ষিণ করিতেছেন। গৃহ অর্গল বদ্ধ। দক্ষিণের জানালার নিম্নস্থিত সোপানে আরোহণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ শিবমূর্তি দর্শন করিলেন। ভক্তগণ দর্শন করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, 'এই শিবমূর্তি ও অপর দ্রব্যাদি কি ঠাকুরের সময়কার?' শ্রীম বলিলেন, 'না, না, কিছুই তাঁর সময়ের নয় — শিবমূর্তিও নয়। এই ঘরই তাঁর সময়কার নয়। এইস্থানে একটি মাটির ঘর ছিল। ঠাকুর এখানে বসে ধ্যান করতেন।

জানালার নিম্নস্থিত ক্ষুদ্র সোপানে আরোহণ করিবার সময় জিনওয়ালা জুতা খুলিতেছিলেন। সেবক বলিলেন, 'জুতো খোলার কোনও প্রয়োজন নেই — জুতো নিয়েই উঠুন।' শ্রীম বাধা দিয়া বলিলেন, 'না, এখানকার সব পবিত্র।' পুনরায় পঞ্চবটী অর্ধ-পরিক্রমা করিয়া উত্তর দিকে চলিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আদি-সাধনস্থল পুরাতন বটবৃক্ষবেদিকার উত্তর-পশ্চিম কোণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বেদিতে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলেন এবং ভক্তদের বলিতে লাগিলেন, 'এইখানে আমি একদিন তাঁকে দর্শন করেছিলাম। তিনি ঝাউতলা হইতে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে গাঢ়কৃষ্ণ-মেঘাচ্ছন্ন আকাশ — ডান হাতে গঙ্গাজলে তার প্রতিবিম্ব।' পুরাতন বটবৃক্ষের উত্তরদিকের একটি মূল শাখা ভাঙ্গিয়া পশ্চিমে গঙ্গার দিকে পড়িয়াছে। তাহা হইতে গঙ্গাতীরে বেদির উত্তরপশ্চিম কোণে একটি নূতন বটবৃক্ষের

উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীম ভগ্ন শাখাটি দেখাইয়া বলিতেছেন, ‘এ শাখাটি আশ্বিনের ঝড়ে ভেঙ্গে যায় (১৮৬৪ খৃঃ, ৫ই আশ্বিন) *।’ বেদিকা প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্বদিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বেদিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণামান্তর ভক্তদের বলিলেন, ‘এইখানে একদিন ঠাকুর বসিয়াছিলেন। তাঁহার পাশে বসা ছিলেন বিখ্যাত ব্রাহ্মভক্ত কেশব সেন।’ পঞ্চবটী ও পুরাতন বটবৃক্ষবেদিকার মধ্যস্থলে মাধবীলতা বিদ্যমান। ইহা বেশ মোটা হইয়াছে। শ্রীম ইহা দেখাইয়া বলিলেন, ‘এই মাধবীলতা শ্রীবৃন্দাবন হ’তে আনিয়ে নিজ হাতে ঠাকুর রোপণ করেছিলেন। এই স্থানেই খোলা জায়গায় তোতাপুরী থাকতেন। তাই ঠাকুর সর্বদা যাতায়াত করতেন। খুব পবিত্র স্থান।’ বেদিকায় আরোহণ করিবার জন্য দুইটি সোপান রহিয়াছে — একটি উত্তর-পশ্চিম কোণে অপরটি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। দ্বিতীয়টির নিকট আসিয়া শ্রীম বলিতেছেন, ‘এই উপরের সিঁড়িটিতে একদিন ঠাকুর বসেছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কেদার চাটুয্যে বামদিকে বসা। তাঁদের উপদেশ দিচ্ছিলেন, সেইদিন তাঁর জন্মোৎসব ছিল।’

জিনওয়ালা (শ্রীম-র প্রতি) — কি উপদেশ দিয়েছিলেন?

শ্রীম (সেবকের প্রতি) — কি, না গা?

সেবক (বাংলায় শ্রীম-র প্রতি) — কামিনীকাঞ্চনই বন্ধন। ইহাই সত্যকে জানতে দেয় না। ইহা ত্যাগ করতে হবে। যে স্ত্রীসুখ ছেড়েছে সে জগৎ সুখ ছেড়েছে। বলেছিলেন, তোমাদের অত বড় বড় গোঁফ কিন্তু এতেই রয়েছো। বেদ, বেদান্ত, গীতা সব এর ভিতরে। যাকে ভূতে পায় সে জানতে পারে না তাকে ভূতে পেয়েছে। যে মাতাল সে নিজের অবস্থা বুঝতে পারে না। কামিনীকাঞ্চনের নেশায় মানুষ ডুবে আছে। (সহাস্যে) আরোও বললেন, যাকে জিজ্ঞেস করি সে-ই বলে আমার স্ত্রীটি ভালো। কারো স্ত্রী খারাপ নয় (শ্রীম-র হাস্য)। কাল রাত্রে এটা পাঠ হয়েছিল ভক্ত সভায়।

শ্রীম (ইংরেজীতে, জিনওয়ালার প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন,

---

* (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪ খৃঃ, ৫ই আশ্বিন, ১২৭১ সন)

বাপু ভোগ নিও না। তাহলে সংসারে বদ্ধ হয়ে যাবে। আর সকলকে ঈশ্বরের রূপ বলে জানবে। স্ত্রীলোক জগদম্বার রূপ, তাই তাকে সসম্মানে পুজো করতে হয়।

এইজন্য সাধুসঙ্গ দরকার। সাধুরা কোনটা সৎ কোনটা অসৎ ইহা জেনেছেন। ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য, এ বোধ তাঁদের হয়ে গেছে। তাঁকে জানবার এই এক উপায় — সৎসঙ্গ।

ঠাকুর এখানে বসে, আর আমরা এখানে (ঠাকুরের ডানদিকে) রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুনছি।

আমার মনে হচ্ছে — শ্রীমতী জিনওয়ালা হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি বরং এখানে বসে বিশ্রাম করুন, আমরা ততক্ষণ বেলতলা দেখে আসি।

শ্রীম বিল্বতলে আসিয়াছেন, সঙ্গে সকলেই আছেন। বেদিকার উপর-দক্ষিণ দিকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। বেদিকার উপর পূর্বদিকে একটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, 'একদিন একটি ভক্ত ঠাকুরের উপদেশ অনুসারে এখানে পূর্বমুখীন্ বসে ধ্যান করছিলেন। কয়েক ঘন্টা কেটে গেল। ঠাকুর স্বয়ং ভক্তটিকে দেখতে এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন — এইখানে (শ্রীম ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন)। ভক্ত চক্ষু খুলে বিস্ময়ানন্দে মগ্ন হলেন — সম্মুখে শ্রীভগবান দাঁড়িয়ে। হৃদয়ে যাকে ধ্যান করছিলেন, তিনিই বাইরে দাঁড়িয়ে। তাই এ স্থান অতি পবিত্র।'

এই বেলতলায় তন্ত্রমতের কঠোর সাধন সব করেছিলেন। মানুষ ও জানোয়ারের মৃতদেহ চারদিকে — মাঝখানে বসে ঠাকুর। এ খুব কঠিন সাধনা। ব্রাহ্মণী খুব সাহায্য করেছিলেন। মানুষ মৃত্যুকে ভুলে যায় কিনা, তাই মৃতদেহ নিয়ে বসে এই সাধনা — যাতে মনে এটি স্মরণ হয়। তবেই তো ঈশ্বরে মন বসবে।

হাঁসপুকুরের দক্ষিণ ঘাটের চত্বরে আসিয়া শ্রীম ভক্তসঙ্গে দাঁড়াইয়াছেন। মধ্যস্থলটি দেখাইয়া শ্রীম বলিতে লাগিলেন, 'এইখানে একদিন ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন — পাশেই নরেন্দ্র। ঠাকুর নরেন্দ্রের ভবিষ্যৎ অতি মহৎ এইসব কথা বলছিলেন। এই পুকুরের জলে ঠাকুর শৌচাদি করতেন।' চত্বর স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া কুঠিতে

আসিলেন। পশ্চিমদিকের সোপান বাহিয়া বারান্দায় উঠিয়াছেন। সোপানের সম্মুখের প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া বলিতেছেন, ‘এই ঘরে ঠাকুর অনেক বছর (১৬ বছর) বাস করেছিলেন। মথুরবাবুর ছেলে ত্রৈলোক্যরা উপরে থাকতেন।’ উত্তরের ফটক দিয়া মন্দিরাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরের সোপানতলে আসিয়া শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন। সকলের নিম্ন সোপানটিতে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপর উপরে উঠিয়া বারান্দায় বিগ্রহের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। এইবার চরণামৃত ধারণ করিয়া নিচে নামিয়া মন্দির অর্ধপরিক্রমা করিলেন। ভক্তদের রন্ধনশালা দেখাইয়া বাসনমাজার ঘাটে আসিতেছেন। ডান হাতে মা কালীর মন্দির বাঁ হাতে ফটকের বাইরে গাজীতলা পুকুর। এই পুকুরের ঘাট দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, ‘এই বাসনমাজার ঘাট। এইখানে মায়ের বাসন ধোয়া হয় তাই এই নাম। আর এই পাশের ঘরে মায়ের ভোগ রান্না হয়।’

৩

শ্রীম ভবতারিণীর সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া ভক্তসঙ্গে প্রণাম করিতেছেন — ডান হাতে মা দক্ষিণাস্যা। এইবার সঙ্গে আনীত উত্তম মিষ্টান্ন ও টাকা মায়ের সেবায় নিবেদন করিলেন। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র সেবক শ্রীযুক্ত রামলাল দাদা ও তৎপুত্র নকুল মায়ের সেবক। তাঁহারা সকলের হাতে চরণামৃত দিলেন, আর ললাটে সিন্দুকের তিলক অঙ্কিত করিয়া দিলেন। নাটমন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। শ্রীম বলিতেছেন, ‘এইখানে যাত্রাদি ভগবৎ গুণকীর্তন হয়।’

ডাক্তার ডি. মেলো — ঠাকুরের কিছু স্মৃতিকথা এস্থানের সম্বন্ধে আছে কি?

শ্রীম — হাঁ (উত্তর দিক থেকে দ্বিতীয় সারির মধ্যস্থলের) এই পিলারটি আলিঙ্গন করে ঠাকুর একদিন প্রেমাশ্রু বর্ষণ করছিলেন। এখানে যাত্রা হচ্ছিল।

শ্রীম বলির স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার ডি. মেলো

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিনা বলিতে কি পূজা হতে পারে না?' শ্রীম উত্তর করিলেন, 'হাঁ, পারে। বৈষ্ণবরা কখনও বলি দেয় না। একবার বৈষ্ণবদের হাতে মন্দিরের ব্যবস্থার ভার পড়েছিল তখন সব বলি বন্ধ হয়ে গিছলো।' বলির স্থান হইতে শ্রীম মাকে যুক্ত করে দর্শন করিতেছেন। বিবিধ পুষ্পসাজে ও অলঙ্কারে শোভিতা দেবী-প্রতিমা যেন জীবন্ত। শ্রীম যুক্ত করে নিবিষ্টমনে দর্শন করিতে করিতে দেবীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন অল্প পশ্চিমাংশে। ভক্তগণ চারিদিকে ঘিরিয়া আছে। কথাবার্তা হইতেছে।

জিনওয়ালা (শ্রীম-র প্রতি) — কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবীর দর্শন না পেয়ে অধীর হয়ে খড়্গা নিয়ে নিজকে বধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন — একথা আপনি নিজ কর্ণে শুনেছেন?

শ্রীম — না, আমি শুনি নাই।

ডি. মেলো — আপনার বইয়েতে — 'কথামৃতে' আছে?

শ্রীম — না, এ বইতে নেই। অন্যরা হয়তো কেউ লিখে থাকবেন। আমরা লিখি নাই।

ডি. মেলো — ঠাকুর নিজেই ঈশ্বর। ঈশ্বরকে দেখবার জন্য অধীর হয়ে নিজেকে বধ করা কি করে সম্ভব হতে পারে?

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, জগন্মাতা বিশ্বরূপ ধারণ করে আছেন। সেই জগন্মাতাই ঠাকুরের দেহে বিদ্যমান। দেবী স্বয়ং তাঁকে বলেছিলেন, আমার বহুরূপের ভিতর এটি একটি বিশেষরূপ। ঠাকুর ভক্তভাবে ঐরূপ করেছেন। তিনি নিজেই ভক্ত ও ভগবান উভয়ই।

এইবার পশ্চিমের সোপান দিয়া সকলে প্রাঙ্গণে অবতরণ করিলেন। উত্তরের সারির শিবমন্দিরের সোপানে প্রণাম করিয়া শ্রীম ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। ছোট খাটের উত্তরপূর্বকোণে পশ্চিমাস্য হইয়া শ্রীম কুশাসনে বসিলেন। গঙ্গা সম্মুখে — পশ্চিমের দরজা দিয়া দর্শন হইতেছে। শ্রীম-র ডান হাতে দেয়ালের পাশে জিনওয়ালা দম্পতি দক্ষিণমুখী হইয়া মাদুরে উপবিষ্ট। শ্রীম-র পশ্চাতে সেবক ও ডি. মেলো। ভাটপাড়ার ললিত ও গদাধর আসিয়া মিলিত হইলেন।

শ্রীম-র অভিপ্রায় অনুসারে সন্দেশ ও রসগোল্লা প্রসাদ সকলে ঠাকুরের সম্মুখে আনন্দে খাইতে লাগিলেন। শ্রীমতী জিনওয়ালা খাইলেন না — সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া যাইবেন। গৃহে শ্রীরামলাল দাদা প্রবেশ করিলেন, সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া তাঁকে অভ্যর্থনা ও নমস্কার করিয়া বসাইলেন। তিনি শ্রীম-র পাশে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত প্রসাদের অর্ধাংশ পূর্বেই পৃথক করিয়া দাদার জন্য রাখা হইয়াছে। এক্ষণে দাদাকে সেই প্রসাদ উপহার দেওয়া হইল।

শ্রীম — (দাদার প্রতি) গান না আপনি একটা গান। শুনিয়ে দিন এঁদের।

দাদা গাহিতেছেন —

চিন্তয় মন মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।
কিবা অনুপম ভাতি মোহন মূরতি ভকত-হৃদয়-রঞ্জন॥
নব রাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত।
কিবা বিজলী চমকে সে রূপ আলোকে, পুলকে, শিহরে জীবন॥
হৃদি কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্তমনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়-দর্শন!
চিদানন্দরসে ভক্তিযোগাবেশে হও রে চিরমগন॥

(কথামৃত ১/১/৮)

শ্রীম ইংরেজীতে অর্থ বলিয়া দিতেছেন।

৪

ঠাকুরের ঘরের উত্তরের বারান্দায় শ্রীম ও রামলাল দাদা দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের চারিদিকে জিনওয়ালা দম্পতি, ডাক্তার ডি. মেলো, সেবক, ললিত, গদাধর প্রভৃতি রহিয়াছেন। শ্রীম পূর্বদক্ষিণ কোণ দেখাইয়া শ্রীযুক্ত জিনওয়ালাকে বলিতেছেন, ‘এইখানে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চল সমাধিস্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আর নরেন্দ্র এই গানটি গাহিতেছিলেন। আমার এই প্রথম সমাধি দর্শন — সুখ দুঃখের অতীত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় অবস্থা।’ বারান্দার পূর্ব দেয়ালে ঠাকুরের

নিজ হস্তে অঙ্কিত ময়ূরমূর্তি দর্শন করিয়া সকলে বিদায় লইলেন। গাড়ী ফটকের দিকে আসিতেছে — শচীনন্দন তখন বাগানে প্রবেশ করিলেন। আলমবাজার মঠ দেখিয়া গাড়ী বরানগরে আসিয়াছে। সেবক ডাক্তার ডি. মেলোর কানে কানে বলিলেন, ঐ কাশীপুর মহাশ্মশান — এইখানেই ঠাকুরের দেহ দাহ করা হয়।' ডাক্তার শ্রীমকে বলিলেন, 'আমরা কি একবার কাশীপুর শ্মশান দর্শন করে নেবো?' শ্রীম গাড়ীর পিছনের আসনে বসিয়া আনন্দে শ্রীযুক্ত জিনওয়ালার সঙ্গে নানা কথা কহিতেছিলেন। 'কাশীপুর শ্মশান—' এই কথা শোনা মাত্র বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা শ্রীম-র মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল, প্রফুল্ল মুখকমল যেন বিষাদ মেঘে আচ্ছন্ন হইল। সেবক উহা লক্ষ্য করিয়া, ডাক্তারকে পুনরায় এই প্রসঙ্গ উঠাইতে বারণ করিলেন; আর বলিলেন, 'পূর্বেও আর একবার ঠিক এইরূপ যন্ত্রণা হয়েছিল। এঁদের প্রেমের শরীর, বিরহ ব্যথা অসহনীয় হয়ে উঠে, ঐ কথা শুনলে।' গাড়ী আসিয়া কাশীপুর উদ্যানে প্রবেশ করিল — দক্ষিণ ফটক দিয়ে। ঠাকুরের বাসগৃহের পশ্চিম গায়ে সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন।

শ্রীম কাশীপুর মন্দিরের সোপানে প্রণাম করিলেন। গৃহ পশ্চিমমুখী — দ্বিতল। উহার উত্তরে রন্ধনশালা আর উত্তর-পূর্বে আস্তাবল। এই উদ্যানে আজকাল একটি আর্মেনিয়ান খ্রীস্টান পরিবার বাস করিতেছেন। এঁরা অতিশয় মহৎ লোক। যারা এ স্থান দর্শন করিতে আসে তাদের অনুমতি দেন। এই স্থান দর্শন করিতে আজ পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত হইতে লোক আসিতেছে — আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে। এই মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ রোগশয্যায় দশ মাস বাস করিয়াছিলেন। এখানেই তাঁহার মহাসমাধিলাভ হয়। রোগচ্ছলে তাঁহার গৃহী ও ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তদের এইখানেই আকর্ষণ করেন। এই স্থানেই শ্রীভগবানের সেবাকে আশ্রয় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ সংঘটিত হয় — বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়। এই উদ্যানেই শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু সাজিয়া একদিন অধিকারী অনধিকারী আগত

জনগণকে নির্বিচারে আত্মদর্শন করাইয়াছিলেন। এইখানেই সন্দিগ্ধ নরেন্দ্রনাথকে অন্তিম শয্যায় বলিয়াছিলেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।' এইখানেই নরেন্দ্রনাথকে সর্বশক্তি প্রদান করিয়া ফকির হইয়াছিলেন। এই উদ্যান আজ পবিত্র তীর্থভূমি।

ডাক্তার ডি. মেলো অনুমতি পত্র প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীম সকলকে লইয়া উত্তর দিকের ভৃত্যশালা, রন্ধনশালা প্রভৃতি দর্শন করিতে লাগিলেন। উত্তরের ঘর দেখাইয়া শ্রীম জিনওয়ালাকে বলিলেন, 'এই রন্ধনশালা, আর এখানে থাকতেন আমাদের মা' (মূলবাড়ির একতলার উত্তরপূর্ব কোণের ঘরে)। ধীরে ধীরে আসিয়া আস্তাবলে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে উত্তরদক্ষিণ লম্বমান — তিনটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। ইহা অশ্বশালা, সেবকগণ এখানে থাকিতেন। পায়ের জুতা ছাড়িয়া যুক্তকরে প্রণামমুদ্রায় শ্রীম দক্ষিণের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল চুপ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন — কি যেন ভাবিতেছেন। তারপর শ্রীম কথা কহিতেছেন, "একদিন সকালবেলায় এই পুণ্যগৃহে, পরে যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে সাধু হয়েছিলেন, তাঁরা তন্ময় হয়ে এই গানটি গেয়েছিলেন —

'শশধর তিলক ভালে গঙ্গা জটাপর, করে লয়ে ত্রিশূল রুদ্র বিরাজে।
ভস্ম অঙ্গ ছায়ি, গলে রুণ্ডমালা, ভৈরব ত্রিলোচন হরযোগী সাজে।'

(প্রার্থনা ও সঙ্গীত, রামকৃষ্ণমিশন সারদাপীঠ, বেলুড়মঠ)

তীব্র বৈরাগ্য তাঁদের, সর্বত্যাগী মহাদেব তাঁদের আদর্শ। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গাইছিলেন, — জ্বলন্ত ত্যাগ। ভবিষ্যতের আচার্য তৈরী হচ্ছিল এইখানে।"

অন্য ঘরগুলির সম্মুখ দিয়া যুক্তকরে শ্রীম গমন করিতেছেন — পূর্ব পুকুরের উত্তর পশ্চিম কোণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুষ্করিণীর দক্ষিণের ঘাটটি দেখাইয়া বলিলেন, 'এখানে আমরা এসে কখনও বসতাম'। এইবার ঘাটে আসিলেন, এবং ঘাটের দক্ষিণের একটি আম্রবৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, 'এর নিচে নরেন্দ্র ধূনী জ্বালিয়ে ধ্যান করেছিলেন। এই ঘাট থেকে বাগানের বড় রাস্তায় যাবার একটা পথ

ছিল। এখন তার চিহ্নও নাই। এই ঘাটে বসে ভক্তগণ গরমের সময় ধ্যান করতেন। সাঁইত্রিশ বৎসর পর এবার এখানে এলুম।'

শ্রীম স্বামীজীর তপোভূমি আম্রবৃক্ষতলে আসিয়াছেন। পবিত্র বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। বলিলেন, 'এখানে ধূনীর পাশে বসে নরেন্দ্র ধ্যান করছিলেন। গায়ে কত পোকা এসে বসেছে — হুঁস নাই। মন অতি উচ্চে ব্রহ্মে লীন — বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত, যেন জড়।'

শ্রীম উদ্যানের বড় রাস্তায় আসিতেছেন। ডান হাতে মন্দির। একটি পাইন বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, 'এই ইনি আমাদের পুরাতন বন্ধু।' এতক্ষণে মন্দির প্রদক্ষিণ হইয়া গেল। শ্রীম মন্দিরের নিম্নতলে পাদপীঠে দাঁড়াইয়া আছেন। উপর হইতে অনুমতি আসিয়াছে; এইবার দ্বিতলে আরোহণ করিতেছেন। সোপানশ্রেণী উত্তর পশ্চিমদিকে। শ্রীম বলিলেন, 'এই সিঁড়ি ওদিকে ছিল — পূর্বউত্তরে মায়ের ঘরের পাশে — বদলিয়েছে ওঁরা।'

দ্বিতল হল শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির। ইহা এখন কার্পেট মণ্ডিত — সাহেবদের বসবার ঘর। ইহারই পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে শ্রীম ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ঠাকুরের পদপ্রান্তে। দক্ষিণে দেয়াল। দেয়ালে একটি বন্ধ দরজা, পশ্চিমে খড়খড়ির জানলা। শ্রীম বলিলেন, 'এইখানে তাঁর বিছানা ছিল।' অর্থাৎ পশ্চিমের খড়খড়ি জানলার ৩।৪ হাত পূর্বে। আর দক্ষিণের দেয়ালের দিকে ছিল ঠাকুরের শিয়র। দক্ষিণের দেয়াল হইতে চার পাঁচ হাত উত্তরে মেঝেতে ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসিয়া শ্রীম কিছুকাল ধ্যান করিলেন — যুক্তকর বীরাসনে আসীন। শ্রীযুক্ত জিনওয়ালা গৃহবাসী দুইএকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন — এঁরাও পার্শী, সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন। শ্রীম নিচে চলিয়া আসিতে চাহিলেন। সেবক বলিলেন, 'দক্ষিণের ঘরে অনুমতি নেওয়া হয়েছে।' 'চল না, চল' বলিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন — ইহা শয়নকক্ষ। বৃহৎ একটি আয়না উত্তরের দেয়ালের পার্শ্বে রহিয়াছে। ইহার সম্মুখে শ্রীম ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া, আয়নাতে

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দক্ষিণের উন্মুক্ত ছাদে চলিয়া গেলেন। ছাদ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। আর পশ্চিমের রেলিং-এ ভর করিয়া উদ্যানভূমি দর্শন করিতেছেন। গৃহবাসীদের ধন্যবাদ দিয়া সকলে নিচে নামিয়া আসিলেন। গাড়ীর ফুটবোর্ডে উঠিয়াছেন — পুনরায় নামিয়া আসিলেন। শ্রীম ও সেবক পশ্চিমের পুষ্করিণীর চত্বরে গেলেন। এইবার সকলে গাড়ীতে বসিয়াছেন।

বড় রাস্তা দিয়া গাড়ী কলিকাতা অভিমুখে চলিতে লাগিল। শ্রীম মধ্যস্থলে — ডানে শ্রীমতী, বামে শ্রীযুক্ত জিনওয়ালা — পশ্চাতের আসনে। জিনওয়ালা প্রশ্ন করিলেন, 'প্রতীচি প্রাচ্য দেশ থেকে কি শিক্ষা লাভ করতে পারে?' শ্রীম উত্তর করিলেন, 'এই মহাশিক্ষা — ঈশ্বর আছেন, মানুষ তাঁকে দর্শন করতে পারে, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে পারে। 'ওয়েস্ট' এই মহাশিক্ষা লাভ করতে পারে 'ইস্ট' থেকে।'

গাড়ী বাগবাজার স্টীমার ঘাটে আসিয়াছে। ডাক্তার ডি. মেলো নামিয়া গেলেন। ইনি বেলুড়মঠে যাইবেন। তারপর বাগবাজার রোড, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়া গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে আসিল। শ্রীম ও সেবক নামিয়া ঠাকুরবাড়িতে গেলেন। জিনওয়ালাদম্পতি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

৫

সন্ধ্যাকাল। শ্রীম নববিধান ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া আছেন — পশ্চিম দিকে, উত্তর দিক হইতে দ্বিতীয় দরজার সম্মুখে বেঞ্চিতে। আজ রবিবার। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় গৃহ উদ্ভাসিত। আচার্য বেদিতে বসিয়া প্রার্থনা শেষ করিলেন। এখন ভজন হইতেছে। শ্রীম-র পাশে, জগবন্ধু, ডাক্তার বক্সী, শান্তি ও মনোরঞ্জন রহিয়াছেন। শ্রীম পাশ ফিরিয়া আস্তে আস্তে জগবন্ধুকে বলিতেছেন, 'শাস্ত্রে আছে, সন্ধ্যা করবে দেবালয়ে কিংবা নদী তীরে — এখানে ঠাকুর এসেছিলেন, তাই করা যাচ্ছে।' একঘন্টা থাকিয়া সাড়ে সাতটায় চলিয়া আসিলেন।

এখন আটটা। শ্রীম 'মর্টনে'র চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন — চেয়ারে উত্তরাস্য। বেঞ্চিতে ভক্তগণ সম্মুখে পূর্ব ও পশ্চিমাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। গরম পড়িয়াছে। শ্রীম-র খুব কষ্ট বোধ হইতেছে। তার উপর আজ আবার দক্ষিণেশ্বর যাতায়াতের পরিশ্রম। কাশীপুর উদ্যানের কথা উঠিয়াছে। জগবন্ধু শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দোতলার হলঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেঝেতে ঠাকুর শুতেন — এ তো দেখালেন আজ। কিন্তু তাঁর শিয়র ছিল কোনদিকে?' তিনি উত্তর করিলেন, 'দক্ষিণের দেয়ালের গায়ে। ঠাকুরের বাম দিকে খড়খড়ির জানালা তিন হাত দূরে।' প্রশ্ন হইল, 'দক্ষিণ দিকের ঘরে ছিলেন না?' শ্রীম বলিলেন — 'না। তখন ঐ ঘরই ছিল না — খোলা ছাদ ছিল।' ডাক্তার বক্সী বলিলেন — 'খাটে কেন শুতেন না?' শ্রীম উত্তর দিলেন — 'মেঝেতে শোওয়া সুবিধে ছিল।' দুর্বল শরীর। মাদুরের উপর সতরঞ্জি, তার উপর বিছানা।' জগবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন — 'ছাদে কখনও বেড়াতেন?' শ্রীম বলিলেন — 'খুব কম।' জগবন্ধু প্রশ্ন করিলেন — 'নিচে হেঁটে কখনও বেড়িয়েছেন বাগানে?' শ্রীম উত্তর করিলেন — 'কখন কখন। ফারষ্ট জানুয়ারী বেড়িয়েছিলেন। মনে বড় সাধ ছিল তা হয়ে গেল। সাঁইত্রিশ বৎসর হয়ে গেল — এর ভিতর আর একবার যেন গেছি। (ভক্তদের প্রতি) আজ একটু 'কথামৃত' পাঠ হউক কাশীপুরের কথা।'

শান্তি পড়িতেছেন — চতুর্থ ভাগ, ত্রয়োত্রিংশ খণ্ড। ঠাকুরের আদেশে তাঁহার সম্মুখে মাস্টার ও নরেন্দ্র বিচার করিবেন। ঠাকুর বিছানায় শুইয়া আছেন। ঈশ্বর আছেন কিনা সে সম্বন্ধে কথা হইতেছে। নরেন্দ্র দার্শনিক বার্কলের মত সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, "বিচারে ঈশ্বর আছেন, এ কথা বলা যায় না। বিশ্বাসে ঈশ্বর মানতে হয়।" এই কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'ন্যাংটা বলতেন, মনেই জগৎ, আবার মনেই লয় হয়। কিন্তু যতক্ষণ 'আমি' আছে ততক্ষণ সেব্য সেবকই ভাল। (নরেন্দ্রের প্রতি) "আমার কিন্তু বেশ বোধ হয়, ভিতরে একটি আছে।"

শ্রীম — এই কথাটি বলবার জন্যই দু'জনকে বিচার করতে লাগিয়ে দিলেন। তিনি দেখছেন কিনা, মা রয়েছেন ভিতরে। এর উপর আর কথা চলে না। ও মতও ঠিক কিন্তু অধিকারী খুব কম। দেহ বুদ্ধি যেতে চায় না। তাই সেব্য সেবকভাবে থাকতে বললেন।

পাঠক পড়িতেছেন, নরেন্দ্র বলিলেন — উনি (ঠাকুর) আমায় বলেছিলেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আমি বললাম, হাজার হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক। আমার যতক্ষণ সত্য বলে বোধ না হয় ততক্ষণ বলবো না।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বড় আধার কিনা তাই। কমল ফুটতে দেরী হয় কিন্তু থাকে অনেকদিন। অন্য ফুল আজ ফুটছে কাল ঝরছে। দেখ, যে লোক এখন এই কথা বললেন, তিনিই আবার স্তবে কি বলেছেন — 'মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং' — অর্থাৎ তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করলেই লোক মৃত্যুঞ্জয় হয়। আবার বলছেন, 'নররূপধর নির্গুণ গুণময়'। অর্থাৎ যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত, যিনি ঈশ্বররূপে জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার করছেন, তিনিই এই নর শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই 'নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত' বলে প্রণাম করে তাঁর শরণ লইতেছেন — 'ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো'।

কলিকাতা, ৩০শে মার্চ, ১৯২৪।
রবিবার ১৬ই চৈত্র, ১৩৩০।

অষ্টম অধ্যায়

আমেরিকাবাসী ডক্টর হামেলসঙ্গে শ্রীম (১)

১

মর্টন স্কুল। অপরাহ্ন পাঁচটা। দ্বিতলের বৈঠকখানা। শ্রীম মধ্যস্থলে উপবিষ্ট — পূর্বাস্য। তাঁহার সম্মুখে দক্ষিণ-পশ্চিমাস্য হইয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন ডাক্তার ই. এম. হামেল (Dr. E.M. Hummel, M.D.) শ্রীম-র পশ্চাতে একজন সেবক দাঁড়াইয়া আছেন। এই ভদ্রলোক আমেরিকার ক্যালিফোরনিয়া প্রদেশস্থ লস্ এঞ্জেলস্ হইতে আসিয়াছেন। স্থূলকায়, বয়স পঞ্চাশ হইবে আর অবিবাহিত। সাধনভজন করেন। বাড়ির লোক বলে মাথা খারাপ। ইনি শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকালে সাড়ে এগারটার সময় আর একবার আসিয়াছিলেন অল্পক্ষণের জন্য। ইনি 'কথামৃতে'র প্রথম ভাগ ইংরেজীতে অসংখ্যবার পড়িয়াছেন। গ্রন্থখানি যেন কণ্ঠস্থ। বালকগণ যেমন 'বাল্যশিক্ষা'দি পুস্তক নানা বর্ণের পেন্সিলের রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া পড়ে, তাঁহার পুস্তকখানাও প্রায় ঐরূপ। কি মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছেন! এমন কি গানের দুর্বোধ্য শব্দগুলিও দাগ দিয়া রাখিয়াছেন — শ্রীমকে তার অর্থ জিজ্ঞাসা করিবেন। বিদেশে এমন ভক্ত বিরল — এমন শান্ত, চিন্তাশীল ও শ্রদ্ধাবান। প্রাথমিক মিষ্ট ভাষণাদির পর কথোপকথন হইতেছে।

ডাক্তার হামেল (শ্রীম-র প্রতি) — ভারত ভ্রমণে বা'র হবার সময়ই সঙ্কল্প করেছিলাম আপনাকে নিশ্চয় দর্শন করব। আমি আপনার পুস্তক পড়েছি। বহু আমেরিকাবাসী ঐ পুস্তক পাঠে বড়ই উপকৃত হয়েছে।

শ্রীম — এ খুব আনন্দের কথা। আচ্ছা, আপনি কি বেলুড় মঠে

গিয়েছেন?

ডাক্তার — আজ্ঞে হাঁ, বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম — দক্ষিণেশ্বরও গিয়েছি। একটি যুবক আমাকে সব পবিত্র স্থানগুলি দেখিয়েছেন। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে — অনুমতি হলে বলবো।

শ্রীম — হাঁ, বলুন।

ডাক্তার — ভগবান দর্শনের চিহ্ন কি?

শ্রীম — যাঁর ভগবান দর্শন হয় তাঁর স্বভাব হয়ে যায় পাঁচ বছরের বালকের ন্যায়। তিনি সর্বদা যোগে থাকেন। আবার কখনও হাসছেন, কখনও কাঁদছেন — কখনও যেন উন্মাদ।

ডাক্তার — আপনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের কথা বিশেষ কিছু লিখেন নাই কেন?

শ্রীম — এটা অত্যন্ত শোক ও দুঃখের কথা। লিখতে ইচ্ছা হয় না।

ডাক্তার — তাঁর সম্বন্ধে আপনার নিকট আর কত রেকর্ড আছে?

শ্রীম — বাংলায় চার ভাগ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' বা'র হয়েছে। এক ভাগের মাত্র ইংরেজী আমি করেছি। এসব ছাড়া আরোও সব রেকর্ড রয়েছে।

ডাক্তার — আপনি কি ওগুলি ইংরেজীতে প্রকাশ করতে চান না? অথবা, ওয়েস্টকে দিতে চান না?

শ্রীম — না, না, শারীরিক দুর্বলতার জন্য হয়ে উঠছে না। ভগবান শক্তি দিলে হবে।

ডাক্তার — স্বামী অভেদানন্দের বইখানা আপনার বই থেকে ভিন্ন।

শ্রীম — হাঁ, নিজের reminiscences (স্মৃতিকথা) যোগ করে উহা বার করেছেন।

ডাক্তার — জ্ঞানের কি কোন মাপকাঠি নাই?

শ্রীম — না, তিনি এই কথা বলতেন। তিনি বলতেন, অবস্থার

পরিবর্তন — এখন এক অবস্থা, আবার বদলে গেল! তাই মাপকাঠি নাই।

ডাক্তার — 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর' — এ তাঁর উপদেশ। একথা দিয়ে তিনি কি বোঝাতে চেষ্টা করতেন, এদের ভোগ ত্যাগ কর — কাম ও লোভ ত্যাগ কর ইহাই কি মনে করতেন? কিম্বা আর কিছু?

শ্রীম (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) — 'মেরীই আসল বস্তুটি (ঈশ্বর প্রেম) চিনে নিয়েছে। এটি কেউ কখনও কেড়ে নিতে পারবে না।'*

ডাক্তার — ক্রাইস্ট বলে যে আমাদের মত একজন জীবন্ত ছিলেন, এ সম্বন্ধে তাঁর মুখে কিছু শুনেছেন কি?

শ্রীম — হাঁ, বলেছিলেন, একদিন যদু মল্লিকের বাগানে ক্রাইস্ট তাঁর দেহে প্রবেশ করে মিশে গেলেন।

ডাক্তার — আপনি তখন সেখানে ছিলেন কি?

শ্রীম — না, তিনি পরে আমাদের বলেছিলেন।

ডাক্তার — তাঁর মুখ থেকে আপনি স্বকর্ণে শুনেছেন কি?

শ্রীম — হাঁ, তাঁর মুখ থেকে শুনেছি।

ডাক্তার — আপনি যখন একথা বলছেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে।

২

শ্রীম (ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনের পর) — তিনি ঈশ্বরের 'আল্লা' নাম তিন দিন মালায় সর্বদা জপ করেছিলেন। তখন মুসলমানদের ন্যায় পাঁচবার নামাজ করতেন দিনে।

তিনি বলেছিলেন, আমিই পূর্বে ক্রাইস্টরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। ভাগ্যিস্ তাঁকে দেখেছিলাম, তাই ক্রাইস্টের একটু আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। ক্রিশ্চিয়ানরা প্রায় তাঁকে বুঝতে পারেন নাই।

---

* But one thing is needful and Mary hath chosen that part, which shall not be taken away from her. — Bible. (St.Luke 10 : 42)

ডাক্তার — অনেকের কাছে এটা একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে। তারা বুঝে নাই তাঁকে। তারা যদি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শোনে, তাহলে ক্রাইস্টকে বুঝবে ভাল। আপনি ধন্য, তাঁর সঙ্গ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

শ্রীম — হাঁ, শাস্ত্রে আছে, পূর্বজন্মের বহু পুণ্যফলে মানুষ অবতারের দর্শন ও সঙ্গ করবার সৌভাগ্য লাভ করে থাকে।

ডাক্তার — যাঁরা তাঁর চরণে স্থান পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কতজন আত্মদর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন?

শ্রীম — এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেওয়া সুকঠিন।

ডাক্তার — আচ্ছা, আবেশ কি?

শ্রীম — ক্রাইস্ট সুমেরীয় রমণীকে বললেন, 'এই কূপ থেকে তুমি আমায় একটু জল পান করিয়ে বাঁচাও; আমি এর পরিবর্তে তোমায় এমন জল পান করাবো যাতে তুমি অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারবে — অমৃতত্ব লাভ হবে*। এই একটি দৃষ্টান্ত আবেশের — ভগবদ্ভাবে তন্ময় হয়ে যাওয়া। মুহূর্তের মধ্যে বদলে দেবমানুষ হয়ে যাওয়া।

ডাক্তার — তাঁর তিরোধানের কথা তিনি কি পূর্বেই আপনাদের বলেছিলেন?

শ্রীম — হাঁ, তিনি বলেছিলেন, আরোও কিছুকাল এ শরীরে বাস করবার আমার ইচ্ছা ছিল। তাহলে আরো কতক লোকের চৈতন্য হতো। কিন্তু থাকবার উপায় নাই। মা ডাকছেন যেতে হবে।

ডাক্তার — তাঁর অন্তর্ধানের সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি? তিনি কি সমাধিস্থ হয়ে শরীর ত্যাগ করেছিলেন?

শ্রীম — 'মা, মা, কালী' একথা বললেন, এর পরই সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে গেল। আটঘন্টা এ অবস্থায় শরীর রক্ষা করা হয়েছিল। কলকাতার ভক্তগণ দর্শনের জন্য আসতে লাগলেন। ঐ সঙ্গে নেপালের

---

* Compare St. John 4 : 14

রাজপ্রতিনিধি 'কাপ্তেন'ও এলেন। তাঁর এসব বিষয় জানা ছিল, বললেন, 'এবার দেহ নিয়ে যাও সৎকার কর'।

ডাক্তার — আপনার নিজের কি কোন ছবি আছে?

শ্রীম — হাঁ, (সেবকের প্রতি) — আমাদের গ্রুপটা আনতো। (গিরিশ, দেবেন, গোপাল, লাটু, শ্রীম প্রভৃতি এতে আছেন — ডাক্তারকে দেখাইয়া) সব চলে গেছেন আমিই একা পড়ে আছি।

ডাক্তার — আপনার একটি ছবি কি আমায় দয়া করে দেবেন?

শ্রীম (নিজপুত্র প্রভাসবাবুকে দেখাইয়া) — এর কাছে চেয়ে দেখতে পারেন — যদি থাকে। বছর পনর হয় আর একটি নেওয়া হয়েছিল। (স্বগতঃ) তাঁরা সব চলে গেছেন সেই দেশে, যেখান থেকে আর কেউ ফিরে না কখনও ঃ They have gone to that land 'from whose bourn no traveller returns!'

ডাক্তার — আপনি কি শেক্সপীয়র পড়েছেন?

শ্রীম (সুপণ্ডিত হয়েও বিনীতভাবে) — কিছু দেখা আছে।

ডাক্তার — বিবেকানন্দ প্রভৃতি অনেক যুবক ছিলেন — তাঁরা কেউ লিখে রাখেন নাই তাঁর কথা। আপনি কি করে রাখলেন?

শ্রীম (সবিনয়ে) — আমি রাখি নাই, তিনি রাখিয়েছেন। (ডাক্তারের প্রতি) নিরাপদে আমেরিকায় ফিরে গিয়ে আমাদের লিখবেন। আমরা খুব খুশি হব।

ডাক্তার — যাব কি, যাব না এরও নিশ্চয়তা নেই। আমার পিতা মাতাও নেই আর বিয়েও করি নাই। (তাই যাবার টান নাই)।

শ্রীম (আনন্দে) — বাঃ তা হলে তো দেখছি আপনি সন্ন্যাসী, পরমভক্ত! গাছের পরিচয় ফলে।

ডাক্তার (সবিনয়ে) — আমি এখনও সন্ন্যাসের অধিকারী হতে পারি নাই। সন্ন্যাসই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আজ্ঞে, আমি আর একটু প্রশ্ন করতে চাই — সমাধি কাকে বলে?

শ্রীম — সমাধিতে বাহ্যজ্ঞান লোপ হয় — ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তাই তখন কি অবস্থা হয় অন্তরে, কেউ বলতে পারে

না। একটা নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছলো — কিন্তু গলে নিজেই সমুদ্র হয়ে গেল। কাজেই তখন খবর দেয় কে? রূপ-রসময় বাহ্যজগৎ থেকে মন তখন সম্পূর্ণরূপে উঠে যায়। যাঁর সেই অবস্থা হয় তিনিই কেবল বুঝতে পারেন কি হয় — ঠিক ঠিক সে কথা অপরকে বোঝান সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় ও তাদের জ্ঞানের বাইরে সে অবস্থা — বাক্যমনাতীত অবস্থা। একজন সমুদ্র দেখেছে, যে দেখে নাই এমন আর একজনকে সে বোঝাতে চেষ্টা করছে। এ বর্ণনা যেমন অসম্পূর্ণ আভাস মাত্র, সেও তেমনি। সমাধির বর্ণনা ঠিক ঠিক হতে পারে না। মুখে বলা যায় না যে সমাধির পর একটা একটানা আনন্দ — অফুরন্ত আনন্দ ভিতরে থেকে যায় — আর শান্তি। 'আমি অমৃত আনন্দ স্বরূপ', এ জ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয় না। এই মরজগতে সমাধিবান পুরুষই কেবল জীবন্ত জাগ্রত হয়ে বিরাজ করেন। তিনি জগতে বাস করেন বটে, কিন্তু জগৎমুক্ত, জীবন্মুক্ত।

(ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) নানান অবস্থা আছে জ্ঞানের। এক অবস্থায় ঠাকুর বলতেন, গাছপালা, ফুলফল, মালী — সমস্ত বাগানটাই যেন মোম দিয়ে তৈরী — সব সচ্চিদানন্দময়। একে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে।

ডাক্তার হামেল বিদায় লইলেন। বলিয়া গেলেন আগামীকাল পুনরায় আসিবেন।

৩

আজ কলিকাতায় প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছে, যেন অগ্নিবর্ষণ হইতেছে। আজ রেকর্ড গরম ১১১ ডিগ্রি। এখানে এরূপ গরম অতি বিরল। গরমে শ্রীম-র খুব কষ্ট হয় — বৃদ্ধ শরীর। কিন্তু ব্যাকুল ভক্ত সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথায় দেহজ্ঞান যেন ভুল হয়ে গিছলো এতক্ষণ। এখন অপরাহ্ন সাড়ে ছয়টা। শ্রীম ছাদে বেড়াইতেছেন, সঙ্গে সেবক। কথা হইতেছে।

শ্রীম (সেবকের প্রতি) — এই সব লোক সত্যসত্যই ব্যাকুল।

দেখ, কোথা থেকে এসেছেন — কত সাগর পার হয়ে! ঠাকুর বলেছিলেন, 'আন্তরিক হলে এখানে আসতে হবে।' ওরা (প্রতীচীবাসী) কি বুঝবে এদেশের কথা! ক্রাইস্টকে বুঝতে হলে ঠাকুরকে বোঝ আগে। আজ এই সাহেবও এই কথা বললেন, ওরা কিছু বোঝে নাই।

ঠাকুরের কি মহিমাই প্রচার হচ্ছে। খ্রীশ্চিয়ান, মুসলমান, পার্শী, ইহুদী, হিন্দু সব জাতই নিচ্ছে। এখন কষ্ট হচ্ছে কিছু খাইয়ে দিলাম না। এমন লোকের কত যত্ন করতে হয়। তবে বইটা (Gospel Part-I) দেওয়া হয়েছে। কাল করা যাবে যত্ন। ফটো চাইছেন। ও দিয়ে কি হবে — শরীর যখন থাকবে না! ঠাকুর দিয়েছিলেন সে ভিন্ন কথা। লোকের উপকার হবে বলে। ঐ সমাধি অবস্থা দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে। ওদেশে নিয়ম আছে যাদের ভালবাসে তাদের ফটো নেয়। কাল সাড়ে পাঁচটায় আসবেন — ঠাকুরের যে ছবি সুন্দর করে করিয়েছেন তাও নিয়ে আসবেন, বললেন।

সদানন্দ আসিয়া প্রণাম করিল। সদানন্দ ও লক্ষ্মণ উৎকলবাসী যুবক। এখানে কর্ম করে। ভক্ত লোক। লক্ষ্মণ অদ্বৈত আশ্রমে কর্ম করে। সম্প্রতি শঙ্কর ঘোষের লেনে ঐ আশ্রমের ব্রাঞ্চ খোলা হয়েছে।

শ্রীম (সদানন্দের প্রতি) — ওকে (লক্ষ্মণকে) বলো — এসব জায়গায় পয়সা ছাড়াও লোক থাকতে চায়। তবে বাপ মাকে বাড়িতে দিতে হয় তাই কিছু নেওয়া। এমন স্থানে সে থাকতে চাইছে না।

সদানন্দ — সে বলে, মাস্টার মশায়ের ওখানে যাব, তার সময় পাই না।

শ্রীম — মাস্টার মশায়ের এখানে এলে তিনিও তাই বলবেন — সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা কর। (খানিক চুপ থাকিয়া, জগবন্ধুর প্রতি) সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা ছাড়া আর গতি নেই। কিন্তু মহামায়ার কি কাণ্ড, উল্টো বুঝিয়ে দেন। সাধুনিন্দা পেলে একেবারে 'সেনটার' (কেন্দ্র) করে জমে লোক। এমন মজা! অমুক মহারাজ মঠের দু'জন সাধুর নিন্দা করেছিল। অমুক বাবুকে ডেকে এনে আমি সরিয়ে দিলাম — ছাদে যাও বলে। আমাকে বল সে এক কথা। ওদের এসব কথা বললে,

ওরা দাঁড়ায় কোথা? 'গ্রেট ম্যানদের' (মহাপুরুষদের) নিন্দা করলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে শোনে লোক। দোষে গুণে মানুষ। শরীর ধারণ করলে এসব আছেই।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীম ছাদে বসিয়া আছেন। 'কথামৃত' ইংরেজীতে পড়া হইতেছে প্রথম ভাগ। ছোট অমূল্য, শচী, বড় জিতেন, শান্তি, জগবন্ধু, প্রভৃতি রহিয়াছেন। ঠাকুর কাশীপুর উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন। সেবক পড়িতেছেন। শ্রীম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া শুনিতেছেন। কারও মুখে কোন কথা নাই। গরমের পর একটু শীতল হাওয়া চলিতেছে। উপরে কৃষ্ণবর্ণের আকাশ — চারিদিকে শহরের আলোকমালা। হ্যারিকেনের আলোতে পড়া হইতেছে। শুধু পাঠকের স্বর — আর ঠাকুরের দিব্য লীলা কথা শোনা যাইতেছে। আর সব চুপ যেন ধ্যানস্থ। পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে। শ্রীম-র যেন হুঁস নাই — অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। ভক্তগণও কেহ এই শান্ত সমাহিত ভাব ভঙ্গ করিতে সাহস করিতেছেন না। দীর্ঘকাল পরে মুদ্রিত চক্ষু শ্রীম অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন — 'I see — I realise — that all things, every conceivable thing, comes out of this (চক্ষু মেলিয়া) অর্থাৎ আমিই এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কারণ — ইদানীং নরদেহে এসেছি।' এত করে বলছেন, তবুও কি বিশ্বাস হয় লোকের। এমনি তাঁর মায়া। এই ক'টি কথা ধরে থাকলে সারাজীবন কেটে যায়, সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, মানুষ দেবতা হয়।

কলিকাতা। ৩১শে মার্চ, ১৯২৪ খৃঃ।
১৭ই চৈত্র, ১৩৩০ সাল। সোমবার।

নবম অধ্যায়

আমেরিকাবাসী ডক্টর হামেলসঙ্গে শ্রীম (২)

১

অপরাহ্ন পাঁচটা। আজও আমেরিকাবাসী ডাক্তার ই.এম. হামেল, এম.ডি. আসিয়াছেন। গতকালও আসিয়াছিলেন। শ্রীম তাঁহাকে লইয়া দোতলার বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন চেয়ারে — শ্রীম পূর্বাস্য, অতিথি দক্ষিণাস্য। মনি, ছোট অমূল্য , জগবন্ধুও রহিয়াছেন। প্রভাসবাবু এবং তাঁর ছেলেরাও কখনও আসা যাওয়া করিতেছেন। ডাক্তার হামেল পকেট হইতে একটি নূতন ঘড়ি বাহির করিলেন, নাম 'ইয়াংকি রেডিও লাইট'। ইহা আমেরিকা হইতে আনিয়াছেন। তারপর ঠাকুরের দুইটি ছবি একটি প্যাকেট হইতে বাহির করিলেন। এই ছবি দুইটি ইনি নিজের ইচ্ছামত তৈরী করিয়েছেন। বেশ সুন্দর রং দিয়েছেন — বেশ দেখায়। ঘড়ি ও ছবি দুই হাতে লইয়া সবিনয়ে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমকে উপহার দিলেন। বললেন, কৃপা করে গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন। ছবি আমার কাছে আরোও আছে। আর এটিও নিন্ (আমেরিকায় ছাপা 'গসপেল')।

শ্রীম — বহু ধন্যবাদ! এ বই আমার কাছে কয়েকখানাই রয়েছে। স্যানফ্রানসিসকো আশ্রম থেকে আমায় পঞ্চাশ কপি পাঠিয়ে দিছলো, তাই আছে। বইখানা আপনি নিয়ে যান।

ডাক্তার — এই ফটো দেখে, আমরা ডাক্তারগণ বলতে পারি যে পূর্ব থেকেই ঠাকুরের ক্যানসার হওয়ার ভয় ছিল। চক্ষুর দৃষ্টি পূর্ব থেকেই আক্রমণ হয়েছে। তাই ছবিতে এরূপ দেখাচ্ছে।

শ্রীম — বটে!

ডাক্তার — ঠাকুরের গল্পগুলির মধ্যে আমার প্রিয় কোন্‌টি জানেন?

রং-কারের গল্পটি। একজন গেল, তার কাপড়টা হলদে রং-এ রঙ্গিয়ে দিল। আর একজনকে লাল, আর একজনকে কালো রঙে রঙ্গিয়ে দিলো। না রঙ্গিয়ে কেউ ফিরছে না। এটি খুব ভাল লাগে।

শ্রীম — তা বেশ! এ গল্পটি দিয়ে পরব্রহ্মের সাকার সগুণ অবস্থার কথা বোঝান হয়েছে। ঈশ্বর নিরাকার নির্গুণ, আবার সাকার সগুণ। তাঁর সাকার সগুণ অবস্থাতেই নানা নামরূপ ধারণ করেন — অবতারাদিও এরই ভিতর। যে যেকোনও ধর্মই পালন করুক না কেন, এখানে তার স্থান আছে। খ্রীশ্চিয়ান হউন তবুও স্থান আছে, মুসলমান হউন তা হলেও স্থান আছে — সকল ধর্মের স্থান রয়েছে তাঁর কাছে। এই গল্পের এই তাৎপর্য। এখানে কোন গণ্ডী নাই — মতবাদের অবসর নাই। বর্জন নাই, সব গ্রহণ।

স্যানফ্রান্‌সিস্‌কো হইতে ছাপা ইংরেজী 'কথামৃতে'র প্রথম ভাগ খুলিয়া শ্রীম ডাক্তারকে একটি গ্রুপ ফটো দেখাইলেন। ইহাতে বারজন ভক্ত রহিয়াছেন। শ্রীম একে একে তাঁদের নাম বলিলেন। এইবার ডাক্তার ঠাকুরের ফটো সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

ডাক্তার — ঠাকুরের ক'খানা আসল ফটো আছে?

শ্রীম — তিনখানা। এখন পর্যন্ত তাঁর তিনটি বিভিন্ন রকমের ছবি আমরা পেয়েছি। (একখানা দেখাইয়া) এখানা কেশব সেনের বাড়িতে নেওয়া হয়েছিল — সেবক হৃদয় তাঁকে ধরে আছেন। এখানা দাঁড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল — ১৮৭০-৭৫ মধ্যে নেওয়া হয়। তাঁর মন তখন অতীন্দ্রিয় অতি উচ্চ অবস্থায় আরূঢ়। (আর একখানা দেখাইয়া) আর এখানাও দাঁড়ান। ঠাকুর একখানা হাত একটা স্তম্ভের উপর রক্ষা করেছেন। এখানাও অতি উচ্চ অবস্থার দ্যোতক। এখানা নেওয়া হয় রাধাবাজারে স্টুডিওতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। এই পাশেই ঝামাপুকুরে শ্রীযুক্ত আর. মিত্রের বাড়িতে ঠাকুর সেদিন এসেছিলেন। (আর একখানা দেখাইয়া) এখানা সকল মঠে পূজিত হয়। এই ছবিখানা দেখাইয়া ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, 'এরপর এখানা ঘরে ঘরে পূজিত হবে।' এইখানাতে মন একেবারে পরব্রহ্মে বিলীন।

বাহ্যজগতের জ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত। মন পরমাত্মাতে সচ্চিদানন্দ সাগরে মিশে এক হয়ে গেছে। একাকার — সমাধিস্থ। এটি ১৮৮২-১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নেওয়া হয়। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে শিবমন্দিরের সিঁড়িতে ঠাকুর বসা ছিলেন। একজন ভক্ত ভবনাথ ফটোগ্রাফারকে আনিয়ে ঐটি নেয়।

ডাক্তার — 'ওয়েস্টে যদি কেউ ভগবানকে ডাকে, সব লোক বলে তার মাথা খারাপ। আত্মীয়বন্ধু মারা গেলে, তারা শোকচিহ্ন ধারণ করে এক সপ্তাহ ধরে। কেউ যদি শোকচিহ্ন ধারণ না করে তাকে বলে মাথা খারাপ। তারা সব কামিনীকাঞ্চন নিয়ে ভুলে আছে।

শ্রীম — খৃষ্টধর্ম ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছে। এদেশের প্রধান কথা ঈশ্বর ওদেশে 'ম্যাটার' — জগৎ। এইজন্য এদেশকে বলে ঈশ্বরবাদী আর ওদেশকে বলে জড়বাদী।

২

গতকাল ডাক্তারকে জলযোগ করান হয় নাই বলিয়া শ্রীম দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজ পূর্ব হইতে তার আয়োজন হইয়া গিয়াছে। এবার তাঁকে খাওয়াচ্ছেন — এদেশের সব খাদ্যদ্রব্য দিয়ে। হাই-বেঞ্চির উপর থালা রাখিয়া ডাক্তার হিন্দুদের মত হাতে খাইতেছেন। বাড়িতে মেয়েরা সব করেছেন — লুচি, পটল ভাজা, দুধ ও কিশমিশের চাটনি, ছানার পায়েস। বাংলার বিখ্যাত মিষ্টি — সন্দেশ-রসগোল্লাও দেওয়া হয়েছে। প্রভাসবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীম ডাক্তারকে খাওয়ার উপদেশ দিয়ে সাহায্য করিতেছেন — এটা আগে খান ওটা পরে — এইরূপে। তিনি নিজ হাতে আরো দুটি পটল ভাজা থালায় ঢালিয়া দিলেন। খানিকটা চাটনিও দিলেন। তারপর কমলালেবু। বরফ দেওয়া জল ডাক্তার পান করিতেছেন মাঝে মাঝে। সর্বশেষে ডাবের জল পান করিবার সময় — পকেট থেকে একটি কাঁচের নল নারকেলের ভিতর দিয়ে পান করিতে লাগিলেন। ডাবের জল পান করিতে করিতে বলছেন, 'এর কথা বহু শুনেছিলাম। তাই ভারতে

এসেই সর্বদা ডাবের জলই এই নলটা দিয়ে খাই। অন্য জল খাই না। ইহা বড়ই স্বাস্থ্যকর স্নিগ্ধ ও সুমধুর।

আহার শেষ হইয়াছে। ডাক্তার বসিয়া আছেন। ঘরের ভিতর একটু অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। তবুও শ্রীম প্রথম ভাগ 'গসপেল' খুলিয়া শেষ অধ্যায়টি পড়িয়া শুনাইতেছেন। ঠাকুর কাশীপুর উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন।

শ্রীম (পড়িতেছেন, ঠাকুর বলিতেছেন) — তাঁদের মধ্যে (বিভিন্ন অবতারদের) এই রূপটিও দেখিতেছি। ভগবান এ শরীরেও অবতীর্ণ হয়েছেন।

'এই রূপটি' মানে তাঁর নিজের শরীর। তিনি যে অবতার, এ বিষয়ে এটি একেবারে স্পষ্ট উক্তি। এতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

আরো কতকগুলি লোকের চৈতন্যের জন্য জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করবার তাঁর বড়ই সাধ ছিল। কিন্তু জগদম্বার ইচ্ছা ফিরে যান। ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান মোক্ষ — পাছে করুণায় যাকে তাকে এ দিয়ে দেন ঠাকুর, তাই তাঁকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন। দেখুন ঠাকুর নিজেই বলছেন, 'এ শরীরটা আর কিছু দিন এখানে থাকলে, আরোও গোটা কতক লোকের চৈতন্য হতো।'

একটি যুবক ভক্ত লাটু — বিষণ্ণ হয়ে ঠাকুরের শয্যা পার্শ্বে বসে আছে। ঠাকুর তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'এ কি, বিষণ্ণ কেন? ছুঁড়ে ফেলে দাও শোক — আনন্দ কর।' বাইবেলেও তা আছে। বর যখন আসে বাড়ির সকলে তখন আনন্দ করে। 'বরযাত্রীরা কি শোক কখনও করতে পারে, যতক্ষণ বরের সঙ্গে রয়েছে?'

ঠাকুর বলছেন, 'এ শরীরের ভিতর দু'টি আছে। একটি জগদম্বা অপরটি তাঁর ভক্ত। দ্বিতীয়টির, ভক্তের অসুখ হয়েছে'। এই কথা দিয়েও ইঙ্গিত করছেন, ভগবান এই নরদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীম (খানিক চুপ থাকিয়া) — ঠাকুর এইবার বলছেন, জ্ঞান ও ভক্তি — এর যে কোনটা দিয়ে তাঁর দর্শন হয়। কারণ তিনি আরোও বলছেন — শুদ্ধ জ্ঞান, আর শুদ্ধা ভক্তি এক। নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম।

দর্শনের পরও কারো কারো তাঁর সাকার সগুণ রূপে ভক্তি থাকে — ঠাকুর একথা বলছেন।

(ডাক্তারের প্রতি) — এই শুনুন, ঠাকুর বলছেন, 'আমি দেখছি, স্পষ্ট বুঝতে পারছি এই সমস্ত জগৎ, যা কিছু দেখা যাচ্ছে, এর প্রত্যেকটি বস্তু — এর (নিজের শরীর দেখাইয়া) থেকে এসেছে'। ঠাকুরের শরীরে যে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন — এর আর একটি সংশয়হীন উক্তি, সুস্পষ্ট ঘোষণা — তাঁর নিজের মুখের এই মহাবাক্য।

৩

পাঠ শেষ করিয়া শ্রীম ক্ষণকাল কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আম বাগানে দুইবন্ধুর গল্পটি আপনি জানেন? একজন ঢুকেই সরাসরি আম খেতে আরম্ভ করলে। আর একজন কতগুলি গাছ, কত রকমের গাছ, কত ডাল, কত লক্ষ পাতা এ সব গুণতে আরম্ভ করলে। সময় যখন হলো বেরোবার, মালি দুজনকেই বার করে দিল। একজন মহা খুশি, আর একজন মহা দুঃখী, যে খেতে পারে নাই আম।

এ গল্পটির অর্থ এই, হে জীব অন্য সব কাজ ছেড়ে লক্ষ্যের দিকে চল — কিসে তাঁর দর্শন হয় আগে। মৃত্যু কখন আসবে কেউ জানে না — এক মুহূর্তে যে সব ফুরিয়ে যাবে। ঘন্টা বাজামাত্র বাগান থেকে বের হতে হবে — এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা চলবে না। এই মহা যাত্রার পূর্বেই আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকা উচিত। 'আম খাওয়া মানে — নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা দ্বারা যাতে তাঁর জ্ঞান ভক্তি লাভ হয় — সেই চেষ্টা।'

ডাক্তার — এ গল্পটি খুবই সুন্দর।

শ্রীম — ঠাকুর ভক্তদের বলেছিলেন, 'তোমাদের বেশী কিছু করতে হবে না। আমি কে আর তোমরা কে, এ কথা জানতে পারলেই হবে।' অর্থাৎ 'আমি ভগবান নররূপে অবতীর্ণ আর তোমরা

আমার সন্তান।' এই জানলেই যথেষ্ট। এতক্ষণ যে পড়া হল 'গসপেল' এর সার এই। যে তাঁর এই মহাবাক্য বিশ্বাস করবে, সে নিশ্চয়ই বেঁচে যাবে।

ডাক্তার — আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর একটি বিশেষ প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। 'গসপেলে' দেখতে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোক যেন পুরুষের চাইতে অন্যরূপ — ধর্মাচরণে, এর মানে কি? ধর্ম জগতে তাদের স্থান কোথায়?

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, স্ত্রীলোকদের ভিতর দুটি ভাগ আছে — বিদ্যাশক্তি আর অবিদ্যাশক্তি। বিদ্যাশক্তি ভগবান লাভের সহায় হয় — অবিদ্যাশক্তি দূরে নিয়ে যায় বিষয় ভোগে আবদ্ধ করে। বিদ্যাশক্তি স্ত্রী অতি বিরল — গুনে বলা যায় ক'জন। ঠাকুর বলেছিলেন, স্ত্রীলোক ভক্তিতে গড়াগড়ি দিলেও, পুরুষ সাধক তাদের সঙ্গে মিশবে না। স্ত্রীলোক পুরুষ ছাড়া থাকতে পারে না, তাই কি তাদের অবলা বলে?

ডাক্তার — 'ওয়েস্টে' স্ত্রীপুরুষে কোন ভেদ নাই — উভয়ের অধিকার সমান। বহু স্ত্রীলোক আমায় জিজ্ঞেস করেছেন — ঈশ্বর লাভে কি আমাদের কোনই অধিকার নেই?

শ্রীম — নিশ্চয়ই আছে — বিদ্যাশক্তি হলে। তাঁকে ভালবাসুক তাঁর দর্শন হবে।

৪

ডাক্তার — আপনাকে একটি গান দেখাচ্ছি। জিজ্ঞাস্য আছে।

ডাক্তার 'হামেল' 'গসপেল' খুলিয়া 'কেশব সেন সঙ্গে নৌকা বিহার।' অধ্যায় বাহির করিলেন। একটি গান পড়িয়া শুনাইতেছেন। 'আয় মন বেড়াতে যাবি, কালী কল্পতরু মূলে।' তার তৃতীয় চরণে আছে, 'শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি।'

ডাক্তার (শ্রীম-র প্রতি) — ঈশ্বর দর্শনের পর শুচি অশুচি বোধ লুপ্ত হয় — এই কি তার অর্থ?

শ্রীম — হাঁ। এক অবস্থায় এরূপ হয়। তখন মনে হয় সব ব্রহ্মময়। তাই শুচি অশুচির প্রশ্ন তখন থাকে না।

ডাক্তার — আপনি তাঁকে এ অবস্থায় দেখেছেন কখনও?

শ্রীম — হাঁ, কখনও তাঁর এসব ভেদ দূর হয়ে যেতো।

ডাক্তার — ঠাকুর বলছেন, নির্জনে গোপনে গিয়ে তাঁকে কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে হয়। কিন্তু কি করে এ হয় — যাকে কাজকর্ম করে খেতে হয়?

শ্রীম — না, সর্বদার জন্য এ ব্যবস্থা সকলের জন্য নয়। কখনও কখনও যেতে হয় — এই কথাই সকলের জন্য বলেছেন।

ডাক্তার — 'ওয়েস্টে'এ মানুষ কাজ করে ধন উপার্জন করতে ভালবাসে। এদের ঈশ্বর দর্শনের উপায় কি?

শ্রীম — উপায় আছে নিশ্চয়। তাঁরা যদি ঈশ্বরের জন্য সব করেন নিষ্কামভাবে, তা হলে হয়। প্রকৃতিতে কাজ আছে — না করে পারছি না, তাই করছি। নিজের দেহসুখের, নিজের ভোগের জন্য করলে হবে না।

ডাক্তার (আক্ষেপ করে) — দেখছি, শিক্ষাই মনকে রঙ্গিয়ে দেয় অন্যরূপ। ঠাকুরের এই সব অর্থকরী বিদ্যা ছিল না। আমি ভুলতে পারলে বাঁচি — যা শিখেছি।

শ্রীম — 'এই কি সূত্রধর জোসেফের পুত্র। সে তো কখনও লেখা-পড়া শেখে নি। কিন্তু কি আশ্চর্য — এরূপ জ্ঞানের কথা তো কেউ কখনও বলেনি।' ভগবান দর্শন হলে, জ্ঞানের অভাব হয় না। মা রাশ ঠেলে দেন — ঠাকুর বলতেন।

ডাক্তার — চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়বার সময় খানিকটা মনোবিজ্ঞানও পড়তে হয়েছিল। এরপর যখন ঠাকুরের উপদেশ পড়লাম — শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক — তখন একেবারে অবাক হয়ে গেলাম কি উচ্চ মনোবিজ্ঞানের কথা, এই ভেবে। গ্রীক দর্শনে — প্লুটার্চ ও অপর কারো কারো কথার সঙ্গে এর মিল দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীম — হাঁ, কিন্তু ঠাকুর এ কথা চিন্তা করে বলেন নি যেমন

পণ্ডিতরা করে থাকেন। এ তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন। মা তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন দপ্ করে। জ্ঞানপথে গিয়ে যেখানে পৌঁছেছিলেন — ভক্তিপথ দিয়েও সেখানে গিয়ে পৌঁছুলেন। তারপর এ মহাবাক্য বলেছিলেন। এটি একটি শাশ্বত সত্য — তাঁর নিকট প্রতিভাত হলো — এ গভীর চিন্তার ফল নয়।

ঠাকুর বলেছিলেন, ‘মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, প্রেম সমাধি — এ সব আমার ঐশ্বর্য।’

ডাক্তার হামেল বিদায় লইতেছেন। শ্রীম স্নেহ করে তাঁর সঙ্গে নিচে নামিলেন। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। মেছুয়া বাজারে প্রবেশ করিয়া ‘নববিধান’ মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ডাক্তারকে বলিলেন, ‘এই দেখুন, কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজ। ঠাকুর এখানে এসেছিলেন।’ এর ভিতর কি সকলেরই প্রবেশ অধিকার আছে? ডাক্তারের এই প্রশ্নে শ্রীম বলিলেন, ‘হাঁ’। ডাক্তার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। যাইবার সময় সেবকের নিকট নিজের ঠিকানা রাখিয়া গেলেন — আর শ্রীম-র ঠিকানা লইয়া গেলেন। শ্রীম করুণ হৃদয়ে গমনশীল ভক্তের দিকে চাহিয়া রহিলেন — মুখে ‘দুর্গা — দুর্গা — শ্রীদুর্গা।’

৫

মর্টন স্কুল — চারতলার ছাদ। কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি প্রায় ৯টা। উজ্জ্বল কৃষ্ণাকাশে অগণিত তারকা মণির মত জ্বল জ্বল করিতেছে। তাহারই আভায় ছাদ ঈষৎ আলোকিত। নিম্নে কলিকাতা মহানগরীর অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলোকমালা। তাহার আভাও প্রতিফলিত। শ্রীম ছাদে উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ পদক্ষেপে বেড়াইতেছেন। আমেরিকার ডাক্তার ই.এম. হামেল কিছুক্ষণ হয় বিদায় লইয়াছেন। ভক্তগণ কেহ শ্রীম-র সঙ্গে, কেহ বা দক্ষিণ দিকের ছাদে বসিয়া আছেন। আলোকের ক্ষীণ

আভায় শ্রীম-র মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইতেছে, তিনি যেন অবাক হইয়া কি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছেন! কিছুকাল পর চলিতে চলিতে নিজে নিজে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (স্বগত সবিস্ময়ে) — Where does this Kartagiri come from (কর্তাগিরিটা আসছে কোত্থেকে) ? মাছ যেমন জল ছাড়া থাকতে পারে না — তুলে রাখ ছটফট করবে — আমরাও তেমনি হাওয়া ছাড়া থাকতে পারি না। এতে কর্তাগিরি কোথায়? এই তো ডান (Mr. Dunn) সাহেবের হয়ে গেল।

শিশু মা'র দুধ খেয়ে তবে বাঁচে। আমরাও তো তাই খাচ্ছি। Big Mother-এর (জগদম্বার) দুধ খাচ্ছি সর্বদা। হাওয়া, জল, খাদ্য — সবই দুধ। শীতের সময় তিনিই তুলো, পশম রূপে শরীরে থেকে রক্ষা করছেন। সেও দুধই খাচ্ছি।

ছাদে উত্তর দিকে বসিয়া পড়িলেন। ভাবোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেন।

গান। মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানিগো ও দীন দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুখহরা॥
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা,
আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে, সাকার আকার নিরাকারা॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,
অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোহরা॥

(কথামৃত ৫/৫/৪)

গান। অন্তরে জাগিছ গো মা, অন্তরযামিনী,
কোলে করে আছ মোরে দিবস রজনী॥
অধম সুতের প্রতি কেন এত স্নেহপ্রীতি,
প্রেমে আহা একেবারে যেন পাগলিনী॥
কখনো আদর করি, কখনো সবলে ধরি,
পিয়াও অমৃত, শুনাও মধুর বাণী;
নিরবধি অবিচারে কত ভালবাস মোরে,
উদ্ধারিছ বারে বারে পরিতোদ্ধারিণি॥

বুঝেছি এবার সার, মা আমার আমি মার,
চলিব সুপথে সদা শুনি তব বাণী;
করি মাতৃস্তন্য পান, হব বীর বলবান,
আনন্দে গাহিব গান জয় ব্রহ্মাসনাতনী।।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কথা বলিতেছেন।

শ্রীম — যেমন পুতুলনাচ। তারটা (wire) — পড়ে গেল, অমনি হয়ে গেল।

শ্রীম আবার গাহিতেছেন,

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি॥
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালি।
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, আমরা তোমার তন্ত্রে চলি,
তুমি যেমন রাখো তেমনি থাকি মা, যেমন বলাও তেমনি বলি।।
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে, মা, গালাগালি।
এবার সর্বনাশী ধরে অসি ধর্মাধর্ম দু'টো খেলি॥

(কথামৃত ২/২০/২)

শ্রীম — তাই ঋষিরা খুঁজতে গিয়ে তাঁকেই দেখলেন — 'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্' (শ্বেতা১/৩)। তাই ঠাকুর বলতেন, 'আমি আর কি বিচার করবো, সবই দেখছি মা-ই হয়ে রয়েছেন।'

যেমন পাখা টানছে ছিদ্র দিয়ে। ওদিকে লোকটা বসে টানছে। দেখা যাচ্ছে না বলে বলছে লোক নেই। তেমনি ওরা বলে creation automatic (আপনি সৃষ্টি হয়েছে জগৎ); Predisposition (ঈশ্বরচ্ছোয় যে হয়েছে তা) দেখতে পারে নি। তাই God (ঈশ্বর) নেই — এই কথা বলে।

এতক্ষণে শ্রীম আসিয়া দক্ষিণদিকে নিত্যকার স্থানে বসিয়াছেন — চেয়ারে, উত্তরাস্য।

৬

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বারুণীর* জল কেউ আনেন কি? আজ একটা anniversary (উৎসব) হয়েছিল কাশীপুর গার্ডেনে। ঠাকুর বারুণীর জল আনিয়ে সকলকে নিতে বলেছিলেন। আজ আমরা দেখেছি বড় রাস্তায় কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে জল নিয়ে যাচ্ছে। কপালে আবার ফোঁটা। এক কাপড় পরা — ভিজা। এত রৌদ্র যে তাও শুকিয়ে গেছে।

এর ভিতর তিনটা শরীর আছে — স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ। কারণ শরীরকে ঠাকুর বলতেন, ভাগবতী তনু। স্থূলের জন্য এইসব খাওয়া— খাদ্য; মনবুদ্ধি সূক্ষ্মশরীর, তারও আহারের দরকার। আবার কারণ শরীর — এর খাদ্য ঈশ্বর লাভের চেষ্টা।

ঐ শরীর আহার চাচ্ছে। তাই যাচ্ছিল আহারের অন্বেষণে।

শ্রীম চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — যে যেমন, তেমন association (সঙ্গী) খোঁজে। ঠাকুরের — কয়জন ভক্ত বসে জপ করবেন — সাধ হয়েছিল।

লাটু বেলায় ঘুম থেকে উঠতো দেখে একদিন খুব তিরস্কার করলেন। বললেন, শরীর খারাপ থাকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে একটু নাম করে আবার শুয়ে থাক।

তাঁর কাছে বেতালা লোক থাকতে পারতো না। ওখানে থাকলে সর্বদা ঈশ্বরীয় কিছু করতে হতো — জপ, ধ্যান, এসব।

ধর্মপদবাবু (শ্রীম-র প্রতি) — ঐ চিন্তা (কারণ শরীরের খাদ্য — ঈশ্বর চিন্তা) না করে পারে কি? ও চিন্তা করা তো উচিত।

শ্রীম — পারা, না-পারা, উচিত অনুচিতের question (প্রশ্ন) এখানে আসে কই? তিনি করাচ্ছেন। একি লোক চিন্তা করে করছে? তিনি করাচ্ছেন, না করে উপায় নেই। প্রকৃতি এমন — No question

---

*বারুণী — চৈত্রমাসে কৃষ্ণা চতুর্দশীতে স্নান-উৎসব।

of 'উচিত' — 'উচিতে'র কথাই আসছে না।

ধর্মপদ চট্টোপাধ্যায় মর্টনের শিক্ষক।

শ্রীম গান গাহিতেছেন —

গান। কবে তব দরশনে হে প্রেমময় হরি।
উথলিবে হৃদিমাঝে চিদানন্দ লহরী।।
(সেদিন আমার কবে হবে)
তনু হবে রোমাঞ্চিত, প্রাণমন পুলকিত,
দুনয়নে বহিবে বারি (রূপমাধুরী হেরি)
তোমার প্রেমমূরতি নিরমল মুখজ্যোতিঃ,
নিরখিব প্রাণভরি (ভাবে মগ্ন হয়ে)
সব সাধ মিটাইব স্পর্শ আলিঙ্গন করি॥

গান। সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে — মোহিলে প্রাণ।
সপ্তলোক ভুলে শোক তোমারে পাইয়ে,
কোথা আমি অতি দীনহীন।

শ্রীম — বিবেকানন্দ গেয়েছিলেন — কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের ঐ কথা শুনে — 'আমার কিন্তু বেশ বোধ হয়, ভিতরে একটি আছে।' আর বলেছিলেন, "যতক্ষণ 'আমি' আছে ততক্ষণ 'সেব্য সেবকই' ভাল।" ঐভাবে ভরপুর। তাই গাইলেন নিচে এসে।

শ্রীম আবার গাহিতেছেন —

গান — মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইলো পতিত, আবাদ ক'রলে ফলত সোনা॥
কালীনামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অব্দ শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না।
আছে একতারে মন এইবেলা তুই তায় সেচ না।
এখন আপন একতারে (মনরে) চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি সেঁচে দেনা।
একা যদি না পারিস মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥

(কথামৃত ১/৯/১)

শ্রীম এই গানটি গাহিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন চুপ করিয়া। আবার কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আমরা নানান প্রণালী দিয়ে তাঁরই স্তন্য পান করছি দিনরাত। গোলদীঘিতে দেখেছিলাম — পাখীরা স্নান করছে জলে একের পর এক। দেখে মনে হলো — ও তাই তো তিনি আগে থাকতেই জল করে রেখে দিয়েছেন এদের জন্যও।

(গদাধরের প্রতি) — 'তাই নির্জনে তপস্যা করতে হয়। ঠাকুরকে কেবল বলতে হয়, দেখা দাও, দেখা দাও, দেখা দাও।'

শ্রীম (গানের সুরে) — 'মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি।'

দেখ না ক্রাইস্টের crucifixion (ক্রুশবিদ্ধ) হলো। রাম সরযুতে ডুবে গেলেন। কৃষ্ণ ব্যাধের শরে প্রাণত্যাগ করলেন। চৈতন্যদেব এক version-এ (মতে) সমুদ্রে ডুবে গেলেন। পরমহংসদেব এক বছর ক্যানসারে ভুগলেন।

অবতারদের হয় কেন এই দুঃখকষ্ট? লোকের ভরসা হবে বলে। আরও দেখ, —

শঙ্করাচার্য্যের ভগন্দর হলো। বুদ্ধদেবের colic pain (পিত্তশূল)। বয়স খুব বেশী। তা কেমন — যেন একটা গাড়ী, চাকা ভেঙ্গে গেছে, সেটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে — অচল দেহ।

ঠাকুরের এমন হলো কেন? না — 'আমার দেখে ভক্তরা ভরসা পাবে।'

আনন্দকে ডেকে বুদ্ধদেব ঐ কথা বলেছিলেন। গাড়ীর একটি চাকা নাই। সেটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া যেমন, তেমনি শরীরটা বোধ হচ্ছে।

শ্রীম-র উর্দ্ধদৃষ্টি। গানের একটি চরণ গাহিতেছেন — 'মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কেবল জীবের সাহসের জন্য। তাঁকে ভুলে না যায় এতে — যাঁর কাছ থেকে দেহ পেয়েছে তাঁকে।

বলছেন, — ‘দেখ, আমিও ভুগছি। দেহ থাকলে ও আছেই।’

চৈতন্যদেব জলে ডুবেছিলেন। First time (প্রথমবার) জেলেরা তুললে। Second time (দ্বিতীয়বার) আর খবর পাওয়া গেল না। এটাই most reliable verson (বিশ্বাসযোগ্য মত) বলে মনে হয়।*

শ্রীম ছাদে দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তরা সকলে চলিয়া গিয়াছেন। এখন রাত্রি ১১টা। শ্রীম পূর্বভাবেই মত্ত। জগবন্ধু, বিনয় ও ছোট জিতেনকে ডাকিয়া আনিয়া কথা কহিতেছেন ছাদে — ট্যাঙ্কের কাছে দাঁড়াইয়া।

শ্রীম — ঐটিতে বেশ বোঝায় — ঐ যে ট্রামের — কি বলে, ওপরে যে ঘোরে — যা দিয়ে electric current আসে।

বিনয় — ট্রলি।

শ্রীম — ভাল কথায় কি বলে জিজ্ঞাসা করবে দিকিন্। যেমন ঐটি ট্রামগাড়ী চালায়, আমাদের জীবনেও তেমনি চলছে। তাঁর সঙ্গে এই সব দিয়ে যোগ। দেখ না হাওয়া — এই নিশ্বাস নিচ্ছি। এটি বন্ধ হয়ে গেল ব্যাস — সব বন্ধ, গাড়ী যেমন বন্ধ। তাই ঐটিতে বেশ বোঝা যায়। সর্বদাই তাঁর সঙ্গে যোগে রয়েছি। ঐটি একটি বেশ দৃষ্টান্ত। তাঁর হাতের পুতুল সব মানুষ। কর্তাগিরি থাকছে না। তাই ‘তমেব শরণম্ গচ্ছ, সর্বভাবেন ভারত’ (গীতা ১৮/৬২)। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক। অন্য উপায় নেই।

কলিকাতা। ১লা এপ্রিল ১৯২৪।
১৮ই চৈত্র ১৩৩০। মঙ্গলবার।

*ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ‘বৃহৎ বঙ্গে’ বলেন, চৈতন্যদেব রথের সময় গুণ্ডিচা মন্দিরে ‘সেপ্টিক্ ফিবারে’ দেহত্যাগ করেন।

দশম অধ্যায়

প্রতীচীর প্রতি ভারতের হিতবাণী

১

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদ। প্রভাত কাল। সূর্য উঠিতেছে। শ্রীম মাদুরে বসিয়া উপনিষদ পাঠ করিতেছেন — 'ব্রাহ্মধর্ম' ষষ্ঠ অধ্যায়। জগবন্ধু ও ছোট জিতেন রহিয়াছেন। বৈদিক সুরে পাঠ করিতেছেন।

শ্রীম — ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরম্ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম...

(তৈত্তিরীয় ব্রহ্মবল্লি - ১ম অনুবাক)

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা
বিদ্যুতোভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।..
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।

(কঠো ২/২/১৫ এবং শ্বেতা ৬/১৪)

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।।

(মুণ্ডক ৩/১/৮)

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু। তাই তাঁকে লাভ করলে সবই লাভ হলো। তখন লাভ করবার বাকী থাকে না আর কিছু। মানুষের মন লাভ লোকসান এই সব relative — সাংসারিক ভাব নিয়ে ব্যস্ত। কোনও লাভের আশা না থাকলে মানুষ কাজে অগ্রসর হয় না। তাই এই human language of gain and loss (মানুষের লাভক্ষতির ভাষা) দিয়ে বলছেন বেদ — তুমি লাভবান হতে চাও তা হলে ঈশ্বরকে লাভ কর। এর উপরে লভ্য আর কিছু নাই। তবে অগ্রসর হবে।

তাঁর স্বরূপ বলছেন এরপর। তিনিই সত্য, তিনিই জ্ঞান, তিনিই

অনন্ত। তিনি সচ্চিদানন্দ — বাক্যমনের অতীত। তিনি আছেন তাই জগৎ আছে। তাঁর প্রকাশে জগৎ প্রকাশিত। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ — self effulgent — জ্যোতির জ্যোতি।

কোথায় কিরূপে, কি উপায়ে পাবে, তাও বলছেন। হৃদয়ে তাঁকে দর্শন হয়। ঠাকুরও তাই বলেছেন, হৃদয় ডঙ্কামারা মানে famous (বিখ্যাত) স্থান। আবার বলেছেন, 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।' মানে সব হৃদয়েই আছেন, তবে ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত। আবার উপায় বলছেন, ধ্যানযোগে তাঁকে লাভ হয়। ঠাকুর ধ্যানের ওপর তাই খুব জোর দিতেন। তপস্যা, কর্ম কিংবা মনবুদ্ধি দ্বারা তিনি লভ্য নন্ — এর অর্থ এই নয় যে এগুলির প্রয়োজন নাই। কিন্তু শুধু এগুলি দিয়ে জানা যায় না। সহায় বটে। তাঁর কৃপাতেই তিনি লভ্য। তাঁর প্রসাদে তাঁর দিকে মন যায়। তবে তপস্যা, মানে তাঁকে পাবার চেষ্টা হয়। কিংবা অন্য কর্ম প্রকৃতিতে থাকলে তাও নিষ্কাম হয়ে করা। নিষ্কাম হয়ে, তাঁর শরণাগত হয়ে তপস্যা বা কর্ম করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধ চিত্তে তাঁর দর্শন হয়। তাই শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক বলতেন ঠাকুর।

যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁর কয়েকটি লক্ষণ বলছেন। প্রথম তিনি অতিবাদী হন না, অর্থাৎ তাঁকে অতিক্রম করে কিছু বলেন না। মানে সর্বদা তাঁর কথা বলেন যদি কথা বলতে হয়। ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা, এই কথা বলেন। বাক্ ইন্দ্রিয় অতি প্রবল, তাই তার কাজের উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বরকে দর্শন করলে আর সব আলুনী লাগে, বলতেন ঠাকুর। তাই অন্য জিনিষে অনুরাগ নেই।

২

রাত্রি সাড়ে আটটা। চারতলার ছাদে শ্রীম ভক্ত সভাতে উপবিষ্ট। অন্তেবাসী আসিয়াছেন কলেজ স্কোয়ার হইতে। থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে আজ বেলুড় মঠের শর্বানন্দজীর লেকচার ছিল — নিউইয়র্ক মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বোধানন্দজী সভাপতি হইয়াছিলেন।

শ্রীম সাড়ে ছটায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীম-র খুব আগ্রহ ঈশ্বরকে নিয়া যে যাহা করেন বা বলেন তাহা শুনিবার। নিজে বৃদ্ধ, যাইতে পারেন না, তাই 'friends'দের (বন্ধুদের) পাঠাইয়া দেন। এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল The National Reconstitution (জাতীয় পুনর্গঠন)।

শ্রীম — (সাগ্রহে অন্তেবাসীর প্রতি) কি সব কথা হলো? আমরা হাঁ করে বসে আছি শুনবার জন্য।

অন্তেবাসী — শর্বানন্দ স্বামী বললেন, দেশকে উঠাতে হলে civic virtues (সমাজনীতি) আর spiritual virtues (ধর্মনীতি) একসঙ্গে চালাতে হবে। আর life (জীবন) দিয়ে universality of religion (ধর্মের সার্বজনীন দৃষ্টি) শেখাতে হবে। আর a band of soldiers with spiritual weapons will have to be sent out both here and abroad for the propagation of the ideas of the universality of religion (সুদৃঢ় ধর্মনীতি দ্বারা সুসজ্জিত করে একদল ধর্মসৈনিক, ধর্মের সার্বজনীন ভাব প্রচারের জন্য এদেশে ও বিদেশে প্রেরণ করবার আবশ্যক হয়ে পড়েছে)।

স্বামী বোধানন্দ বল্লেন, 'Education'-এর (শিক্ষার) দরকার। 'Body and mind' (দেহ ও মন) এ দুটিকেই তৈরি করতে হবে। You are the part of Brahman (তোমরা ব্রহ্মের অংশ) — এই কথা প্রচার করে লোকের মনকে ওপরে ওঠাতে হবে। আর West-এর (পাশ্চাত্যের) civic quality (সমাজনীতিগুলি) punctuality, honesty etc. (সময়ের সদ্ব্যবহার, সততা প্রভৃতি) আনতে হবে। এগুলি আমাদের spirituality-র (ধর্মের) সঙ্গে মিললে তবে ভাল ফল ফলবে। ধর্মের নামে laziness (অলসতা) ঢুকেছে লোকের ভিতর। এ দূর করতে হবে।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) — In a nutshell (সংক্ষেপে) এই দাঁড়ায় — কর্ম করা। 'Reconstruction' (সংগঠন) মানে

কর্ম। তা করবে না? কর্ম না করে উপায় আছে? তাতে আবার নীচে পড়ে গেছে দেশ। সকলকে কর্ম করতে হবে। তবে এক কাজ নয়, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কাজ। কি কাণ্ডখানা তিনি করেছেন! কি করে থাকে কাজ না করে? 'কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম' (গীতা ৩/৫) প্রকৃতি জোর করে করাবে। এক এক প্রকৃতি এক এক রকমের কর্ম করবে। এই জগৎটি রক্ষার জন্য তাঁর এমনি ব্যবস্থা। কারুকে নাক সিঁটকাবার যো নাই।

তবে ঘর আলাদা, ঠাকুর বলতেন, তোমার এ ঘর, এর ও ঘর। ভিন্ন ঘরের ভিন্ন কাজ। একজন ঋষিকে যদি বল — তুমি তপস্যা ছেড়ে উঠে অন্য কাজ কর। তিনি কি তা শুনবেন? তাঁর ঘর আলাদা।

তাঁর অনন্ত কাণ্ড চলে কি করে! এক থাক্ আছে আবার, তাঁরা খালি তাঁকেই ডাকবে।

দেখুন, চার বর্ণ, আবার তার ভিতর চার আশ্রম আছে। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চার আশ্রমই তাঁকে ডাকবে। দেখে নাক সিঁটকানো চলবে না।

ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল East-West (প্রাচ্য-পাশ্চাত্য) মিল হয়, তাই স্বামীজীকে পাঠালেন ওদেশে, ওরা এদেশের কথা, ধর্মের কথা শুনবে। আর ওদেশ থেকে ওদের সব বিদ্যা এদেশে আসবে। ওদের কত গুণ, তবে তো অত বড় হয়েছে। ওসব এদেশে আসবে। আদান প্রদান।

গোড়ায় ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে সবই পণ্ডশ্রম। স্বার্থপর হয়ে যায় লোক। মনে করে নিঃস্বার্থ করছি, কিন্তু তা হয় না। তাতেই ঈর্ষা দ্বেষ বৃদ্ধি হয়। West-এর (পাশ্চাত্যের) সে ভয় বিলক্ষণ আছে। Narrow Nationalism (সংকীর্ণ জাতীয়তা) এসে যায়।

ঠাকুরের message (বাণী) broad, universal (উদার, সার্বজনীন)। এতে সারা জগৎকে আপনার করে দেয়। West-এ (পাশ্চাত্যে) যাওয়ার দরকার এই message (বাণী)। তাই স্বামীজী গিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে এলেন। ক্রমে এগুলি ছড়াবে। Politician-দের

(রাজনীতি বিশারদদের) ভিতরও ঠাকুরের universal message (সার্বজনীন বাণী) ক্রমে ঢুকছে। West-এরই (পাশ্চাত্যেরই) benefit (উপকার) বেশী হবে।

ক্রাইস্টের ধর্ম ওরা আদপেই বুঝতে পারে নি। ঠাকুরের কথা শুনে ক্রমে তা বুঝতে পারবে। তাদের অন্য সব ঠিক আছে, শরীর বেশ। তার রক্ষার সব উপকরণ বের হয়েছে। মনও সতেজ, কিন্তু দৃষ্টি নিম্ন। উর্ধ্বদৃষ্টি হলে তবে ভাল — মানে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি। এটিকে ওরা যদি highest idea (সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব) বলে গ্রহণ করে, তবেই মঙ্গল। এইটিই ঠাকুরের message to the West (প্রতীচীদের প্রতি উপদেশ) — one, God is; two, I have seen God; three you also can see God. (প্রথম — 'ঈশ্বর আছেন'; দ্বিতীয় — 'আমি ঈশ্বর দর্শন করেছি'; তৃতীয় — 'তোমরাও ঈশ্বরকে দেখতে পার')। এটি গ্রহণ করলেই ওরা বেঁচে যাবে।

বাইবেলেও আছে এ কথা — 'Ye are divinities'; 'seek ye first the kingdom of God' (St. Matthew 6:33) 'what is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul?' (St. Matt. 16:26) তোমরা সব দেবতা; আগে বরং ঈশ্বর লাভের চেষ্টা কর; আত্মজয় বিনা জগৎজয়ও নিষ্ফল। এসব চাপা পড়ে গেছে। এও তাঁর ইচ্ছা।

৭-৪-২৪

৩

শ্রীম চারতলার ঘরে বসিয়া উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন। সকাল সাতটা প্রায়। কাছে দু'একজন ভক্ত। 'ব্রাহ্মধর্ম' সপ্তম অধ্যায় পাঠ করিলেন সুর করিয়া।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।...

(শ্বেতা ৬/৭)

হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

(শ্বেতা ৪/১৭)

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।...

(মুণ্ডক ২/২/৫)

ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ শ্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি॥

(শ্বেতা ২/৮)

শ্রীম — ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এঁরা ঈশ্বর, কিন্তু পরমেশ্বর এঁদেরও ঈশ্বর। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, যম, বরুণ, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতারা মহাশক্তিশালী। কিন্তু পরমেশ্বর এঁদেরও জন্মদাতা। তিনি অতুলনীয়। তাঁর সমানই নাই, তাঁর চাইতে বড় কি করে হয়? তিনিই সকলের বড়, তাঁর অচিন্ত্য শক্তি। এই অনন্ত বিশ্বের রচনার কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। কি অদ্ভুত বুদ্ধির প্রকাশ, আর ক্রিয়াশক্তিই বা কি প্রচণ্ড! কি বিচিত্র বুদ্ধি যিনি এই plan-টি (ছবিটি) তৈরি করেছেন! বৈজ্ঞানিকরা অবাক হয়ে যায় এক একটা বিষয় ভেবে। এই দেহটি দেখ — কি ভাবে চলছে। একটু এদিক সেদিক হলে সব বন্ধ। আর কি সূক্ষ্ম ক্রিয়া চলছে ভিতরে। তাই (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র) রায় মশায় বলেন, 'আশ্চর্য হয়ে যাই — যখন একটু ঘাসের চাপ নিয়ে দেখি কি বিচিত্র বুদ্ধি দিয়ে এটি তৈরী করেছেন।' বৈজ্ঞানিকগণের কেউ কেউ Grand Intelligence (বিচিত্র বুদ্ধি) বলছেন। আবার কর্মশক্তি দেখ — কেউ একটু শরীরের শক্তি দেখালে সকলে বাহবা দেয়। আর একি কাণ্ডখানা চলছে! কতবড় শক্তির প্রয়োজন এটি handle (পরিচালনা) করতে। বুদ্ধির জোর, গায়ের জোর দুই-ই অদ্ভুত।

আবার তাঁর মন বুদ্ধি দেহ কিছুই নাই বলছেন। আমাদের এই মনবুদ্ধিরও কারণ তিনি। তাই স্বাভাবিকী* বলেছেন জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। অর্থাৎ মানুষের মত মাথা ঘামিয়ে এই plan-টি (পরিকল্পনা) তৈরী করেন নাই। না তো মানুষের মত শরীর খাটিয়ে

*স্বাভাবিকী - একটি বৌদ্ধ মত

চালাচ্ছেন! আসল কথা হলো — তিনি সকলের স্বরূপ আবার কারণ। ইচ্ছামাত্রই নিঃশ্বাসের মত সব হয়ে যাচ্ছে। একটা বিষয় নিয়ে ভাবলে সারা জন্ম কেটে যায়, বোঝা যায় না। জগদীশ বোস মশায় সারা জীবনে এটা বের করলেন — বৃক্ষেরও মানুষের মত সুখদুঃখ বোধ আছে। তবুও তিনি ঋষিদের কথায় বিশ্বাস করে experiment (গবেষণা) করেছিলেন বলে শীঘ্র হলো। কিন্তু যিনি এই স্থূল, সূক্ষ্ম জগৎ করেছেন, আবার চালাচ্ছেন সব নিঃশ্বাসের মত তাঁর কি অসীম ও অচিন্ত্য শক্তি!

এদিক দিয়ে চিন্তা করলে তবে মানুষের littleness (ক্ষুদ্রতা) ধরা পড়ে। তাই ঋষিরা এভাবে বলেছেন। চোখের সামনে আঙ্গুল দিয়ে ধরেছেন। যেতে চায় না কিনা অহংকার! এক একটি mudball (মৃৎপিণ্ড) আমরা, মনে করি এক একটি Lord (অধীশ্বর) কিন্তু compare (তুলনা) করে দেখ, কোথায় তোমার Lordship (কর্তাগিরি)! তিনিই কর্তা আমরা অকর্তা।

শ্রীম — এত বড় হয়েও তিনি ভক্তের জন্য ছোট হয়ে ধরা দেন, আবার মানুষের হৃদয়ে বাস করেন। চিত্ত শুদ্ধ হলে তাঁকে দেখা যায় — ধ্যানযোগে। ‘হৃদা’ মানে ব্যাকুলভাবে, মৌখিক নয়। ব্যাকুল হয়ে তাঁর চিন্তা করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তাঁর ছাপ পড়ে শুদ্ধ চিত্তে যেমন স্থির নির্মল জলে প্রতিবিম্ব পড়ে। তাই ব্যাকুলতা চাই। ঠাকুর বলতেন, ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বল তিনি দেখা দিবেনই দিবেন। বলতেন, যেমন dawn heralds the sunrise (ঊষা যেমন সূর্যোদয় ঘোষণা করে) তেমনি ব্যাকুলতার পরেই ভগবান দর্শন হয়। তার দর্শন হলে তখন problem of human life (মনুষ্যজীবনের সমস্যা) solved (সমাপ্ত) হয়ে গেল। জন্মমৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ হলো। অমৃতত্ব life everlasting প্রাপ্তি হলো।

তাই যতক্ষণ না তাঁকে লাভ হয় ততক্ষণ অন্য বাক্য বন্ধ কর, বলছেন। মানে অন্য সব কার্য — চেষ্টা ছেড়ে তাঁকে লাভের চেষ্টা কর।

ঠাকুর বলেছিলেন ঈশানবাবুকে — দিন কতক না হয় তাঁর জন্য পাগল হয়ে গেলে! তিনি এত বড় হলেও শরণাগতের নিকট ছোটরও ছোট হয়ে যান। আবার সাড়ে তিন হাত মানুষ হয়ে আসেন। ভক্তরা যখন ব্যাকুল হয়ে কাঁদেন তখন তিনি আসেন। এসে তাঁদের কোলে তুলে নেন। যেমন এখন ঠাকুর এসেছেন। বেদে যাঁকে এত করে বলেছেন তিনি এই মানুষ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন ভক্তদের ভরসার জন্য। বলেছেন, 'আমার ধ্যান করলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না।' শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি। কয়েকজনকে দিয়ে তাঁর ধ্যান করিয়েছেন। আবার তাতে ঈশ্বরলাভ হয়েছে। তাঁরা তাঁর কথার জীবন্ত প্রমাণ — living testimony.

তাই ঋষিরা বলছেন, তাঁকে 'অমৃতস্য এষঃ সেতুঃ' (মুণ্ডক ২/২/৫)। মৃত সংসার, অমৃত তিনি। জড় আর চৈতন্য। রক্তমাংসময় ভৌতিক শরীর মন আর চিন্ময় তিনি। এই opposite (বিরুদ্ধ) পদার্থ দুটির সংযোগ সেতুও তিনি। যদিও দুটি স্রোত দুদিকে যাচ্ছে — ভোগ ও ত্যাগ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, মৃত্যু ও অমৃত, শান্তি ও অশান্তি, জ্ঞান ও অজ্ঞান, জগৎ ও ঈশ্বর — এ দুটির সংযোগস্থল তিনি, তাই 'সেতু', 'উড়ুপ' বলেছেন। উড়ুপ মানে ভেলা — নৌকা।

সংসারের ভীষণ ছবি একদিকে দেখিয়েছেন। এ আর দেখাতে হবেই বা কেন? সকলেই বুঝতে পারছে কি ঝঞ্ঝাটের জায়গা! জ্বলন্ত অনল। অন্তরে বাইরে শত্রু। ভিতরে কামক্রোধাদি আর বাইরে শোকতাপাদি। আবার আর একদিকে বলছেন, আমার স্মরণ নাও। অমৃতের সেতুতে আরোহণ কর। ব্রহ্মোড়ুপ আশ্রয় কর। তাতে উঠলে আর ভয় নাই। চির শান্তি, চির আনন্দ লাভ হয়।

শ্রীম — ঠাকুরের রাস্তাটি আরোও সহজ। বলছেন, মা জানতে চাই না তুমি কি করেছ না করেছ, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। ব্রাহ্মভক্তদের বলেছিলেন, তোমরা তাঁর ঐশ্বর্যের কথা এত বল কেন — তুমি হেন করেছ, তুমি তেন করেছ? কিসে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তার চেষ্টা কর। তাই বল, দেখা দাও, দেখা দাও, — ব্যাকুল

হয়ে বল। তিনি নিশ্চয় দেখা দিবেন। এটি সরল প্রার্থনার পথ।

শ্রীম ছাদে একটু বেড়াইয়া চারতলার ঘরে বিছানায় আসিয়া বসিলেন। হাতে গীতাখানা লইয়া ষোড়শ অধ্যায় পাঠ করিতেছেন।

শ্রীম — এখানে বলছেন দু'রকম মানুষের কথা। মানুষের মধ্যে অসুরও আছে আবার দেবতাও আছে। ঈশ্বর বিদ্বেষী আর ঈশ্বর বিশ্বাসী।

যারা ঈশ্বর বিদ্বেষী — অসুর অর্থাৎ যারা নিজে কর্তা সেজে বসে আছে তাদের লক্ষণ বলছেন। এ না বললে কি করে লোক সাবধান হবে। দু'ভাব-ই মানুষের মধ্যে আছে কিনা তাই। আদর্শ ঈশ্বরলাভ — দৈবীভাব সহায়। আসুরিকভাব বর্জনীয়। আসুরিক লোকদের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি অর্থাৎ ভোগ-ত্যাগ, জগৎ-ঈশ্বর এই বিবেক জ্ঞান, এই বুদ্ধি নাই। সবেতেই প্রবৃত্তি — সবই জগতের ভোগ্য। তাদের এই জ্ঞান। তাই শুচি অশুচি, সদাচার অসদাচার, সত্য অসত্য এসবেরও ধার ধারে না। Eat, drink and be merry (খাও দাও মজা কর) এই তাদের আদর্শ।

৪

শ্রীম — (তর্জনী দিয়া শূন্যে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া) ঈশ্বর থেকে ঈশ্বরে। জীবের গতি এই। ওখান থেকে এসে ওখানে যাওয়া। মানুষ জন্ম একটা necessary stage (অতি প্রয়োজনীয় অবস্থা) in the course of progress (অগ্রগতির পথে)। এই stage-এর (অবস্থার) দুটি exterme points-এর (চরম বিন্দুর) কথা বলা হয়েছে এখানে। একটি অসুর আর একটি দেব, from the brute man to the God-man। আকারে মানুষ কার্যে brute (পশু)। তার কি কার্য, কি ভাবনা তার একটি চিত্র দিয়েছেন। আর দেব-মানবের (God-man-এর) কিরূপে ব্যবহার তার একটি চিত্র দিয়েছেন। কেননা, তবেই আপনার foothold (অবস্থান) কোথায় ধরতে পারবে আর সেখান থেকে অগ্রসর হবে ঈশ্বরের দিকে। এগুলি যেন milestones

(পথ-নিশানা)। সকলেই চিন্তা করলে নিজের অবস্থা ধরতে পারে — কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। মিলিয়ে নিলেই হলো। 'গাইড্ বুকে' যেমন direction (নির্দেশ) তেমনি এগুলি। জীবের সুবিধার জন্য কত রকম করে আয়োজন করেছেন। আবার মাঝে মাঝে এসে এগুলি ব্যাখ্যা করেন অবতার হয়ে। তিনি আসেন সময় দেবভাবের ছড়াছড়ি, অন্য সময় ভাঁটা পড়ে যায়। ঠাকুর এসেছেন সম্প্রতি এই দেবভাব দেখাতে। তবে মানুষ ভরসা পাবে। অবতারের জীবন দেবভাবের living demonstration (জীবন্ত অভিনয়)।

ঠাকুর তিন ভাগ করেছিলেন মানুষকে — যোগী, যোগীভোগী আর ভোগী। প্রথম দুটিতে দেবভাব আছে — শেষেরটি অসুরের ভাব। মানে স্বার্থপর দেহাত্মবুদ্ধির জমাট বাঁধা। পশুভাব — খালি আহার বিহারাদি নিয়ে ব্যস্ত।

দেবভাব পশুভাব দুই-ই মানুষে আছে। যখন সমাজে দেবভাবের বেশী প্রকাশ হয় তখনই বলে সত্যযুগ। দু'টিই ঘুরছে। যখন কম হয় তখন কলিযুগ। আর মাঝের দুটি ত্রেতা দ্বাপর। ক্রমে কমে আসে দেবভাব। এরূপভাবে ঘুরছে। এ দুটি universal force (জাগতিক প্রকৃতির বিধান শক্তি), চলছে ঠিক একটা নিয়মে — by the law of nature. একটা মানুষে যেমন এভাবের উঠাপড়া করছে, তেমনি একটা society of men-এও (মানুষের সমাজেও) একটা জাতিতেও তাই চলছে।

বর্তমান সময়টা এ দু'ভাবের সন্ধিক্ষণ। Materialism (জড়বাদ) বেড়ে গেছে। লোক দেহবুদ্ধিসম্পন্ন বেশী হয়ে পড়েছে। তাই as a course of evolution (ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে) ঠাকুর এসেছেন দেবভাব ছড়াতে। Material culture-এর (জাগতিক উন্নতির) লীলাভূমি West (প্রতীচী)। তার মধ্যে আমেরিকা অন্যতম। ঐখানে পাঠালেন স্বামীজীকে ওদের ঘরে গিয়ে ওদের মুখের ওপর বলে এলেন তোমাদের ঐ দোষ। সাবধান হও নচেৎ ধ্বংস অনিবার্য। এই দেখ — দু'টি দিকেই আছেন। এদিকে ওদের ওরকম করেছেন,

এদিক থেকে আবার স্বামীজীকে দিয়ে সাবধান করিয়ে দিলেন। তা করবেন না, এযে তাঁর নিজের কাজ। দুইই নিজে করছেন।

স্বামীজীকে দিয়ে বলে পাঠালেন ওদের; তোমরা বিশ্বাস কর ঈশ্বর আছেন। আর তোমরা দেখতে পাবে। তোমরা তাঁর part and parcel (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ) আপনার লোক — 'Children of Immortal Bliss' (অমৃতের সন্তান)। আমেরিকাকে centre (কেন্দ্র) করে পাশ্চাত্যে ঐ দেবভাব ছড়াবে। তাই স্বামীজীর আমেরিকা গমন।

শ্রীম পড়িতেছেন। বলছেন — এবার আসুরিক চিত্রটি অঙ্কিত করেছেন; extremely selfishman (অতি স্বার্থপর লোক) কি কাজ করে, কিরূপ ভাব তার, তাই বলছেন।

সে ভাবে, 'আমি ধনী ও মানী, আমি কুলীন, বিদ্বান, আমি সিদ্ধ ও সুখী, আমি বলবান ও সকলের বড়, আমি দাতা ও বিধাতা। আজ আমার এই মনোরথ পূর্ণ হলো; কাল ওটা পূর্ণ করবো। আজ আমার অত সম্পদ ও ঐশ্বর্য কাল এত হবে বেড়ে। আজ একে মেরেছি, কাল ওকে মেরে পথ নিষ্কন্টক করবো।'

দৈবী মানুষ ভাবে, 'ঈশ্বর কর্তা, আমি অকর্তা। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী; আমি চালিত তিনি চালক। আমার যা কিছু সব তাঁর। তিনি মালিক। ধনজন, পুত্রমিত্র, বল ঐশ্বর্য, বিদ্যাবুদ্ধি, কুলশীলমান সব তাঁর। আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁর। এই বিশ্বসংসার তাঁর। তাই এই বিশ্বসংসার আমার পরম আত্মীয়। যেমন — শ্রীকৃষ্ণ, যীশু, ঠাকুর।' পাশাপাশি ও দু'টি চিত্র অঙ্কিত করে ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা উচিত।

'একজন মানুষ ভাবে, 'আমি কর্তা, ঈশ্বর অকর্তা'। আর একজন ঠিক তার উল্টো, 'ঈশ্বর কর্তা, আমি অকর্তা'। কেন এ contrast (তুলনা) করেছেন? লোকশিক্ষা হবে বলে। Opposite forces (বিরুদ্ধ দুটি শক্তি) না হলে কাজ হয় না তাই। বাধা, শক্তি বৃদ্ধি করে। তাই সৃষ্টিতে দেব অসুর দুইই রেখেছেন। এ যে তাঁর খেলা তাই বলেন ঋষিরা!

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে আপনিই প্রকাশ পায় দৈবীগুণ। তা না হলে আসুরিক দোষ দেখা দিবে। দৈবী লোক কর্মক্ষেত্রে uncompromising (নৈতিক বিষয়ে অটল) যেমন যীশু, শ্রীকৃষ্ণ, হনুমান।

ঠাকুর 'আমি' 'আমার' প্রায় বলতে পারতেন না। বলতেন 'এখান' 'এখানকার'। দেখতেন কিনা মাকে সর্বত্র। ভালোতেও মা খারাপেও মা। ভবতারিণীও মা, 'রতির মাও' মা।

"যা সব বলা হয়েছে এখানে সৎসঙ্গ করলে তার ধারণা হয়। নইলে বোঝা যায় না। সৎসঙ্গে নিজের দোষগুণ ধরা পড়ে। Right (ঠিক) ঘড়ির সঙ্গে Wrong (ভুল) ঘড়ি মিলান হয়। তাই সৎসঙ্গ বড় দরকার।

এ চিত্র দুটি কণ্ঠস্থ করে রাখা উচিত। আর প্রার্থনা করা 'বুঝিয়ে দাও' বলে। এগুলি living guides to religion in practice (দৈনন্দিন জীবনে সত্যিকার ধর্মাচরণের জীবন্ত শিক্ষা)।

৫

হাওড়া রেলস্টেশন। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া আছেন। চারিদিকে শতাধিক সাধুভক্ত। ইনি মাদ্রাজ যাইতেছেন। সঙ্গে স্বামী বোধানন্দ, স্বামী সর্বানন্দ, আর স্বামী শ্রীবাসানন্দ। এঁরা সকলে সেকেণ্ড ক্লাশে। সেবক উমেশ, শঙ্কর, চিনু ও দক্ষিণী ব্রহ্মচারী আর একজন। উটকামাণ্ডে যাইতেছেন চিনুর পিতার আন্তরিক আমন্ত্রণে। মহাপুরুষ মহারাজ ৭।৪৫ মিনিটে প্ল্যাটফরমে আসিয়াছেন, ৩৯ মিনিট এখনও দেরী। গাড়ী ছাড়ে ৮।২৪ মিনিটে — পুরী এক্সপ্রেস। দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। ভক্তরা মালা, ফল, মিষ্টি উপহার দিতেছেন। ইনি সহাস্য বদনে আশীর্বাদ বিতরণ করিতেছেন। একটি ভক্ত ৮।১০টি কমলালেবু কাগজের ঠোঙ্গায় করিয়া দিয়া বলিলেন, 'মুখ শুকিয়ে গেলে খাবেন।' উনিও ঘাড় নাড়িয়া বালকের মত গ্রহণ করিলেন। দুই মিনিট থাকতে গাড়ীতে বসিয়াছেন। সাধুভক্তগণের বিবিধ জয়ধ্বনিতে স্টেশন মুখরিত। গাড়ীও ছাড়িয়া দিল।

শ্রীম মর্টন স্কুলের ছাদে বসিয়া আছেন। ডাক্তার, দুই জিতেন, বলাই প্রভৃতি ভক্তরা অনেকে আছেন। তিনি হাওড়া স্টেশন হইতে প্রত্যাবৃত্ত ভক্তদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। জগবন্ধু, ছোট জিতেন, বিনয় এঁরা ৯।৪৫-এ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্টেশনের সমস্ত সংবাদ শ্রীম আগ্রহের সহিত শুনিলেন — সব সাধুভক্তদের নাম পর্যন্ত।

মাখন শ্রীম-র ইচ্ছায় রামকৃষ্ণ বন্দনা গাহিতেছেন। 'গাওরে জয় জয় রামকৃষ্ণ নাম।' ভক্তরাও গাহিতেছেন। শ্রীম ধ্যানস্থ হইয়া শ্রবণ করিতেছেন। বন্দনা শেষ হইল।

ভাববিভোর হইয়া মধুরকণ্ঠে শ্রীম বলিতেছেন, 'ভ্যাগ্যিস্ তিনি এসেছিলেন, তাই এত সাধু, আর এমন সব সাধু দেখা যাচ্ছে। এদেশে সাধু কোথায় ছিল? ঠাকুর এলেন, তাই সব তৈরী হচ্ছে।'

আজ কালীতলায় (ঠনঠনের) দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম ট্র্যামে হরিহর আর একজন সাধু যাচ্ছেন। মনে করলাম, কত ভাগ্য সাধু দর্শন হলো! আর আপনারা এতগুলি সাধু একসঙ্গে দর্শন করে এলেন। এটিই real life (প্রকৃত জীবন)।

সাধু দেখলে তাঁকে মনে পড়ে। তখন নিজের কথাও মনে হয়। আমি কোথায়, তাঁরা কোথায়, আর তিনি কোথায়। তা হলেই automatically (আপনা আপনি) কাজ হয়ে যায়। মনে এই চিন্তা আপনা থেকে উঠে — ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে। এঁরা এই যাত্রার পথিক। অনেকে অনেকটা এগিয়েছেন। কেউ কেউ লক্ষ্যে পোঁছে আবার ফিরে এসেছেন অন্যদের এগিয়ে নিয়ে যেতে। আমিও এঁদের সঙ্গী হয়ে পড়ি, আর কেন? নেহাৎ সঙ্গী হতে না পারলে ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। তা হলে যেখানে আছ সেখান থেকেই অগ্রসর হতে পারা যাবে। কিন্তু খুব close contact (ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক) চাই।

কলিকাতা, ৮ই এপ্রিল, ১৮২৪।
২৫শে চৈত্র, ১৩৩০ সাল। মঙ্গলবার।

একাদশ অধ্যায়

উপনিষদের ঋষি শ্রীম (১)

১

মর্টন স্কুল। আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। চারতলার ছাদে শ্রীম বসিয়া আছেন — পূর্বদক্ষিণ কোণে। মাদুরে বসিয়া 'ব্রাহ্মধর্ম' থেকে উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন। সূর্য উঠে নাই এখনও। খুব গরম পড়িয়াছে কয়দিন। অষ্টম অধ্যায় শ্রীম পড়িতেছেন —

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পপাৎ।...
(শ্বেতা ৩/৩)

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমানঃ।...
(কঠো ২/২/৮)

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্... (কঠো ১/২/২০)

তমাত্মস্থং যেহনুপযশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
(কঠো ২/২/১২)

শ্রীম — তিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। এই কয়টি মন্ত্রে তাই বলা হয়েছে। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, জগতের কারণ, আবার পরিচালক।

একটি মানুষ চিন্তাশীল। সে নিজের মধ্যে যা দেখছে, আর বাইরে যা দেখছে, এই জ্ঞানের সীমানা তার। তার বাইরে কিছু আছে বলে ধারণা হওয়া কঠিন। নিজের ভিতর দেখছে চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হাত পা প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়, আর মন বুদ্ধি অন্তরেন্দ্রিয়। এগুলি তার প্রত্যক্ষ অনুভব। আর দেখছে বাইরের জগৎ — কিরূপ? না — অনিত্য, অচেতন স্তব্ধ আর অনেক।

চতুর্বিংশতিতত্ত্বময় এই জগৎ সম্মুখে দেখছে মানুষ। যার বিষয়ভোগের মাদকতা কমে গেছে অনেকটা, তার এ প্রশ্ন জাগে —

কোথা থেকে এগুলি এলো, কেন এলো, কে করেছে এসব। এরূপ জিজ্ঞাসুকে ঋষিরা বলছেন এসব কথা। তাঁরা তাঁকে দর্শন করেছেন, তাই বলছেন — এ সকলের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। অনিত্য, অচেতন ও অনেকের অর্থাৎ জীবজগতের মধ্যে তিনি নিত্য, চেতন ও এক। এ দেহমন নিয়ে যে গর্ব তাও তিনি দিয়েছেন। জগৎও তাঁর। তাঁর জিনিষ নিজের বলে নিও না, তাঁকে দাও। অহংকার যতদিন না যায়, তাঁর অধীন হয়ে, দাস হয়ে থাক। যে কোনও রকমে তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ করে জীবনধারণের জন্য যতটুকু আবশ্যক ততটুকু তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিবে। এরূপভাবে শরণাগত হয়ে থাকতে পারলে এ শরীরেই তাঁকে দর্শন হয়। যে উপকরণে বদ্ধ — তাতেই মুক্তি।

Misappropriate (অপব্যবহার) করলেই মুস্কিল, জেলে যেতে হয়। তিনি সব করে দিয়েছেন, তুমি বলছো আমার এসব, দেহমন, ধনজন, এই জগৎ। এসব তাঁর জানলে তবেই সবেতে শ্রদ্ধা আসবে, পবিত্র ভাব আসবে। মনে হবে ভোগের জিনিষ নয়, পূজার জিনিষ এই জীবজগৎ। এ বুদ্ধি এলেই বেঁচে গেল।

মন-বুদ্ধির পরে, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরও পরে তিনি আছেন। সর্বদা আছেন, সর্বত্র আছেন আবার এ শরীরে আছেন। তাঁকে দেখতে পারলে শাশ্বত, মানে everlasting সুখ লাভ হয়। কেন, না তিনি যে সুখস্বরূপ।

এই মানুষদেহে তাঁর দর্শন হয়। এবার যদি না পার তাঁকে দর্শন করতে তবে বিপদে পড়বে। জন্মমরণচক্রে পড়বে। অনেক দেরী হয়ে যাবে। সুখ কে না চায়! তবে যে বুদ্ধিমান সে সুখের খনি চায়, অফুরন্ত সুখ অর্থাৎ ঈশ্বরকে। বিষয়ের সুখ এক কণা সুখ। বুদ্ধিমান তা চায় না — চায় সুখস্বরূপকে।

মিউজিয়াম দেখার মত দেখতে পারলে রক্ষে। মিউজিয়ামে সব দেখে কিন্তু কিছুই নিতে পারবে না। নির্লিপ্তভাবে দেখে। তেমনি সংসারে থাকা। তবে তাঁর কৃপায় দর্শন হয়।

২

অপরাহ্ন পৌনে সাতটা। কয়দিন গরমের পর আজ জল হওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে। শীতল হাওয়া বহিতেছে। শ্রীম ধ্যান করিতেছেন অল্পক্ষণ শিবমন্দিরের রোয়াকে দক্ষিণাস্যে বসিয়া — ঠনঠনের কালীতলায়।

একটি ভক্ত শ্রীমকে অন্বেষণ করিতে আসিয়া দেখিলেন তিনি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের পূর্ব ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছেন হাতে ছাতা। রাস্তা পার হইয়া কালীতলায় আসিয়াছেন। প্রথমে নিচে হইতে মা কালীকে যুক্ত করে প্রণাম করিয়া শিবকে রোয়াকে মস্তক ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর ধ্যান করিতেছেন।

ধ্যানান্তে ভক্ত বলিলেন, একজন সাধু স্কুলবাড়িতে অপেক্ষা করছেন। এতক্ষণ ভক্ত বলেন নাই। শ্রীম মা কালীকে প্রণাম করিলেন পুনরায়। এতক্ষণে শিবের আরতি হইতেছে — কিয়ৎক্ষণ তাহা দর্শন করিলেন মন্দিরের সম্মুখের রাস্তায় দাঁড়াইয়া। ঠাকুর ঝামাপুকুরে থাকার সময় সর্বদা এ মন্দিরে আসিতেন আর মাকে গান শুনাইতেন। তাই শ্রীমও সর্বদা এখানে আসেন।

শ্রীম মর্টন স্কুলে আসিতেছেন বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট দিয়া। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া দক্ষিণের বাড়িটি দেখাইয়া বলিলেন, 'এই আর. মিত্রের বাড়ি। এখানে ঠাকুর এসেছিলেন।' শ্রীম চলিতেছেন। একটি ভক্ত বলিতেছেন, '২৩শে মার্চ বুধবার রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম — আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়েছি। সঙ্গের ওঁরা নেন নাই। আর দেখলাম আমার previous (পূর্বের) সংস্কার যেন assert (দাবি) করতে চাইছে।' ঝামাপুকুর রোডের মোড় অতিক্রম করতে করতে শ্রীম বলিলেন, "এসব স্বপ্ন খুব ভাল — ব্রহ্মচর্যের স্বপ্ন — 'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি' (গীতা ৮/১১)। কোথায় হচ্ছে? " ভক্ত উত্তর করলেন, 'মঠে দেখলাম'। শ্রীম বললেন, 'খুব ভাল'।

ভক্ত — ১২ই জানুয়ারী দেখেছিলাম সন্ন্যাসের। আপনি তখন গদাধর আশ্রমে। তখনও দেখেছিলাম previous (পূর্ব) সংস্কার

assert (দাবি) করছে।

শ্রীম — কোথায় দেখলেন — গদাধর আশ্রমে?

ভক্ত — না, ওখান থেকে এসে।

এতক্ষণে সিটি কলেজের সম্মুখে আসিয়াছেন।

শ্রীম — এ খুব ভাল হচ্ছে। হয়তো কোনদিন হবে। এতে বোঝা যাচ্ছে ভিতর সাফ হয়ে যাচ্ছে। সাধুসঙ্গটি করবেন — ঐটি ছাড়বেন না। মাঝে মাঝে ঐটি করবেন। ঠাকুর বলতেন, মন হচ্ছে ধোপাঘরের কাপড় — যে রং-এ ছোপাবে সেই রং-ই হবে। ঐটি ছাড়বেন না।

আমহার্স্ট স্ট্রীট পার হইয়া 'আমস্ হাউসে'র দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফুটপাথে শ্রীম দাঁড়াইয়াছেন — সম্মুখে পঞ্চানন ঘোষ লেন। দক্ষিণে দু'খানা বাড়ির পরই মর্টন স্কুল — এইচ. বোসের বাড়ির গায়ে। একটি ভক্তের সঙ্গে সাধুর ঐশ্বর্যের কথা হইতেছে। শ্রীম বলিতেছেন, 'বাইরের glamour (চাকচিক্য) দেখে ভুলবেন না। যত গাড়ী ঘোড়াই হউক, বাইরের glamour (ঐশ্বর্য) দেখে ভুলবেন না। Inspiration-এর (ভগবৎ প্রেরণার) জন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করবেন।' যে যতই বড়ই হউক, তাঁর চাইতে বড় তো কেউ নয়। তাঁর কাছেই inspiration-এর (প্রেরণা দানের) জন্য প্রার্থনা করবেন।

শ্রীম দোতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া চারতলায় আসিলেন। গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ছাদে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ঘরে আসিলেন। শ্রীম বিছানায় পশ্চিমাস্য — উত্তরে চেয়ারে সাধু ও বড় জিতেনবাবু। শ্রীম-র দক্ষিণে বেঞ্চে জগবন্ধু বসা। আর মাখন বিছানায় বসা। গদাধর আশ্রমে অন্নপূর্ণা পূজার কথা হইতেছে।

শ্রীম — (সাধুর প্রতি) লোকবল না থাকলে বিরাট কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। অর্থ থাকলেই হয় না। মানুষ চাই, আবার willing (কর্ম করতে ইচ্ছুক) এমনতর মানুষ। গীতায় আছে যে কাজ সামলাতে পার তেমনি কাজ করবে। তা না হলে শরীর ভেঙ্গে যাবে।

শ্রীমকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাধু বিদায় লইলেন মিষ্টিমুখ করার পর।

রাত্রি প্রায় ৮-১৫ মিনিট। শ্রীম ছাদে আসিয়া বসিলেন — চেয়ারে প্রথম দক্ষিণাস্য, পরে উত্তরাস্য। সম্মুখে সামনাসামনি দুই সারিতে ভক্তগণ পূর্বপশ্চিম দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছেন। সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে। শ্রীম আজ খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছেন। শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

শিয়ালদহে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আজকাল ঈশ্বর চিন্তা করেন। তাঁহার সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীম — (বড় জিতেনের প্রতি) আপনি চেনেন?

বড় জিতেন — আজ্ঞে না। শুনেছি বৈষ্ণবভাব — বড় কড়াকড়ি নিয়ম।

শ্রীম — ওখানে ও ছিল না। ঠাকুরের কাছে ওসব নাই। সেখানে এক গাছে বহু পাখী — নানা রং বেরং-এর। তিনি কাউকে ডাকেনও নাই আসছে যাচ্ছে। যেমন আয়নার ওপর ছবি পড়ে, তেমনি। তবে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল দেখলে মাকে বলতেন, 'মা আমি আর পারি না ভাবতে, তুমি টেনে নেও।'

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — যান না, যান না একদিন আপনি।

বড় জিতেন — না মশায়, ও হবে না। শাস্তি আছে ওখানে। দাঁড় করিয়ে রাখে, কানমলা এই সব — বৈষ্ণব অপরাধের জন্য।

শ্রীম — তবে বাসাটা বলুন। জগবন্ধু যাবেন। উনি যেতে ready (প্রস্তুত) আছেন।

জগবন্ধু — কি জানি পাছে আবার kneel down (নতজানু) করিয়ে রাখে (সকলের হাস্য)।

শ্রীম — না, একদিন গেলেই কি করবে, তা করবে না।

বড় জিতেন — আমরা গেলে তো আর ট্র্যানস্ফার সার্টিফিকেট নিয়ে যাচ্ছি না (সকলের হাস্য)।

শ্রীম — এই স্কুল (ঠাকুরের) যে unorganised (সংগঠিত নয়) — এর তো affiliation (কোনও দল বিশেষের সঙ্গে যোগ) নাই।

আমি কয় বছর পরে জানলুম ইনি (ঠাকুর) আমার গুরু। আগে জানতেই দেন নাই। Equal term-এ (সমান মান দিয়ে) কথা কইতেন। ওখানে একগাছে বহুপাখী; organisation (দল) ছিল না।

'একটু নামাজ করে নেওয়া যাক।'

৩

শ্রীম উত্তরাস্য চেয়ারে ধ্যান করিতেছেন। শ্রীম-র সম্মুখে পশ্চিমের বেঞ্চে বড় জিতেন, পূর্ব বেঞ্চে বলাই, ছোট জিতেন ও জগবন্ধু। মাখন, ডাক্তার ও বিনয় বিদায় লইলেন। ধ্যানের পর শ্রীম ছাদে উত্তর দক্ষিণে পায়চারি করিতেছেন একাকী। বড় জিতেন join (যোগদান) করিলেন, ক্রমে ছোট জিতেন, বলাই ও শেষে জগবন্ধুও যোগদান করিলেন। চলিতে চলিতে কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — কি কাণ্ডটা চলছে! মানুষের ত এদিকে নজর নাই। Procreation (সন্তানোৎপাদনের) কি ব্যাপারটা দেখুন না একবার! সৃষ্টি রাখবার জন্য কি করছেন। যে কোনও একটা নিয়ে দেখলে দেখা যায় কি অদ্ভুত সব!

লোকে বলে আমি ওর সঙ্গে love (প্রেম) করেছিলুম। আহা, সারারাত বুকে সেই চিঠিখানা নিয়ে শুয়ে রইলো। কিন্তু জানে না তো তারা এর পিছনে কার হাত। তিনিই সৃষ্টির জন্য এই সব করাচ্ছেন। তারা ভাবে আমরা করছি।

এই দেশে বলে 'ফলটান্'। সোমত্ত মেয়ে হলে শ্বশুরঘরে আসতে চায়। তখন লোকে বলে এর 'ফলটান্' হয়েছে — অর্থাৎ procreation-এর (সন্তান উৎপাদনের) ইচ্ছা হয়েছে।

দেখুন এই কাণ্ডটা! একি শুধু মানুষের? সকলেরই হচ্ছে! বৃক্ষলতারও হচ্ছে। গাছে আছে pestil (পেষ্টিল) নামীয় female organ (যোনী)। যখন সময় হয় — ফলটান্ হয়, তখন কোথা থেকে পাখী কোন গাছের ফল খেয়ে বসলো এর উপর, তাতে বীজ পড়লো আর গাছ হলো fertilization (উর্বরতা) পেয়ে। ফুলেরও

তা'। রেণুগুলি হাওয়ায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। Male (পুরুষ) রেণু (pollen) উড়ে গিয়ে female (স্ত্রী) রেণুর উপরে পড়লো গাছে। তাতে ফল হচ্ছে। সমস্ত কাণ্ডটাই আগাগোড়া এই।

কিন্তু লোকে ভাবে বুঝি আমরাই করছি। কে করছে তার নাই ঠিক। তাই ঋষিরা এসবের পিছনে তাঁর হাত দেখেছিলেন — 'দেবাত্মশক্তি' তিনিই সব করাচ্ছেন। গঙ্গার সবটা স্পর্শ করতে হবে? এক জায়গায় করলেই তো হলো। তাঁরা দেখেছিলেন তাঁর হাত। এক জায়গায় দেখলেই হলো।

ভৃত্য শ্রীম-র নৈশভোজন নিয়া আসিয়াছে। একজন সেবক ঘরে গিয়া উহা রাখিয়া আসিলেন। তিনি শুনিলেন, শ্রীম বলিতেছেন পূর্বপ্রসঙ্গে।

শ্রীম — একজন স্ত্রীলোক একটি বই লিখেছে। তাতে আছে মাছ যখন ডিম পাড়ে জলে তখন লক্ষ লক্ষ ডিম হয়। তখন অন্য জানোয়ার এসে সেগুলিকে কব্ কব্ করে খেয়ে ফেলে। এর ভেতর যে দুই একটা বেঁচে যায় তার থেকেই এত সব ছানা-পোনা (species) হয়।

এই দেখুন না, মৃত্যুটি কেমন। যদি কেউ না মরতো তা হলে সকলের স্থান হ'ত কোথায়? তাই মৃত্যু। বেদে আছে 'মৃত্যু ধাবতি পঞ্চমঃ'।

বড় জিতেন — 'পঞ্চমঃ' কি?

শ্রীম — অগ্নি, সূর্য, মেঘ, বায়ু, মৃত্যু। মৃত্যু হলো পঞ্চম। সব আপনা আপনি নিজের কাজ করে যাচ্ছে। কে করাচ্ছে তা'তো জানে না।

ওরা scientists (বৈজ্ঞানিকগণ) যেখানে গিয়ে ঠেকবে সেখানেই বলে automatic (আপনা থেকে) হচ্ছে। জানে না তো কে করাচ্ছে। ঋষিরা দেখেছিলেন তাঁর হাত এ সবের পিছনে। 'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।।' (কঠো ২/৩/৩) অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু সব তাঁর ভয়ে কাজ করছে।

তাই মনে করুন কত লোক আসছে, আবার নীরবে চলে যাচ্ছে।

তাদের কোনও চিহ্নটুকু পর্যন্ত নাই। এই যেমন গেরুয়া ফেরুয়া — কোনও চিহ্ন নাই। নীরবে চলে যাচ্ছে নীরবে এসে। দুই একটার নাম শোনা যায় যারা লোকশিক্ষা দিবে। যেমন মাছের দুই একটা ডিম থাকে। আর সব খেয়ে ফেলে।

বড় জিতেন — এই আকাশ, তারা ওদেরও হয়?

শ্রীম — কে জানে! তার আশ্চর্য কি? হতেও পারে!

এই যে মৃত্যুর কথা— এতো Common sense (সাধারণ বুদ্ধি) থেকে আমরা বলছি। এর ভিতর কত বড় mystery (রহস্য) রয়েছে তা কে বলতে পারে? আমরা উপরে উপরে দেখে বলছি! Mystery penetrate (রহস্য ভেদ) কে করতে পারে?

সাড়ে নয়টা বাজিয়াছে। বেশ স্নিগ্ধ শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

৯-৪-২৪

৪

আজ প্রভাত বেশ সুশীতল। শ্রীম চারতলার ঘরে বসিয়া বৈদিক সুরে উপনিষদ পাঠ করিতেছেন। 'ব্রাহ্মধর্ম' নবম অধ্যায়। পাশে ছোট জিতেন ও জগবন্ধু। সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ন্যোঽভিচাকশীতি॥...(শ্বেতা ৪/৬)

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ
সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা॥...

স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হ অস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি...
(বৃহ ১/৪/৮)

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ। (শ্বেতা ২/৫)

অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥
(শ্বেতা ৪/৪)

শ্রীম — একটি বৃক্ষ দুটি পাখী অর্থাৎ আমাদের দেহস্থিত পরমাত্মা আর জীব। পরমাত্মা সাক্ষীস্বরূপ নির্লিপ্ত। জীব জড়িয়ে পড়েছে।

এ plan-ও (পরিকল্পনাও) তাঁর। তিনি নিজেই দু'ভাগ হয়েছেন। জীবভাবে জগতের সৃষ্টির কাজে যোগদান করেছেন, আর পরমাত্মারূপে নির্লিপ্ত। মানে এও জীবশিক্ষার জন্য। বলছেন, আমার মত নির্লিপ্ত থাক, তবে ভয় নাই। গোলমালের ভিতর থেকেও গোলমালে পড়বে না। ফল খেতে চাও তবে ঐ — ট্যাক্স দাও; সুখদুঃখ ভোগ কর।

'পরমাত্মা' — চির সুখশান্তির আশ্রয়, 'জীব' — মিশ্রিত সুখশান্তির আশ্রয়। জীবের অহংকারটিই জ্বালা — greatest riddle of the universe (বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা)। এটি দিয়ে বিশ্ব চালাচ্ছেন। যার অহংকার নাই, তার নিকট জগৎও নাই।

আবার উপায়ও করেছেন; বলছেন এই অহংকারকে আমার দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। তবে ভয় নাই। আমার আশ্রয়ে থাক। একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে থাক। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এও সম্বন্ধ। 'আমি তোমার দাস, পুত্র, মিত্র' এগুলিও সম্বন্ধ; তাহলে ক্রমে নির্লিপ্ত হতে পারবে।

রাজার ছেলে ভিখারীর ঘরে মানুষ হয়েছে, তার যা অবস্থা, তেমনি জীবের। 'ঈশ্বরের অংশ' ভুলে গিয়েই যত গোলমালে পড়েছে।

ঈশ্বর আবার ঋষিদের মুখ দিয়ে উপায়ও বলেছেন। কাউকে ভালবেসো না, মুস্কিলে পড়বে তা হলে। আমাকে খালি ভালবাস। জীবজগৎকে ভালবাসতে চাও, আমার ব'লে ভালবাস। আমি ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসলে 'হায় হায়' করতে হবে! আমায় ভালবাসলে চিরকাল তোমায় সুখশান্তি দিব।

ঋষিরা হাত দেখতে পেয়েছিলেন কিনা তাঁর! তাই সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনিই আটকিয়েছেন, আবার তিনিই পথ বলে দিচ্ছেন বেরুবার। যে বিষের জ্বালায় মরছো, সে বিষ আমায় দিয়ে দাও — এই অহংকার। বলেছিলেন, 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্' (ঈশা ১)। ধন মানে কামিনীকাঞ্চন। নিজের হউক, পরের হউক, এ নিলেই বন্ধন।

সংসারটি যেন 'বৃশ্চিকপুরী।' একটি বিশাল পুরী। ভোগের সব উপকরণ রয়েছে, বাঁধা দিবার কেউ নেই। বাগানে কত রসাল সুমিষ্ট ফল। যেই একজন হাত দিয়েছে অমনি বিচ্ছু হয়ে এক কামড় দিলে।

তা'তেই হয়নি, আবার গেছে আর একটা খেতে, অমনি বিচ্ছু দিলে আর এক কামড়। শেষে কেঁদে কেঁদে বেরিয়ে আসছে। সামনে গাছতলায় একটি লোককে দেখতে পেলো — বসে আছে, শান্ত ও সহানুভূতিসম্পন্ন। তিনি বললেন, ভাই এ জায়গায় এমনি। আমিও কামড় খেয়েছি। এখন বেশ আছি। একজন ভাল লোক এসে আমায় বলে গিছলো —এখানে থাকতে পার যদি ভোগের ইচ্ছা ছাড়। তারই কথায় পড়ে আছি। বেশ আছি। খাওয়া দাওয়া একজন এসে দিয়ে যায়, কোত্থেকে তা জানি না। সারাদিন দাসীর মত সেবা করি এসব বাগবাগিচার।

সংসারে ভোগ নিলেই মুস্কিল। ঠাকুর তাই দাসীর মত থাকতে বলেছিলেন সংসারে। আর বলেছিলেন পুত্রাদিকে পুত্ররূপে ভালবেসো না — মনে কর, ভগবান এইরূপে আছেন আমার সামনে। তাঁর সেবা করা। মৃত্যু সব হরণ করে নিয়ে যাবে তখন দুঃখ হবে। তাই বেদে বলেছেন, ঈশ্বরকে যে প্রিয় বলে — ভালবাসে, সেই প্রিয়ের মৃত্যু নাই, তার জন্য শোক হবে না — 'নহ্ অস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।'

ঋষিরা তাই শিষ্যদের বলছেন, আমি ব্রহ্মকে নমস্কার করে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি। নমস্কার করেও যোগ হয়। গীতায় আছে 'মাং নমস্কুরু' (গীতা ৯/৩৪)। শিষ্যরাও তাই করুক এই অভিপ্রায়। নমস্কার করা মানে শরণাগত হওয়া। 'যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ' — নমস্কারের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এটা সহজ সাধনা।

৫

রাত্রি প্রায় আটটা। মর্টনের চারতলার ছাদে শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। তিনি মাদুরে উপবিষ্ট পূর্বাস্য। জগবন্ধু, শান্তি ও বরিশালের একটি ভক্ত পাশে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। ভক্তরা আসিতেছেন — বড় অমূল্য, তারপর ডাক্তার, বিনয় ও বলাই। তারপর ছোট জিতেন ও বড় জিতেন। আজ অনেকক্ষণ ধ্যান করিতেছেন সন্ধ্যা হইতে। ধ্যানান্তে

শ্রীম গিয়া চেয়ারে বসিয়াছেন, দক্ষিণাস্য। মাদুরে ডাক্তার, শান্তি ও বরিশালের ভক্ত পূর্বাস্য। বড় অমূল্য, বিনয়, ছোট জিতেন উত্তরাস্য। বলাই, জগবন্ধু ও বড় জিতেন, পশ্চিমাস্য বসিয়াছেন। শ্রীম ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, 'মা এখনও আমায় বদলাচ্ছে'। এর মানে humanity-কে (মনুষ্যকে) এই teaching (শিক্ষা) দিচ্ছেন যে সর্বদাই শিক্ষা করা যায়, এর শেষ নাই। কেউ কেউ মনে করে একটু জপ করে, কি একটু (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানের অভিনয় করিয়া) এমন করে, আমার হয়ে গেছে; কিন্তু তা নয়।

তিনি বলতেন, 'কারো আধার এমন (ছোট) কারো এমন (একটু বড়), কারো আরোও বড়, আরোও বড়। ছোট আধার ভরে গেলে আর ধরে না।

কোথায় ধরবে? আধার যে ছোট। ছোট ভাঁড়টি ভরে গেলেই যেন কেউ মনে না করে, আর জল নেই।

ঠাকুর বলতেন, 'এই সব কথা বলছি, কিন্তু ভাণ্ড কোথায়? এইটুকুন ভাণ্ড।

দুই কারণে ধরে না। এক, পাত্র ছোট। আবার হয়তো পাত্র বড়, কিন্তু ওতে হাজাগোজাতে ভর্তি, অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনে পূর্ণ। ভিতরে খালি রাবিশ্। তাইতে ধরছে না। এতে আর কতটুকু চিনি ধরবে? — এইটুকু।

তিনি তাই শেষে বলতেন, 'মা আর বকতে পারি না, শুদ্ধ ভক্ত এনে দাও — তাহলে দু'এক কথাতেই চৈতন্য হয়ে যাবে। অন্যদের (কেশব সেন প্রভৃতির) ওখানে পাঠাও।

ঠাকুর বলতেন, 'সোনা, কারো বিশ মণ মাটির নিচে — কারো দুই এক ঝুড়ির নিচে। কে যায় কোদলাতে বিশ মণ।'

শান্তি — ছোট ভাণ্ড ভরে গেলেই তো হলো, আর কি চাই?

শ্রীম — না, তিনি ইচ্ছা করলে সব পারেন। তাই তাঁকে ইচ্ছাময় বলা হয়। তিনি ছোটকে আবার বড় করে দিতে পারেন। তাই খালি

প্রার্থনা করতে হয়। বেদে আছে, তিনি উঁচুকে নিচু করেন, নিচুকে উঁচু করেন। আবার গানেও আছে — 'তুমি পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি।' ঠাকুর গাইতেন, 'কপালে লিখেছ বিধি, তাই বলবান যদি — কেন তবে তোর শ্রীদুর্গা নাম লবে।'

এই যত ভক্ত দেখুন — যাদের ভিতর ব্যাকুলতা দেখবেন, মনে করবেন, তাদের আধার খুব বড়। তাই কখনও আপশোষ করে বলতেন, 'কাকেই বা বলি, কেই বা শোনে।'

শ্রীম — (ডাক্তার কার্তিকবাবুর প্রতি) বাড়িতে কে আছে?

ডাক্তার — (ভ্রাতুষ্পুত্র) বিশ্বনাথ।

শ্রীম — ওতো এখন লায়েক হয়েছে।

(সহাস্যে) আমাদের একটি কথা মনে পড়ে। একটি boy (বালক ভৃত্য) ছিল, ১৪।১৫ বছর বয়স। শ্যামপুকুরে তখন বাসা। তার মাথায় এমন বড় এক পাগড়ী — হিন্দুস্থানী। একবার দোলপূর্ণিমার দিনে আমাদের নিয়ে গিছলো বেলুড়ে। ওই leader (দলপতি) হয়ে আগে আগে চলছে। Eighteen Ninety-তে (১৮৯০ খৃঃ)। 'ফেরিতে' শালকে গিয়ে, ওখানে থেকে বরাবর হেঁটে। রাস্তায় মারোয়াড়ীদের ঠাকুরবাড়ির উপরে যেতে হলো। রাধাকৃষ্ণ দেখে এলাম। এমন সাজিয়েছে যেন মনে হলো, শ্যামদর্শন করে ওখানে যাচ্ছি। মায়ের বাসা তখন বেলুড়ে। রাস্তায় আমরা এই বিষয় আলাপ করতে করতে গেলাম। সেই রাত্রিতে তখন প্রায় একটা হবে — আবার ফেরিতে ফিরে আসি। বিডন স্ট্রীটের মোড়ের ওখান থেকে খাবার কিনে আনা হয়েছিল। চৌত্রিশ বৎসর হয়ে গেছে।

আর একদিন অনেকগুলি ভক্ত পরিবার কুটুম্বদের নিয়ে নৌকা করে মা ঠাকরুণের নিকট বেলুড় যাচ্ছিলেন। এমন কাণ্ড দেখালে নৌকায়! একজন বসে বসে ভাবছে আর বলছে, 'আমার ইচ্ছা হয় ঐ মেঘের ভিতর দিয়ে চলি।' আর অমনি ঝড়। নৌকা ডুবো ডুবো হলো। কোথায় গেল কবিতা। চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে কপালে হাত দিয়ে কাঁদছে আর গাইছে, 'বিপদে পড়িয়ে ডাকি হে তোমায়।'

এই একটি গানই জানতো — seriously-ই (ব্যাকুল হয়ে) গাইছে।

একজন advise (উপদেশ) করলে, 'নৌকা মাঝখানে নাও, কিনারায় রেখেছ কেন?' তারপর মাঝখানে নিলে ঠাণ্ডা হলো, কাপড়চোপড় সব ভিজে গেল। ওখানে গিয়ে কেউ কেউ নূতন কাপড় পেলো। আর সব শুকুই। আর চা খাওয়া হলো।

জগবন্ধু — কোথায় থাকতেন মা?

শ্রীম — ভাড়াটে বাড়িতে। নড়েভোলা যত ভক্ত — টাকা নাই ভক্তদের এখনকার মত। আজকাল তো মা গেলে পালকিতে যেতেন। আর সঙ্গে সাত আটটা গরুর গাড়ী। তখন মা একবার বৃন্দাবনে এক বছর থেকে এলেন। বর্ধমানে নেমেছেন। হেঁটেই রওনা। এক জায়গায় গিয়ে ক্লান্ত হওয়ায় পুকুরের ধারে বসলেন। একজন ভক্ত পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। তারপর ফিরতি গরুর গাড়িতে পাঁচসিকে কি দেড়টাকা দিয়ে যাওয়া হলো। এখন তো কত ফার্স্ট ক্লাশ। সঙ্গে পুঁটুলী পাঁটুলী কত কি! কোথায় বা ছিল এই সব।

রাখালের শ্রীবৃন্দাবনে অসুখ করলো। কত কষ্ট করে পাঁচ টাকা দেওয়া হলো। বলরামবাবুর কুঞ্জে একবেলা খেতো।

রাত্রি প্রায় পৌণে নয়টা। Gospel of Sri Ramakrishna Part I ('কথামৃত') পড়া হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে। নরেন্দ্রকে বারণ করিতেছেন গিরিশ ঘোষের সঙ্গে বেশী মিশিতে। গিরিশ অনন্যস্মরণ ভক্ত হইলেও গৃহস্থ আশ্রমে রহিয়াছেন। নরেন্দ্রকে দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ এক থাক্ যোগী সৃষ্টি করিবেন। গৃহস্থ ভক্তদের যোগ ভোগ দুই-ই আছে কিন্তু যোগীদের খালি যোগ। তাই নরেন্দ্রকে অত সাবধান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, যারা বেশীদিন কামিনীকাঞ্চন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তারা যেন রসুনের বাটি — হাজার ধুলেও গন্ধ যায় না। তবে জ্ঞানাগ্নিতে জ্বালিয়ে নিলে গন্ধ যায়। কিংবা তারা যেন বেশী বয়সের দামড়া। বেশী বয়সে যে ষাঁড় দামড়া হয়, তার মন থেকে দেহসুখের স্মৃতি যেতে চায় না। তারা যেন কাকে-ঠোকরান

আম। দেবসেবায় লাগে না। বালক সন্ন্যাসী যেন নূতন হাঁড়ি। এতে দুধ রাখলে নষ্ট হয় না। এরা দেবসেবায় লাগে। মনে এখনও কামিনীকাঞ্চনের দাগ পড়ে নাই। ঈশ্বর ইচ্ছা করলে গৃহস্থ আশ্রমে রেখেও যোগীর মত নিষ্কলঙ্ক রাখতে পারেন। আমড়া গাছে আম ধরাতে পারেন। কিন্তু তা অতি বিরল। যোগী আর যোগীভোগী — দুটি আলাদা থাক্। শ্রীম (শান্তির প্রতি) — তোমার জন্য পড়া হলো। তুমি কি করবে — ফার্স্ট ক্লাশ, না সেকেণ্ড ক্লাশ?

শান্তি ডাক্তারী পড়িতেছেন। বিবাহের কথা হইতেছে।

শান্তি — মন যে মানে না।

শ্রীম — সে কি তোমার ইচ্ছা? গুরু যখন হয়েছে তখন তোমার ইচ্ছা আর নাই।

ভক্তরা বিদায় লইতেছেন। শ্রীম জগবন্ধুকে বলিতেছেন, 'আপনার উপর ভার রইল — সকলের নিকট থেকে কিছু কিছু নিয়ে অন্নপূর্ণা পূজায় গদাধর আশ্রমে যেন দেওয়া হয় একসঙ্গে।'

১০-৪-২৪

৬

শ্রীম আপন ঘরে উপবিষ্ট — খাটে পশ্চিমাস্য। শ্রীম-র বাম দিকে বেঞ্চে ছোট জিতেন, জগবন্ধু আর মনোরঞ্জন। হাতে 'ব্রাহ্মধর্ম' — দশম ও একাদশ অধ্যায় পাঠ করিলেন।

ওমিতি ব্রহ্ম... (তৈত্তি ৮ম অনু)। তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি (প্রশ্নো ৬/৬)। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ। (কঠো ১/২/২৩)। ...উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' (কঠো ১/৩/১৪)।

সামান্যভাবে বাংলা অর্থ বলিতেছেন — ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত ও নিত্য। তিনি অজর অমর অভয় ও অমৃত। তিনি রূপ রস গন্ধ শব্দস্পর্শাত্মক এই জগতের অতীত। তিনিই আবার এই জীবজগতের অন্তরাত্মা। অনন্যশরণ হয়ে ঐকান্তিক চেষ্টায় তাঁকে জানা যায়। তাঁকে জানলে অমৃতত্ব লাভ হয় — চির সুখ, চির শান্তি লাভ হয়।

শ্রীম — তরুণ ঋষিরা বড় ঋষিদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। বড়রা ঐ কথা বললেন, নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের কথা। কিন্তু ঐটি ধারণা হচ্ছে না। তাই বলছেন, ওঁকারকে আশ্রয় করে তাঁর ধ্যান কর। শুধু abstract-এর (নির্গুণের) চিন্তা করা সকলের পক্ষে কঠিন। মনের গঠনই এমনি। তাই ওঁকাররূপ প্রতীকের কথা বললেন। এইটিকে ব্রহ্মের symbol (মূর্তি) কল্পনা করে, নিত্য অমৃতাদি গুণ আরোপ করে চিন্তা কর। এই মূর্তিপূজার অর্থ — Philosophy.

দুর্বল মনে প্রথমেই ব্রহ্ম (কি) জিনিষ ধারণা করতে পারে না। তাই এই help-এর — অবলম্বনের প্রয়োজন। চিন্তা করতে গেলে নিরাকার সগুণ পর্যন্ত চলতে পারে। এর উপর গেলে আর খবর পাওয়া যায় না। সে অবস্থা 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার' — অবাঙ্‌মনসোগোচরম্।

বললেন, তোমরা এই পথে খুব সাবধানে চলবে। বড় দুর্গম পথ। ক্ষুরধারের মত তীক্ষ্ণ। একটু অমনোযোগী হলেই বিপদ। ধীর শান্ত একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হও।

উঠে পড়ে লাগতে হয় — সমস্ত শক্তি একত্র করে। With a heart for any fate (যা থাকে কপালে বলে) 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' পণ করে। আঠার মাসে বছর হলে হবে না — এক্ষুনি চাই। লেদারুর কর্ম নয়। কেন এত করে বললেন? রাস্তা যে অতি দুর্গম ও সুদূর — তাই। শিথিল প্রয়াস হলেই আর হলো না। নানা কাজে মন দিলে সোনা গালানো হবে না। এক কাজ এক চিন্তা চাই।

সাধন দু'রকম — বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ। এখানে অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বলছেন। ধ্যান — নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান প্রায় হয় না। তাই নিরাকার সগুণের ধ্যান করতে বলছেন — ওঁকার অবলম্বনে। বেদে ওঁকার ধ্যানই প্রধান।

ঠাকুর বলেছিলেন, শিব, দুর্গা, কালী, বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ যে কোন রূপ তোমার ভাল লাগে, সেইটিরই ধ্যান করবে ঈশ্বরের রূপ জেনে। এও আলম্বন। কারো কারো নিকট আবার এই-ই আলম্বন, এইই উদ্দেশ্য।

ঠাকুর আবার অন্তরঙ্গদের বলেছিলেন, 'আমার ধ্যান করলেই হবে।' বলেছিলেন, 'যে আমার ধ্যান করবে, সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।' অর্থাৎ আত্মদর্শন হবে, ব্রহ্মদর্শন হবে।

নিজেকে নিজে চিনেছিলেন কিনা, তাই এইভাবে বলতেন! নইলে কে বলতে পারে এ কথা। বলতেন, 'মা আমি কি অন্যায় করেছি এই কথা বলে, অর্থাৎ 'আমার ধ্যান করলেই হবে।' আমি তো দেখছি তুমিই সব হয়ে রয়েছো। দেহ মন বুদ্ধি আত্মা সবই তুমি। অন্তরে বাহিরে তুমি।

শ্রীম — শুধু লেকচার, কি পাণ্ডিত্য, কি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, এ দিয়ে তাঁকে লাভ করা যায় না। শরণাগতি আর চেষ্টা, দুটি একসঙ্গে থাকলে হয়। কৃপা ও পুরুষকার দুইই চাই। অন্তরে দৃঢ় সঙ্কল্প — বাইরে প্রচণ্ড উদ্যম। চেষ্টার ত্রুটি থাকলে হবে না। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্।' — না দেখে উঠবো না। এমন চেষ্টা চাই। হাড়ভাঙ্গা খাটুনী চাই। এমন চেষ্টা দেখলে তাঁর কৃপা হতে পারে। তখন তাঁকে লাভ হয়।

ঠাকুর আহারনিদ্রা ত্যাগ করে চেষ্টা করেছিলেন। দিন রাত্রি বোধ ছিল না। সাপ চলে যাচ্ছে উপর দিয়ে, খেয়াল নাই।

শ্রীম একটু চুপ করিয়া আছেন; পুনরায় বলিতেছেন।

শ্রীম — বলেছিলেন, 'আমার এসব নজিরের জন্য। তোমাদের অত করতে হবে না। আমি কে আর তোরা কে এ জানলেই হবে।' অর্থাৎ আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অবতার হয়ে এসেছি, আর তোরা আমার অন্তরঙ্গ। একি সোজা কথা! তাঁর উপর বিশ্বাস এলে তো হয়ে গেল। রামকে অবতার বলে চিনেছিলেন বার জন ঋষি — ভরদ্বাজাদি। কৃষ্ণকেও কয়েকজন চিনেছিলেন — অসিত, দেবল, ব্যাসাদি। তিনি অবতার — এ বিশ্বাস যাঁর হয়েছে তিনি যে তাঁর হাতে। বলেছিলেন, তাদের শেষ জন্ম, যাদের নরলীলায় বিশ্বাস হয়।

এ বিশ্বাস না হলে ঐ — ধ্যান, ভজন, তপস্যা নিয়ে পড়ে থাকা। ঐ চাষার মত — জল আনবো জমিতে তবে নাইবো খাবো। এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প — প্রাণপণ চেষ্টা চাই!

ঈশ্বরে যাদের আন্তরিক বিশ্বাস তাদের মন থেকে সংসার আপনি খসে যায় — অনেকটা আলগা হয়ে যায়। কামিনীকাঞ্চন থেকে মন উঠে যায়। সে খুব কম লোকের হয়।

জানা গেছে ঐ ঘরে ধন আছে। দরজা বন্ধ ভিতর থেকে। কি করা যায় — দরজায় পড়ে থাকা ছাড়া। সত্যাগ্রহ করে পড়ে থাকা। ঠাকুর বলেছিলেন পাখীর কথা। সব দিকে উড়ে কূলকিনারা না পেয়ে মাস্তুলে গিয়ে বসে আছে। যা হবার হবে।

ঐ অবস্থায় অনেকটা শান্তি মনে আসে, আর নির্ভরতা। অবশ্য ঠিক ঠিক শান্তি, নির্ভরতা, বিশ্বাস হয় দর্শন হলে। তার পূর্বে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে পড়ে থাকা। গুরুমুখে যা শোনা গেছে। চেষ্টা করে, সাধন করে, বোধে বোধ করে পড়ে থাকা। দর্শন — এ তাঁর ইচ্ছা।

প্রার্থনাও ঠিক হয় এ অবস্থায়। 'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং' (ছান্দোগ্যো: শান্তিমন্ত্র) — আমি যেন তোমায় না ভুলি। 'ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ' এর অর্থও তাই — মন যেন তাঁতে থাকে। ঠাকুর প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন, 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না মা।' এ অবস্থায়ই ঋষিরা বারবার নমস্কার করছেন — 'তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।'

ঠিক ঠিক প্রার্থনা হয় সিদ্ধাবস্থার পর, কারণ তখন দেখেন কিনা মায়ার কী ভীষণ খেলা! ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'lead us not into temptation, but deliver us from evil:'(St. Matthew 6:13) (তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করিও না; আর পাপের হাত হইতে সর্বদা মুক্ত কর)।

আজের পাঠে সাধ্য, সাধন, সাধক ও ফল একসঙ্গে সব কথা আছে। সাধ্য ব্রহ্ম, সাধন তাঁর ধ্যান, ঐকান্তিক উদ্যমশালী সাধক আর অমৃতত্ব ফল। আজের পাঠটি বেশ। এক জায়গায় সব পাওয়া গেল।

৭

রাত্রি সাড়ে আটটা। চারতলার ছাদে শ্রীম বসিয়া আছেন চেয়ারে। সম্মুখে বেঞ্চিতে ভক্তগণ। বড় জিতেন, ছোট জিতেন, শান্তি, সুরপতি ও সঙ্গী, বড় অমূল্য, ডাক্তার, বিনয়, বলাই ও জগবন্ধু। একটি বৃদ্ধ সাধুও আসিয়াছেন। সন্ধ্যা হইতে ধ্যান চলিতেছিল। গরমও বেশ।

শ্রীম — এই যে মাঝে মাঝে তিনি সাধু পাঠিয়ে দিচ্ছেন, কেন না, আমাদের চৈতন্য হবে বলে। আমরা সর্বদা যেতে পারি না, বুড়ো হয়েছি, তাই তিনি পাঠিয়ে দেন। এঁদের দেখলে মনে হবে ঈশ্বর সত্য, জগৎ অনিত্য। তাঁর কত স্নেহ আমাদের জন্য। তাঁরই ভাবনা বেশী আমাদের জন্য। আমাদের নিজের জন্য নিজের ভাবনার চাইতেও। তাইতো বলেছিলেন, 'তোমায় ওসব ভাবতে হবে না, তুমি খালি তাঁকে ডাক — দেখা দাও, দেখা দাও বলে। চন্দ্র সূর্য জল অগ্নি বায়ু করে রেখেছেন আমাদের জন্য। শস্য ফল ফুল নানা প্রকার খাদ্য — এরও ব্যবস্থা আছে। এগুলি হলো স্থূল শরীরের জন্য। আবার সূক্ষ্ম শরীরের জন্য নানা বিদ্যা সায়েন্স আর্ট ফিলজপি এসব। বিদ্যা মানে তাঁরই করা universal law-গুলি (বিশ্বের নিয়মসমূহ) মানুষ বুদ্ধি দিয়ে বের করেছে। এতেই এক একজন অভিমান করে — আমি মহা বিদ্বান। Law-গুলিও (নিয়মগুলিও) তাঁর, বুদ্ধিও তাঁর। ভিতরে থেকে চালাচ্ছেনও তিনি। এখন আমরা বলছি, আমরা এই বিদ্যার সৃষ্টি করেছি। সৃষ্টি করেছেন তিনি — আবিষ্কার করেছে মানুষ — তাঁরই দেওয়া বুদ্ধিতে। কারণ-শরীরের জন্য সাধু, তীর্থ, দেবালয়, শাস্ত্র করে রেখেছেন। সব perfect arrangement (নিখুঁত ব্যবস্থা)। তিনি বলেন, বিশ্বের জন্য তোমার ভাবতে হবে না, সে ভার আমার। তোমার জন্যও তোমায় ভাবতে হবে না, সেও আমি দেখছি। তুমি শুধু আমার চিন্তা কর। 'For all these things do the Gentiles seek : for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all

these things shall be added unto you.'(St.Matt.6:32/33)

শ্রীম একটু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিতেছেন, 'জগবন্ধুবাবু আছেন? শুনুন তো,' এই বলিয়া নিজে আসন হইতে উঠিয়া উত্তর দিকে জলের ট্যাঙ্কের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং আস্তে আস্তে বলিতেছেন, 'ললিত মহারাজ নিমন্ত্রণ করেছেন অন্নপূর্ণা পূজায়। আমাদের মনে হয় সকলেই কিছু কিছু দিয়ে পাঁচ টাকার একটি sum (মোট) তুলে দিলে ভাল হয়। চার আনা, আট আনা যার যা ইচ্ছে দিবে, জোর না হয়। একে একে ডেকে বলুন। ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়েছিল একবার দক্ষিণেশ্বরে। তিনি বলে দিয়েছিলেন — টাকাকড়ি কারু কাছ থেকে চাওয়া হবে না। যার যা ইচ্ছে দিক।'

শ্রীম আসনে আসিয়া পুনরায় বসিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি, সবিস্ময়ে) — এই দেখুন আকাশ চাঁদ নক্ষত্র সবই তিনি হয়ে রয়েছেন। দেখুন, দেখুন অন্তরে বাইরে। বাইরেও তিনি। আবার ভিতরে কেমন কলটি করেছেন — 'লিভার' 'স্প্লীন' nervous system (স্নায়ুমণ্ডলী)।

এই চাঁদ রোজ দেখছি তাই আশ্চর্য বলে বোধ হচ্ছে না। তাই আমরা আবার নূতন করে দেখতে আরম্ভ করেছি।

তিনি কত কাণ্ড করেছেন, দেখুন! প্রথম হলো — শরীর ধারণের চেষ্টা। তার জন্যই কাজকর্ম — পেটের জন্য। তারপর দ্বিতীয় আবার procreation-এর (সন্তান উৎপাদনের) চেষ্টা। ছানাপোনা তোলানো। শুধু তাই নয় — তাদের আবার খাওয়ানো পরানো। কত বাঁধনে বেঁধেছেন।

আবার এই থেকেই ঈশ্বর লাভও হয়। কি কাণ্ডখানাই তিনি করেছেন!

পুনরায় চুপ করিয়া আছেন। আবার বলিতেছেন।

একটি আম, তার খোসা ফেলে দিয়ে খায়। কিন্তু কাঁচা থাকে সময় ফেলে দিলে কি হয়? Growth (বৃদ্ধি) হয় না।

তেমনি যে 'আমি'তে পতন, আবার সেই 'আমি'তেই তাঁকে লাভ হয়। এই রূপ রস গন্ধ দ্বারাই তাঁর পূজা হয়।

অসময়ে মনকে বিষয় থেকে তুলে আনলে তার growth (বৃদ্ধি) হয় না। ক্রমে মোড় ফিরিয়ে দিলে হয়। তাঁকে প্রার্থনা করলে তিনিই ফিরিয়ে দেন।

(বড় অমূল্যের প্রতি) শাস্ত্রে কি আছে? শাস্ত্র সাধুমুখে শুনতে হয়। আর কাজ করতে হয়। তবে ধারণা হয়। কাজ আর প্রার্থনা।

রাত্রি দশটা — ভক্তরা বিদায় লইয়াছেন। শ্রীম ছাদে দাঁড়াইয়া আছেন — পার্শ্বে জগবন্ধু, বিনয় ও ছোট জিতেন। পূজার চাঁদার সম্বন্ধে কথা হইতেছে। দুই মত হইয়াছে ভক্তদের মধ্যে। একমত — একসঙ্গে পাঁচটি টাকা দিয়া দেওয়া। আর একমত নামে নামে লিখাইয়া দেওয়া। শেষ অবধি দ্বিতীয় মতই স্থির হইল। নামে নামে লিখাইয়া দেওয়া স্থির হইল। এই সব কথা শুনিয়া শ্রীম বলিতেছেন, 'আমার তো তাই ইচ্ছে ছিল। আপনারা বল্লেন, এই রকম। তা আপনাদের মুখ দিয়ে তিনি বলালেন। তা বেশ। ঠাকুরের খাতায় নাম থাকা ভাল। পরে বছর বছর ঐটি দিতে হবে।" ১১-৪-২৪

পরদিন গদাধর আশ্রমে অন্নপূর্ণা পূজা। শনিবার। শ্রীম সকালে গদাধর আশ্রমে যাইবার জন্য বাহির হইলেন। ট্রাম হইতে ফিরিয়া আসিলেন। শরীর বড়ই weak (দুর্বল)। ভক্তদের ভিতর কেহ কেহ গেলেন। পুনরায় অপরাহ্নে চেষ্টা করিয়া পৌণে ছয়টার সময় ভবানীপুর উপস্থিত হইলেন। গদাধর আশ্রমে স্বামী সারদানন্দজী, অখণ্ডানন্দজী ও ধীরানন্দজী পূর্বাহ্নেই আসিয়াছেন। তাঁহারা অতিশয় আহ্লাদের সহিত শ্রীমকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। রাত্রি প্রায় আটটা পর্যন্ত ছিলেন। তারপর ট্রামে তুলিয়া দেওয়া হইল। তিনি একা ফিরিয়া আসিলেন। বিনয়, জগবন্ধু, ছোট জিতেন ও গদাধর রাত্রিতে গদাধর আশ্রমে রহিলেন। মণীন্দ্র তাহাদিগকে জোর করিয়া রাখিয়া দিলেন।

১২ই এপ্রিল, ১৯২৪ খৃঃ।
২৯শে চৈত্র, ১৩৩০ সাল, শনিবার, শুক্লা অষ্টমী।

দ্বাদশ অধ্যায়

উপনিষদের ঋষি শ্রীম (২)

১

মধ্যাহ্নকাল — বারটা। শ্রীম চারতলার ঘরে বসিয়া আছেন। একটি ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। বিছানায় বসা। ভক্তটি গদাধর আশ্রমের প্রসাদ দিলেন। তিনি গদাধর আশ্রমের পূজার বিবরণ শুনিতেছেন। এই প্রসঙ্গে ভক্ত একটি ব্রহ্মচারীর কথা বলিলেন। গতকাল গদাধর আশ্রমে তাঁর সঙ্গে যা কথা হইয়াছিল, শ্রীম এই কথা শুনিয়া বলিতেছেন ঃ

শ্রীম (ভক্তের প্রতি সহাস্যে) — ওর আমেরিকা — ওসব দেশে যেতে ভারি ইচ্ছা, তা না হলে এসব কথা এমন করে বলে কেন?

আমাদের একবার থার্ড ইয়ারে হয়েছিল বিলাত যাবার বাই। সাতকড়িবাবু চেষ্টা করতেন। এই ব্যারিষ্টার, ঐ ব্যারিষ্টারের ওখানে যাওয়া আসা। কত কাণ্ড! তারপর (উন্মুক্ত দীর্ঘ হাস্যের সহিত) — তারপর স্বপ্ন দেখলাম। Mediterranean sea — foggy weather-এ (ভূমধ্যসাগরের ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতে) আমি ঘুম থেকে উঠছি (উচ্চহাস্য)।

ভক্ত — থার্ড ইয়ারে আমরাও তা হয়েছিল।

শ্রীম — পাসপোর্ট হয়েছিল?

ভক্ত — আজ্ঞে, তা হয় নাই; সম্পূর্ণ হচ্ছিল। সব জোগাড় হয়েছিল, যাত্রার সময় পর্যন্ত ঠিক ছিল।

শ্রীম — গ্র্যাজুয়েট যারা তাদের ঐ দেশে যাবার ইচ্ছা সকলেরই হয়।

ভক্ত — কেউ কেউ আবার ঐ দেশের লোক এদেশে আসছে

দেখে আর যেতে চায় না। ওরা আসছে এখানে। ওখানে গিয়ে আর কি হবে? এই ভাবে।

শ্রীম বিশ্রাম করিতেছেন। ভক্তও বিশ্রাম করিতে গেলেন।

বেলা আড়াইটা। শ্রীম-র ঘরে জগবন্ধু প্রবেশ করিলেন। তখনও তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন। বলিলেন, 'আজ জেলে পাড়ার সং দেখে আসুন। আমাদের কাছে describe (বর্ণনা) করবেন।'

একটি ভক্ত অন্নপূর্ণা পূজায় এক টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। সামান্য আয় তার। শ্রীম আজ সকালে তাহাকে ছ আনা ফিরাইয়া নিতে বলিলেন — দশ আনা রাখিলেন।

সং হ্যারিসন রোড অতিক্রম করিয়া আমহার্স্ট স্ট্রীটে প্রবেশ করিয়াছে। মেছুয়াবাজার দিয়া কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে যাইবে। জগবন্ধু শ্রীমকে বিবরণ দিতেছেন — 'সাধের কালজাম', 'ঝাড়ুদারের দল', 'মুচি' এইসব দৃশ্য। বৃহৎ দল। অনেক দৃশ্য। বহু লোকসমাগম হইয়াছে — রাস্তায় চলা যায় না। চৈত্রমাসের দারুণ গরম গ্রাহ্য নাই। ডাব, বরফের সরবৎ, ঘোলের সরবৎ লোকেরা খাইতেছে। এই গরমেও বাড়ির ছাদে, বারান্দায় বহু স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা দাঁড়াইয়া আছে — সামাজিক আনন্দ উপভোগ করিতেছে। শ্রীম বলিলেন — সব দেখতে হয়, তবে তাঁর সম্বন্ধে ধারণা হয়। তিনি কত রঙ্গে আমাদের নাচাচ্ছেন। নাক সিঁটকালে চলবে না। তোমার ভাল লাগে না বলে এর আবশ্যকতা নাই এরূপ মনে করা উচিত নয়। এইসব দেখলে চৈতন্য হয় কিভাবে আমাদের রেখেছেন — কত খেলনা দিয়ে ভুলিয়েছেন।

এগুলি কেন করেছেন? লোকের আনন্দ হবে, এক ঘেয়ে ভাব ভেঙ্গে যাবে। ঠাকুর মেলায় ভক্তদের পাঠাতেন। আবার কিছু কিনে আনতে বলতেন।

তিনিই এখানে এ রূপে খেলছেন। আবার পট পরিবর্তন। অন্যখানে অন্য রূপ। এ বন্দোবস্ত কি মানুষ করেছে? তিনি করিয়েছেন এই organisation-টি (অখিল-জগৎ-রূপ প্রতিষ্ঠান) চালাবার জন্য। এরও

দরকার।

আবার অন্যখানে অন্যরূপ। কাউকে দিয়ে আবার তাঁর চিন্তা করিয়ে নিচ্ছেন। বনে তপোবনে বসে ঈশ্বর চিন্তা করছেন কত কত সাধক। তাঁরাও আনন্দের জন্যই করছেন। তাঁদের ঐতে আনন্দ। তাই 'আত্মরতি', 'আত্মক্রীড়' বলে তাঁদের — যাঁরা শুধু ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন।

এই যে সং; এও সেই আনন্দেরই অংশ — কণামাত্র। ঠাকুর কিছুই বাদ দিতেন না। কি করে দিবেন? মাকে যে দেখছেন সবেতে। মানুষ — দেহ, মন, বুদ্ধি, জীবাত্মা, পরমাত্মা। পরমাত্মা মানে 'মা'। তিনি দেখছেন মা-ই নানা মানুষ, নানা জীব হয়ে নানাভাবে আনন্দ করছেন। তাই ঋষিরা বলেছেন, এ জগৎ তাঁর খেলা — 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'। সাধারণ মানুষ দেখে মানুষের বাহিরটা। বুদ্ধিমান লোকের দৃষ্টি লোকের গুণে। ঈশ্বর-ভক্তের দৃষ্টি মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যের ওপর। ঠাকুরের দৃষ্টি একেবারে মা'র উপর। তিনি দেখছেন মানুষ কিছু করে না। সবই তিনি — মা করছেন। তাই কাকে বাদ দিবেন আর? তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বসংসারই আনন্দের হাট — নিরানন্দ কোথায়?

সং এতক্ষণে মেছুয়া বাজারের মোড়ে আসিয়াছে। চারিটা বাজিয়াছে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের উপরের পশ্চিমের জানালা খুলিয়া শ্রীম সং দেখিতেছেন। যেন বালকের মত — উৎসুক আনন্দে পূর্ণ।

২

'ব্রাহ্মধর্ম'খানা হাতে লইয়া শ্রীম উপনিষদ্ পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। অন্তেবাসী নিকটে বসিয়া আছেন।' দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করিয়াছেন। এবার এক একটি মন্ত্রের সরল অর্থ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বৃক্ষইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।। (শ্বেতা ৩/৯)

শ্রীম — তিনিই এই জগৎটি সৃজন করেছেন — যেখানে যা

দরকার সব দিয়ে সাজিয়ে পূর্ণ করে রেখেছেন — জীবের জন্য। এর ভিতর বন্ধনের বস্তুও আছে, আবার মুক্তির পথও আছে। যার যেমন দরকার নাও। সুখদুঃখ দুই-ই আছে। দুঃখই বেশী — তাঁকে না ধরলে। তাইতো গানে আছে — 'তোমার এ পাগলা গারদে কেহ হাসে কেহ কাঁদে কেহ নাচে আনন্দভরে।' একদিকে হাহাকার, আর্তনাদ, শোকতাপ, মহামারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভূমিকম্প, আগ্নেয় উৎপাত, যুদ্ধ বিগ্রহ এই ভীষণ মূর্তি; অন্যদিকে সং, হাসি তামাসা, নাচগান, বিবাহাদি, আবার ঈশ্বরকে নিয়ে আনন্দোৎসব। এ দু'টিই আছে এখানে।

কিন্তু যিনি এই grand drama-র (মহা নাটকের) কর্তা, তিনি আছেন সাক্ষীর মত — দেখছেন শুনছেন, কিন্তু উদাসীন। যেন বৃক্ষ — নিশ্চল, স্থির — unaffected by these pair of opposite forces (সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বদ্বারা বিচলিত নহেন)। নিজেই actor (নট) আবার নিজেই spectator (দ্রষ্টা)। বহুরূপে খেলছেন। এক হয়ে দেখছেন — সম্পূর্ণ উদাসীন।

এটিও জীবের শিক্ষার জন্য। দুই দিক রাখবার উপায় বলে দিচ্ছেন। এর ভিতর আমার মত থাকতে পারলে বেঁচে যাবে। নচেৎ মুস্কিল। চক্রে পড়ে হয়রান হবে। মানে সংসারে সাক্ষীর মত থাকা। সব করা, কিন্তু ভোগ না নেওয়া। বড় ঘরের দাসীর মত থাকতে বলেছিলেন ঠাকুর। সকলের সেবা কর ঈশ্বর বুদ্ধিতে; কিন্তু benefit (সুবিধা) নিও না। স্থান কাল অবস্থানুযায়ী যতটা দরকার শরীর ধারণের জন্য ততটা নেওয়া। তাও তাঁর কাছ থেকে বলে নেওয়া। সব করা যাচ্ছে, কিন্তু মনটা পড়ে আছে আপনার 'কুটীরে' মানে ঈশ্বরে। শরণাগত, সম্পূর্ণ শরণাগত হলে হয় ঐটি। কঠিন খুবই কিন্তু হয় তাঁর কৃপায়।

স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে॥
(প্রশ্নোপনিষদ্ ৪/৭)

শ্রীম — বনে থাকতেন ঋষিরা তাই এই সব দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছেন। আগে বলেছেন, বৃক্ষের মত সাক্ষী হয়ে আছেন ঈশ্বর। এই মন্ত্র বলছেন বৃক্ষরূপ — তাঁ'তেই আবার জীবকুল আশ্রয় নিচ্ছে। যেমন সন্ধ্যায় পাখীরা সব গাছে আশ্রয় নেয়। নানা পাখী, নানারূপ শব্দাদি। কিন্তু আশ্রয়স্থল এক, সেইরূপ তিনি সকল প্রকার জীবের আশ্রয়। মুমুক্ষু শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন — এটি মনে রেখে চল, শান্তি পাবে। অন্য পথ নাই। ঠাকুরকে দেখেছি ঐরূপ। সেখানে একবৃক্ষে বহু পাখী — বিভিন্ন ভাব ও ভাষা, কিন্তু সকলের আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনি একা।

একোদেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

(শ্বেতা ৬/১১)

শ্রীম — অন্তরে বাহিরে তিনি, জীব জগৎরূপে তিনি, জীব জগতের অন্তরাত্মাও তিনি। জীবজগৎ থেকে উঠিয়ে দৃষ্টি তাঁ'তে নিয়ে যাচ্ছেন। জগৎ অনিত্য, ঈশ্বর সত্য। সত্যস্বরূপ তাঁ'তে মন দাও, এই বলছেন। জীবজগৎ সর্বপ্রকারে তাঁর উপর নির্ভর করছে।

'সর্বব্যাপী' — মানে যতটা space-এর (স্থানের) কল্পনা চলে তিনিও ততটা। কারণ space-ও (স্থানও) তাঁ'তেই রয়েছে। তিনি আবার তারও অধিক। Space-এর (স্থানের) কারণ তিনি, সর্বভূত সর্বজীব all living beings — তাঁদেরও কারণ এবং চালক তিনি।

Space (স্থান) দিয়ে খুঁজতে যাও, ঘুরে ফিরে তাঁ'তে আসতে হবে। ঐ 'এক দেব'-এ। প্রতি জীবের ভিতর দিয়ে দেখ — ঐ একজনকেই দেখতে পাবে। হঠাৎ এককথায় বিশ্বাস হয় না। মন বিচার করে — এ তার স্বভাব। তাই মনবুদ্ধিকে এক একটা বড় বড় জিনিষের ভিতর দিয়ে নিয়ে ঋষিরা দেখিয়েছেন ঐ একজনকেই। Intellectually (যুক্তি দিয়ে) বোঝাচ্ছেন শিষ্যদের।

তিনি যদি এক বহুর মধ্যে, তবে দেখতে পাই না কেন? এর উত্তর বলছেন, 'গূঢ়' মানে লুকিয়ে আছেন — প্রচ্ছন্ন। দেখা যায়

দেখবার উপায় অবলম্বন করলে। আমরা দেখেছি। তোমরাও দেখতে পাবে ঐ পথ ধরে। এই হলো direct evidence (প্রত্যক্ষ অনুভবের কথা)।

তিনি 'কর্মাধ্যক্ষঃ'। 'কর্ম' মানে এই organisation-টি (সৃষ্টিটি) এই universe (বিশ্ব) এর 'অধ্যক্ষ' — মানে পরিচালক। এও তিনি। সকল কর্মের কর্তার ন্যায় এই কর্মটির কর্তা, পরিচালক তিনি। পৃথক পৃথক দৃষ্টিতে দেখ — space, species (স্থান ও বিভিন্ন জাতি) প্রভৃতির দিক দিয়ে — তাদেরও শেষ তিনি। Collective view-তে (সমষ্টি দৃষ্টি দিয়ে) দেখ, তারও কারণ তিনি। Analytical and synthetic view (ব্যষ্টিভাবে দেখ কি সমষ্টি ভাবে দেখ) দু'দিক দিয়েই গিয়ে তাঁ'তেই পৌঁছাতে হবে।

'সর্বভূতাধিবাস' — সকল জীবের বাসস্থল তিনি। শেষ আশ্রয় স্থল তিনি। জীবগণ থাকে কোথায়? — আপন আশ্রয়ে। আশ্রয় আছে বিশ্বে — বিশ্ব আছে তাঁ'তে। তাই সর্বভূতের অধিবাস তিনি।

যদি বল জল, বায়ু, অগ্নি, সূর্য, খাদ্য, প্রাণ, মন এ দিয়ে জগৎ চলছে। কি দরকার তাঁকে মানবার? তার উত্তর — এ সকলেরও কারণ তিনি। তিনি আছেন বলে, তাঁর ভয়ে ও ব্যবস্থায় এসব আপন আপন কাজ করছে। প্রমাণ কি? উত্তর — আমরা দেখছি চোখের সামনে। মনের ভুলও হতে পারে — নরেন্দ্র বলেছিলেন। ঠাকুর বললেন, তা কেমন করে হয়! — মিলে যাচ্ছে যে। দর্শন, উপদেশ আর বাহ্য কাজ — তিনটিই মিলে যাচ্ছে। তাঁরা দর্শন করেছেন, তিনি সকলের কারণ। তাঁকে জেনে তাঁদের পরম শান্তি ও সুখ লাভ হয়েছে। অতএব তুমিও দর্শন কর — সুখ শান্তি লাভ করতে পারবে। দর্শন, উপদেশ, আর কার্য — সুখশান্তি লাভ। এ মিলে গেল! কি করে বলা যায় মনের ভুল — Hallucination?

'সাক্ষী' তিনি — মানে indifferent (উদাসীন)। সব করছেন, অথচ সাক্ষী। Affected (বিজড়িত) নন। যেমন ঠাকুর বলতেন, মুখে বিষ রয়েছে কিন্তু সাপ affected (বিষদুষ্ট) হচ্ছে না — তেমনি।

এবার স্বরূপ-লক্ষণ বলছেন। তিনি ‘চেতা’ — চৈতন্যস্বরূপ। তাই ‘সাক্ষী’। সম্পূর্ণ মন তাঁ’তে গেলেই সাক্ষীত্ব লাভ হয়। তা হয় তাঁর দর্শনের পর ঠিক ঠিক। সাধনের অবস্থায় গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে চলা চাই।

‘কেবলো’ — মানে একা, alone — অসঙ্গ। Loneliness (নির্জনতা, শান্তি) তাঁর স্বরূপ। সমস্ত জগৎ, সমস্ত চিন্তা renounce (পরিত্যাগ) করে ঐ এক চিন্তা করলে হয়। কথায় বলে, ‘কেবল এক চিন্তা’ — মানে একমাত্র ঈশ্বর চিন্তা। মানুষ যেমন সঙ্গী, চিন্তাও তেমনি সঙ্গী। সব চিন্তা, সব সঙ্গী ছেড়ে ‘কেবল চিন্তা’ — ঈশ্বর চিন্তা। তবে কৈবল্য লাভ হয়।

‘নির্গুণ’। তিনি সত্ত্ব, রজঃ তমের অতীত, ত্রিগুণাতীত। গুণেতে বদ্ধ হয় জীব। তিনি বদ্ধ নন, তাই নির্গুণ।

‘সাক্ষী, চেতা, কেবল, নির্গুণ’ এইগুলি তাঁর গুণ আরোপ করে বলা হয়েছে। মুখে বলতে হলে এরূপ বলা যায়। তাঁর স্বরূপ মুখে বলা যায় না — বলতে হলে nearest approach (নিকটতম বর্ণনা) এই। সিদ্ধ অবস্থায় এ ঠিক ঠিক বোধ হয়। ঠাকুরের এ সব অবস্থা হয়েছে।

সাধকের পক্ষে এই beacon light (দিশারী আলোক) সামনে রেখে চলা।

সর্বা দিশ ঊর্ধ্বমধশ্চ তির্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড়্বান।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিঃ স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ।।

(শ্বেতা ৫/৪)

শ্রীম — সূর্য যেমন নিজেও প্রকাশিত হন, আর জগৎকেও প্রকাশিত করে বিরাজমান সেইরূপ। তাঁর অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব। তিনি আছেন তাই সব আছে বলে মনে হয়। বস্তুতঃ এসব কিছুই নাই। কেবল তিনি আছেন। তিনি জগতের যোনিঃ, উৎপত্তি স্থল। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় তিনটিই তিনি করছেন। তাই তিনি বরেণ্য, মানে সকলের পূজনীয়। ‘ভগবান্’ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন। যেমন জ্ঞান,

তেমনি ক্রিয়াশক্তি। কি বিচিত্র, এ জগতের plan (পরিকল্পনা)! Scientist-গণ (বৈজ্ঞানিকগণ) অবাক হয়ে থাকে এই engineering skill (সৃজন কৌশল) দেখে। আবার ক্রিয়াশক্তি কি প্রচণ্ড! তাঁর ভয়ে সূর্য, অগ্নি, পবন, মেঘ, যম, আপন আপন কাজে নিযুক্ত। একটুও গোলমাল হচ্ছে না। Organisation (সঙ্ঘ, সৃষ্টি) চালাতে হলে বুদ্ধিমান ও কর্মশক্তিসম্পন্ন লোকের দরকার। এই বিশ্বটি তিনি নিঃশ্বাসের মত চালাচ্ছেন। তাঁর জ্ঞান ও ক্রিয়া কি অদ্ভুত! Planning and execution (পরিকল্পনা আর পরিচালনা) দুইই marvellous (বিস্ময়কর)।

আমাদের সংশয় যেতে চায় না কি না তাই নিজেদের বুদ্ধিমান, শক্তিমান মনে করি। এজন্যই বলছেন, বুদ্ধি ও শক্তির দিক দিয়ে যাও, — এতেও শেষে তাঁ'তেই পৌঁছাবে।

৩

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ॥ (শ্বেতা ৪/১৯)

শ্রীম — প্রথম লাইনটির অর্থ হলো, তিনি এত বড় যে এই সুবৃহৎ বিশ্বের কোনও বস্তু দিয়ে তাঁকে বোঝান যায় না। না কোনও স্থান দিয়া সীমাবদ্ধ করা যায়। তিনি অপ্রতিম — অতুলনীয়। তুলনা সমান বস্তুতে হয়। তাঁর সমান কিছুই নাই, তাই তুলনা হয় না। বিচারের দিক দিয়ে গেলে এই দাঁড়ায়। জগৎ Time, space and causality (স্থান, কাল ও কার্যকারণ সম্বন্ধ) এই তিনটি নিয়ে জগৎ। এই জগতের কারণ তিনি। তাই এ দিয়ে তাঁকে বোঝান যায় না। তাঁর তুলনা তিনি নিজে।

কিন্তু ভক্তির দিক দিয়ে দেখ — এই তিনিই মানুষ হয়ে আসেন, অবতার হয়ে — যেমন ঠাকুর। তিনি বলেছেন, আমি ঈশ্বর — অবতার। মানুষের বানানো নয়। তিনি অত বড় বলেই আসেন ছোট হয়ে জীবের কল্যাণের জন্য। তাঁর স্বরূপ অবস্থা জীবের কল্পনার

অতীত। তাই রূপ রস শব্দাদির ভিতর আসেন। এই দিয়ে ক্রমে তাঁর জ্ঞান হবে।

'মহদ্ যশঃ', of grand fame (যার সুখ্যাতি অনন্ত)। লোকে একটা কাজ করে যশ অর্জন করে — যেমন তাজমহল। যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন — তাঁর কত বড় যশঃ, তাই 'মহদ্ যশঃ' বলেছেন ঋষিরা। এই আকাশটির দিকে চেয়ে দেখ না কি কাণ্ডখানা করেছেন! দিনে সূর্য — ব্যাপারটি কি ভেবে দেখ। রাত্রে অগণিত নক্ষত্র। এসব সেই grand architect-এর (বিশ্বকর্মার) যশ কীর্তন করছে। বিশ্ব তাঁর যশস্তম্ভ।

> ন সদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
> হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥
>
> (শ্বেতা ৪/২০)

শ্রীম — এই চক্ষুদ্বারা ঈশ্বরদর্শন হয় না। ঠাকুর বলতেন, সাধনভজন করতে করতে একটি শরীর তৈরী হয় — ভাগবতী তনু। তাঁতে সব আছে ইন্দ্রয়াদি। সেই শুদ্ধ চক্ষুর গোচর। যে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়ে এই রূপরসাদি বিষয় গ্রাহ্য হয় তা অশুদ্ধ। এদিয়ে শুদ্ধস্বরূপ ভগবান দর্শন হয় না। এগুলিই মোড় ফিরিয়ে দিলে তাঁর দিকে, শুদ্ধ হয়।

'রূপ' — মানে সাকার নিরাকার দুই-ই রূপ। নিরাকারও রূপ। তিনি সাকার নিরাকার দুই-ই। এখানে নিরাকার রূপের কথা বলছেন। হাত, পা, মুখ — অর্থাৎ রূপ নাই। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ — এটিও রূপ — ভাবরূপ। কি সাকার, কি নিরাকার কোন রূপই এই ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রাহ্য নয়।

ঠাকুর কিন্তু বলেছিলেন, 'এই চক্ষে তাঁকে দেখেছি। এখন আর ওরূপ দেখা যায় না। ভাবে দর্শন হয় এখন।' এরূপ কেন বললেন তবে এ চক্ষে দেখেছি? তার মানে আছে। এ অতি উচ্চাবস্থার কথা। এক অবস্থায় normal state-ই (সাধারণ অবস্থাই) ছিল তাঁর ভাবাবস্থা। সর্বদাই contact point-এ (সংযোগস্থলে) থাকতেন

তখন — meeting place of the two circles (ঈশ্বর ও জগৎ এই চক্রদ্বয়ের সংযোগস্থল)। একটি চৈতন্য, আর একটি জগৎ। ভাব চক্ষুই তখন তাঁর normal (সর্বদার) চক্ষু ছিল।

'এখন আর ওরূপ দর্শন হয় না, ভাবে দর্শন হয়' — মানে ঐ পূর্বের অবস্থায় থাকলে আর লোকশিক্ষা হয় না। তাই নিচে নেমে এসে ভক্তদের সঙ্গে মিশতেন। অত উঁচু পরদায় ভক্তরা ধরতে পারে না, তাই নিচে নেমে এসেছেন। এ জগতের কল্যাণের জন্য। ছাগলদের সঙ্গে কথা কইতে হলে 'বুরুর্-বুরুর্' করতে হয়। এও সেইরূপ।

নির্বিকল্প অবস্থা, সবিকল্প অবস্থা, আর সহজ অবস্থা — সাধারণ মানুষের অবস্থা। এ তিন অবস্থার ভিতর দিয়ে 'বাইচ' খেলতেন, নৌকার বাইচ খেলা যেমন।

কিন্তু সাধারণ জীবের তা হয় না। অবতারাদিরই সম্ভব। জীব একবার উঠলে আর প্রায় ফিরে না। অবতারাদির লোকশিক্ষার জন্য এ করতে হয়। পাকাগুটি কাঁচিয়ে থাকা তাঁদের।

তাই বলতেন, সাধারণ জীবের সাধন-ভজন করে শুদ্ধচিত্ত হলে তাঁকে দেখা যায়। সে হয় নিয়মিতভাবে ধৈর্য ধরে তাঁর চিন্তা করতে করতে। নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত চিন্তা। তাতে বুদ্ধিও শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধ বুদ্ধিতে তিনি প্রকাশিত হন। ময়লা আরশির উপর তাকালে মুখ দেখা যায় না। স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করে ফেল — তখন মুখ দেখা যাবে। এও তেমনি। কামিনীকাঞ্চনের ময়লা — ভোগবাসনার ময়লা। তাঁর চিন্তা করলে এ দূর হয়ে যায়। তখন তাঁকে দেখা যায়।

শুদ্ধ বুদ্ধিতে দর্শন হয়। আরো আগে আছে — শুদ্ধ বুদ্ধিই শুদ্ধ আত্মা। গঙ্গা সাগরে পড়লে যা হয়। তাই extreme purification of the mind is God (চিত্তশুদ্ধির চরম অবস্থার নামই ঈশ্বর)।

তবে আন্তরিক হওয়া চাই সাধন। Head and heart (বোধ-শক্তি ও হৃদয়মন) এক হলে হয়। তাই ঠাকুর বলতেন, ব্যাকুলতা চাই। এর পরের stage-ই (অবস্থাই) দর্শন — যেমন sunrise follows dawn (অরুণোদয়ের পরই সূর্যোদয়)। দর্শন হলেই অমৃতত্ব

লাভ। এই চরম লক্ষ্য মানুষের।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।।

(কঠো ১/২/৭)

শ্রীম — ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য — বহু ভাগ্যে এ বোধ হয়। তখনই সদ্‌গুরু লাভ হয়। ভগবানই গুরু। তিনিই দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেন। তাঁর commission (আদেশ) নিয়ে কেউ কেউ তাঁর কথা লোকদের বলেন। এরূপ ব্যক্তি যখন ঈশ্বরের কথা বলেন — যেমন শুকদেব, তা'তে আর ভ্রমপ্রমাদ থাকে না, — ঠিক ঠিক বলেন। এরূপ লোক সুদুর্লভ। তাই বলেছেন 'আশ্চর্য', মানে wonder of the spiritual world (আধ্যাত্মিক জগতের বিস্ময়)।

সংসারে লোক সব আছে কামিনীকাঞ্চন নিয়ে ভুলে। তাদের অবসর নাই ঈশ্বরের কথা শুনতে। দু'চার জন শুনে — চেষ্টা করে পেতে। কেউ কেউ দর্শন পায় — very few (অতি অল্প লোক)। তার মধ্যে লোকশিক্ষার আদেশ পায় আরো few (অল্প)।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে ব্রহ্ম গুরুর শাসনে থাকতে হয় — তবে লাভ হয়।

অজ্ঞ, ব্যাকুল ও ব্রহ্মজ্ঞ — এই তিন ক্লাশ লোক। অজ্ঞই প্রায় সব। শেষের দু ক্লাশ rare (দুষ্প্রাপ্য) তাই 'আশ্চর্য' — ব্যাকুল ভক্ত আর সব ব্রহ্মদ্রষ্টা। দ্রষ্টাদের মধ্যে আবার লোকশিক্ষার জন্য আদেশপ্রাপ্ত আরোও কম — তাই অতি আশ্চর্য।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।।

(কঠো ২/১/২)।

শ্রীম — তাঁকে যারা চিন্তা না করে তাদের 'বালাঃ' — শিশু (babies) অর্থাৎ অজ্ঞান বলা হয়েছে। কামিনীকাঞ্চন নিয়ে যারা আছে কেবল, তারা বালক। শুধু worldly-wise (বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন) যারা তাদের স্থান ওখানে নাই। ঠাকুর বলতেন, 'চিঁড়া ভেজা বুদ্ধির

কর্ম নয়। চিঁড়া ভেজানোর জন্য জলো পাতলা দইয়ের মত বুদ্ধি অর্থাৎ বিষয়বুদ্ধি। যে বুদ্ধি দিয়ে কেবল ধন, মান, উপার্জন হয়, যা দিয়ে পাণ্ডিত্য লাভ — জজ, ব্যারিষ্টার হয়, কিন্তু ঈশ্বরে মন যায় না, এরূপ বুদ্ধি অতি হাল্কা বুদ্ধি। তা দিয়ে ঈশ্বর লাভ হয় না।

সংসারের দৃষ্টিতে বড় হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে শিশু — বালক। বালকের সরলতা, নির্ভরতা এসব ভাল গুণও আছে। কিন্তু এখানে দোষের কথা বলেছেন — অজ্ঞতার কথা। তাই ঠাকুর বলতেন, শুধু পণ্ডিতগুলোকে খড়কুটোর মত বোধ হয় — trifle (তুচ্ছ)। কিন্তু বিবেক বৈরাগ্য থাকলে ভালবাসতেন।

এরূপ কামিনীকাঞ্চনাসক্ত-চিত্ত ভোগীদের কি দুর্দশা হয় তাও বলছেন। তারা জন্মমৃত্যু-চক্রে পতিত হয়। বারবার দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে। 'বিততস্য পাশম্' — বিস্তীর্ণ মৃত্যুপাশে পতিত হয়। নিষ্কাম মন না থাকলে এটি হয়। সকাম হলে মৃত্যুর এলাকায়। যতদূর পঞ্চভূতের zone (এলাকা) ততদূরই মৃত্যুর jurisdiction (সীমানা, অধিকার)। তাই 'বিততস্য' বলেছেন। ঈশ্বর আর জগৎ — ঈশ্বর অমৃতত্ব — জগৎ অনিত্য, তাই মৃত্যুর অধীন।

যারা যথার্থ wise (জ্ঞানবান), তারা শান্ত, ধীর। তাদের বোধ হয়েছে সংসার অনিত্য, ঈশ্বর সত্য। তাই অনিত্য সংসারের কিছু চায় না। চায় কেবল জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য। কেন চায় এসব এতে 'ধ্রুবং, অমৃতত্বং' লাভ হয় — everlasting freedom from death (মরণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ), অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ হয়।

> যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং। (বৃহ ২/৪/৩)।
> অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
> মৃত্যোর্মামৃতং গময়। (বৃহ ১/৩/২৮)।
> আবিরাবীর্মএধি।*
> রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥(শ্বেতা ৪/২১)

---

*আবিরাবীর্মএধি — ঋগ্বেদ, (বাহ্বর্চ উপনিষদ - প্রার্থনা মন্ত্র)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যা ঈশ্বর লাভের সহায় নয় সে জিনিষ দিয়ে কি করবো? চাই না উহা। কেবল ঈশ্বরকেই চাই। মৈত্রেয়ী পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে তাই বললেন, তোমার প্রদত্ত বিত্তে যদি ঈশ্বরলাভ না হয় তাহলে এই বিত্ত আমি চাই না। যাতে তাঁকে লাভ হয় সেই উপায় বল। ব্যাকুল ভক্তের এই প্রার্থনা।

ঋষিগণ আবার প্রার্থনা করছেন, হে ঈশ্বর এই সংসার অনিত্য, অজ্ঞানতার ও মৃত্যুর লীলাভূমি। এখানে মনের অপব্যবহার হয়। তাই অশান্তি। কৃপা করে এই মনকে আপনার শ্রীপাদপদ্মে স্থান দিন। আপনি সস্বরূপে দর্শন দিন। আর সর্বদা প্রসন্ন হয়ে আমাদের রক্ষা করুন।

এটি ঋষিদের universal prayer, সার্বজনীন সকলের প্রার্থনা। ঋষিরা তাঁকে দর্শন করার পরও এই প্রার্থনা করেছেন। তবে অপর লোকও প্রার্থনা করবে। আর দেখছেন কিনা চোখের সামনে কি কাণ্ডখানা চলছে তাঁর অঘটনঘটন-পটিয়সী মায়ার! তাঁরা ঈশ্বরের অতি নিকটে থেকে ঐ মহাশক্তির খেলা দেখে তবে এই ব্যাকুল প্রার্থনা করছেন। বলছেন, হে প্রভো, আপনার রুদ্ররূপ দেখে ভয় হচ্ছে, সৌম্যরূপ ধারণ করুন। রুদ্ররূপের দরকার কাজ করতে হলে, জগৎ চালাতে হলে। ভক্তরা কিন্তু সৌম্যরূপ চায়। অর্জুনও বলছেন, 'সৌম্যবপু' (গীতা ১১/৫০) ধারণ কর। জগৎলীলার প্রতীক মা কালীর মূর্তি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তিনটি ভাবই ঐ মূর্তিতে আছে। মায়ের হাতে খড়্গ ও নৃমুণ্ড আছে। তেমনি বর ও অভয় মুদ্রাও আছে। ভক্তগণ এই প্রসন্ন সৌম্যরূপ চান। এ না হলে পালন কার্য হয় না।

এই প্রার্থনা করছেন যাঁরা তাঁকে দর্শন করেছেন। তাঁরা সম্যক বুঝেছেন, তিনি কৃপা না করলে, তিনি রক্ষা না করলে, এখানে রক্ষার আর কেউ নেই। তাই ব্যাকুল হয়ে এই প্রার্থনা করছেন। সিদ্ধ হলেও ভয় এই সব দেখে। শরীর থাকলেই ভয়, মায়ার অধীন যে। ঠাকুর তাই বলেছেন, 'মহামায়ার কাজ বুঝতে যেয়ো না। এলোমেলো — বুঝতে পারবে না। তোমার নিজের কার্যসিদ্ধি কর। করজোড়ে প্রার্থনা

কর ব্যাকুল হয়ে, 'তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। মা শরণাগত শরণাগত।' শরীর ত্যাগের কিছুদিন পূর্বেও বললেন, 'সব তাঁর অণ্ডারে (under)। এখনও আমায় বদলাচ্ছে।'

ক্রাইস্ট প্রার্থনা করছেন, Lead us not into temptation but deliver us from evil (St. Matthew 6:13) — ভুলাইও না মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলাইও না।

ঠাকুরের প্রার্থনা, 'দেহসুখ চাই না মা, লোকমান্য চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা। শতসিদ্ধি চাই না মা। তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধাভক্তি হয়। আর এই করো যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।'

যাদের ঈশ্বর দর্শন হয় নাই, অথচ সাধনভজনে লেগে আছে, অনেকটা এগিয়েছে তারাও আকুল হয়ে এই প্রার্থনা করে। সাধন-ভজন করতে করতে বোধ হয় সংসার অনিত্য। তখন সর্বত্র মৃত্যুর ছাপ দেখতে পায়। কেননা নিজের মৃত্যু দেখে কিনা সর্বদা সামনে। তখন আপনি প্রাণ থেকে এই প্রার্থনা হয়। যাদের ঈশ্বরে অস্তিত্ব বোধ হয় নাই কতক তাদেরও মৌখিক প্রার্থনা করা উচিত, গুরু বাক্যে বিশ্বাস করে। প্রথম অভ্যাস, পরে আন্তরিক হবে।

আবিরাবীর্মএধি — হে প্রভো, আমায় দর্শন দাও। দেখা না দিলে দেখা যায় না। তাই এরূপ প্রার্থনা। দর্শন হলে শাশ্বত সুখ-শান্তি লাভ হয়। সব দুঃখ দূর হয়।

এখন অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। ভাই ভূপতির একজন ভক্ত আসিয়াছেন। ইনি 'গুরুপদ ভরসা কর' এই গানটি রচনা করিয়াছেন। শ্রীম-র ভক্তসভায় কখনও উহা গীত হয়। তাঁর সঙ্গে আসিয়াছেন তাঁর বন্ধু নরেন। নরেন এম.এ. পাশ। সাময়িক বৈরাগ্যবশতঃ গৃহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু দুই মাস পরেই গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। শ্রীমকে দর্শন করিতে আজ নরেন আসিয়াছেন। গৃহত্যাগের পূর্বেও শ্রীমকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীম উপদেশ দিয়াছিলেন আরও কিছুকাল গৃহে অপেক্ষা করতে আর কয়েকজনের সঙ্গে দেখা ও পরামর্শ

করতে। কিন্তু ভাবের আবেগে অসময়ে গৃহত্যাগ করেন। তাই স্থায়ী হয় নাই বৈরাগ্য। বাড়িতে ফিরিয়া আসিবার পর আজ প্রথম আসিলেন দেখা করিতে। নরেন বলিতেছেন, নিচে মোটরে তাঁর স্ত্রী, শাশুড়ী ও খুড়ীশাশুড়ী রহিয়াছেন। অনুমতি হইলে এঁরা আসিয়া শ্রীমকে দর্শন করিবেন। শ্রীম-র কছে শান্তি ও জগবন্ধু রহিয়াছেন। আর উপরে স্ত্রীলোকদের আসা নিষেধ। শ্রীম ভাবিত হইয়া পড়িলেন। অগত্যা এই সপ্ততিবর্ষ বয়সেও ভক্তদের দর্শন দিতে চারতলার হইতে একতলায় নামিয়া গেলেন।

এখানে ভক্তসভায় স্ত্রীভক্ত আসেন না। কোনও স্ত্রীভক্ত দর্শন করিতে আসিয়াছেন সংবাদ পাইলে তিনতলায় স্ত্রীমহলে গিন্নিমার কাছে যাইতে বলেন। শ্রীম একবার নিচে গিয়া দাঁড়াইয়া দু'চারটি কথা বলিয়া আসেন। আজ বাড়ির মেয়েরা নিচে নাই তাই ভাবিত হইয়া নিজেই নিচে নামিয়া গেলেন।

আমহার্স্ট স্ট্রীটের ফুটপাথে শ্রীম দাঁড়াইয়া আছেন, মর্টন স্কুলের সম্মুখে। মেয়েরা মোটর হইতে নামিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। তাঁদের গাড়ী চলিয়া গেল।

শ্রীম পূর্ব ফুটপাথ দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতেছেন, সঙ্গে শান্তি ও জগবন্ধু। ডাক্তার পি.ডি. বোসের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। একটি বৃদ্ধের সঙ্গে আনন্দে রহস্যালাপ করিতেছেন। বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন। শ্রীম-র হাসি ধরে না। তীব্র হাস্যের সহিত বলিতেছেন, এই লোকটার 'নাং' বাই আছে। ইনি মনে করেন এর মা, বউ, মেয়ে সকলে 'নাং' করে। ওরা সব ভালমানুষ — ওরাই খাওয়ায়। এই রকম করে করে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে। কারোও সঙ্গে থাকতে পারে না — পৃথক খায়।

শ্রীম নববিধান ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া আছেন পশ্চিমদিকে। ধ্যান করিতেছেন। আজ রবিবারের সম্মেলন। সাড়ে সাতটায় উঠিয়া মেছুয়া বাজার দিয়া ঝামাপুকুর রোডে প্রবেশ করিলেন। রাস্তায় যাইতে যাইতে ঠাকুরের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানগুলি দর্শন ও প্রণাম

করিতেছেন। অদূরে ঈশান মুখুয্যের বাড়ি, রাস্তার পাশেই রাজা দিগম্বর মিত্রের প্রাসাদ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভাড়াটিয়া বাড়ি ২৭নং ঝামাপুকুর, রামকুমারের টোল তারপর ঠাকুরের বাসস্থান। মোড় হইতে আর. মিত্রের বাড়ি দেখাইয়া বলিলেন, এখানে ঠাকুর এসেছিলেন এইটিন এইটি ওয়ানে (১৮৮১) আমার যাওয়ার দু'মাস আগে।

এতক্ষণে ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে আসিয়া পড়িলেন। মাকে প্রণাম করিয়া চরণামৃত লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের পশ্চিম ফুটপাথ দিয়া। বাম হাতে রাস্তার উপর একটি মিষ্টান্নের দোকান। নানা রং-এর প্রচুর হিন্দুস্থানী মিষ্টান্ন দিয়ে দোকানটি সাজিয়েছে। ইহারই উপর তলায় 'মহৎ আশ্রম' নামক বিখ্যাত হোটেল। সঙ্গীদের শ্রীম আনন্দে বলিতেছেন, 'দেখুন কি সুন্দর করে রেখেছে! রূপ আছে, রস আছে, গন্ধ আছে, আবার স্পর্শও আছে। (একটি ভক্ত বলছেন, খেতে শব্দ হয়) তা হলে শব্দও আছে। একই জিনিষে সবই আছে। সব দিক থেকে আক্রমণ করছে মনকে। রক্ষে যদি কেউ এই সবে তাঁর রূপ আরোপ করতে পারে তাঁর কৃপায়, আর অভ্যাসের দ্বারা।'

চলিতে চলিতে পূর্ব ফুটপাথের লাহাদের বাড়ি দেখাইয়া সহাস্যে বলিতেছেন, 'ছেলেবেলায় এখানে পাল্কি করে মা'র সঙ্গে এসেছিলাম নেমন্তন্ন খেতে'। এইবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন। দাঁড়াইয়া তিন চার মিনিট দর্শন করিলেন। আচার্য বেদি হইতে প্রার্থনা করিতেছেন। এইবার রাস্তা পার হইয়া পূর্ব ফুটপাথে আসিতেছেন। জগবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই বাড়ি কার?' শ্রীম উত্তর করিলেন, 'আগে ছিল গোবিন্দ ডাক্তার নামে এক ভদ্রলোকের। তখনই আমি এসেছিলাম। তখন আমার বয়স বছর চারেক। তারপর hand change (হস্তান্তর) হয়ে এখন লাহাদের হয়েছে।'

শঙ্কর ঘোষের লেন দিয়া শ্রীম পূর্বমুখী চলিতেছেন। বামদিকে বিদ্যাসাগর কলেজ। ডানদিকের একটি বাড়ি দেখাইয়া বলিলেন, এইটি শঙ্কর ঘোষের বাড়ি — খোকা মহারাজের পূর্বপুরুষ। ইনিই

এই কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। এবার রাস্তার শেষ প্রান্তে আসিয়াছেন — সম্মুখে গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। বাম হাতে খোলার ঘরে মুড়ি-মুড়কির দোকান একজন উৎকলবাসীর। তার সম্মুখে কয়েকজন উৎকলবাসী দাঁড়াইয়া আছে, শ্রীম তাদের দেখিতেছেন। ডান হাতে অমূল্য ডাক্তারের বাড়ি। শ্রীম দাঁড়াইয়া পড়িলেন, বলিতেছেন, 'দেখুন 'মানুষ' — কি আশ্চর্য জিনিষ তিনি করেছেন। এই রক্তমাংসের শরীর তাতে আবার ঈশ্বরদর্শন কত কি হয়! কেন করেছেন এইসব কে জানে?' শ্রীম নিজের ঠাকুর বাড়িতে প্রবেশ করিলেন গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে। ভক্তদের বলিলেন, 'আপনারা এগোন স্কুলবাড়ি — possible (সম্ভব) হলে আমি আসছি খেয়ে।'

মর্টন স্কুলের ছাদে ভক্তগণ অপেক্ষা করিতেছেন। ডাক্তার, বিনয়, বড় অমূল্য, উকীল ললিত ব্যানার্জী, অমৃত, ছোট জিতেন, বলাই, গদাধর, শান্তি, জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়াছেন। শ্রীম আসিয়াছেন — ছাদে চেয়ারে বসিয়াছেন — উত্তরাস্য। ক্ষণকাল পর কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কি আশ্চর্য কথাই ঠাকুর বলেছেন। প্রথম আশ্চর্য দেখ — তিনি বলেছেন, গৃহীদের মাঝে মাঝে নির্জনবাস করা উচিত। দ্বিতীয় — সব ধর্মেই তাঁকে পাওয়া যায়। তৃতীয় — ঈশ্বরদর্শন মনুষ্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। চতুর্থ — ঈশ্বর শুধু দেখা দেন না আবার কথা কন। এতো emphasis (জোর) দিয়ে আর কেউ এ কথা বলেন নাই। অনেক বই খুঁজে দেখলাম। বাইবেল পড়েও দেখলাম। কোথাও খুঁজে পাই নাই। আহা কি কথাই বলেছেন ঠাকুর! — ঈশ্বর কথা ক'ন। বলেন নাই শুধু, আবার এক ঘর লোকের সামনে নিজে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কইছেন! একদিন নয় সারাজীবন।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। ভক্তেরা অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন। বিনয়, ছোট নলিনী, বলাই, গদাধর ও জগবন্ধু এখনও বসিয়া আছেন। শ্রীম পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ছোট নলিনীর প্রতি) — যারা বিয়ে করেছে তাদের জন্য

কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ নয়। তারা মনে ত্যাগ করবে। যারা বিয়ে করে নাই তারা বাইরেও ত্যাগ করবে মনেও ত্যাগ করবে। বিয়ে করলে পরিবারদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়। মন প্রফুল্ল রাখতে হয়। তবে ভগবানের পথে সহায় হবে, নয়তো গোলমাল বেড়ে যাবে। যারা দেশ থেকে এসে কলকাতায় আছেন কাজকর্মের জন্য, তারাও ইচ্ছা করলে সাময়িক সন্ন্যাস জীবনযাপন করতে পারে। টাকা পাঠিয়ে দিলেই হলো। বাড়ির লোক তাতে সুখী হবে। কেউ কেউ শুনতে পাই দু' বছরেও দেশে যায় না। টাকা পাঠিয়ে চিঠিপত্রে সব খবর করে। তাদের পক্ষে এখানেও নির্জন। পরিবারের কেউ থাকলে এটি হয় না।

সন্ন্যাসী গৃহী সকলেরই উপায় দেখিয়ে গেছেন। কাউকেও বাদ দেন নাই। তাঁর কথায় বিশ্বাস করে পালন করতে চেষ্টা করা উচিত। তাহলে বেঁচে যাবে। নচেৎ দুঃখ কষ্টের চাপে তলিয়ে যাবে। একবার পিছিয়ে গেলে কবে আবার এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম হবে কে জানে! আবার এখন অবতার এসেছেন — ডাঙ্গায়ও এক বাঁশ জল। তাঁ'তে মন থাকলে দুঃখের ভিতরও শান্তি। ভক্তদের আদর্শ —

'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ'। (গীতা ২/৫৫)

ঠাকুর বৈ আমাদের উপায় নাই। তাই বলেছেন, 'আমায় ধর'।

কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল, ১৯২৪ খৃঃ।
৩০শে চৈত্র, ১৩৩০ সাল, রবিবার — শুক্লানবমী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কলার ভিতর কুইনাইন্ যেমন

১

নববর্ষ, প্রভাত। সূর্য এখনও উঠে নাই। শ্রীম মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে বসিয়া ধ্যানমগ্ন পূর্ব-দক্ষিণ কোণে পশ্চিমাস্য। সম্মুখে জগবন্ধু, বিনয়, ছোট জিতেন ও গদাধর। সকলেই ধ্যান করিতেছেন। প্রায় দুই ঘন্টা অতীত হইল। শ্রীম এইবার বৈদিক সুরে উপনিষদ পাঠ করিতেছেন — 'ব্রাহ্মধর্ম' হইতে প্রথমে গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ ও পরে তৃতীয় অধ্যায় হইতে নবম অধ্যায় পর্যন্ত। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ, সদানন্দ ও বিনয়ের ভাই কিরণ আসিয়াছেন। একটু পর আসিলেন সুরপতি একজন সঙ্গীর সহিত। সকলের শেষ আসিলেন উমেশ। ইনি কলেজে পড়েন। অন্তেবাসীর বিশেষ পরিচিত।

আজ ১৪ই এপ্রিল ১৯২৪ খৃঃ অঃ, ১লা বৈশাখ ১৩৩১ সাল; মঙ্গলবার।

শ্রীম সুরসংযোগে পড়িতেছেন আর ব্যাখ্যা করিতেছেন — 'যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।' (বৃহ ৩/৮/১০)।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন, একজন কত কষ্ট করে বাংলাদেশ থেকে জগন্নাথ দর্শনে গেল। মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত। তখন দেখতে পেল একটি গরুর গাড়ী যাচ্ছে। গাড়ীওয়ালাকে বললে একটু অপেক্ষা করে তাকে নিয়ে যেতে। সে চট্ করে মন্দির দর্শন করে আসছে। গাড়ীওয়ালা বললে, তা হবে না। তখন আর কি করে অগত্যা গাড়ীতে উঠে বসলো। খুব ক্লান্ত ছিল। তার কপালে জগন্নাথ দর্শন হল না। এই ব্যক্তি কৃপণ; মানে কৃপার পাত্র। অত চেষ্টার পরও

হলো না দর্শন, বুদ্ধির দোষে। যারা মোটেই চেষ্টা করে না ঈশ্বর দর্শনের জন্য তারা আরও কৃপার পাত্র, আরও কৃপণ। ব্রহ্মকে জানলে তবে ব্রাহ্মণ।

মানুষ, কি আশ্চর্য জীব ঈশ্বর করেছেন। এই রক্তমাংসের শরীরে ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। অন্য জীবের শরীরে হয় না। তাই মানুষ-জন্ম দুর্লভ।

(একজন ভক্তের প্রতি) — দেখুন, এ কথাটা কয়দিন থেকেই মনে খুব উঠছিল। তাই আপনাদের বলেছিলাম কয়েকবার।

শ্রীম (স্বগতঃ) — উঃ, কি আশ্চর্য ব্যাপার! এতো দুর্বলতা এই মানুষের শরীর মনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শরীরেই অমৃতত্ব লাভ হয়। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ — যিনি বাক্য মনের অতীত, তাঁর দর্শন হয়। এই অমৃতত্ব লাভই মানুষের পরমপুরুষার্থ, শ্রেষ্ঠসম্পদ আর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তাঁকে না জানলে জন্মমৃত্যুর কবলে পড়তে হয়। দুঃখ-লাঞ্ছনার শেষ নাই। তাই কৃপণ, কৃপার পাত্র।

শ্রীম পড়িতেছেন —

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ
সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।
...আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।
স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।
(বৃহ : ১/৪/৮)

স বা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং
ভূতানাম্ রাজা।
তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্বে সমর্পিতাঃ।
এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্বাণি ভূতানি সর্বে দেবাঃ
সর্বে লোকাঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ।
(বৃহ : ২/৫/১৫)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই দেখুন, ঋষি বলছেন, সবের প্রিয় ঈশ্বর। যতক্ষণ মন নিচের দিকে থাকে ততক্ষণ এইসব জিনিষ প্রিয়

বলে বোধ হয় — এই স্ত্রীপুত্রাদি, বিত্ত, কুটুম্ব অর্থাৎ ঠাকুরের ভাষায় কামিনীকাঞ্চন। একেই বলে সংসার।

ঈশ্বর এই সকলের ভিতরে আছেন। জীব তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না। বস্তুতঃ সে ভালবাসছে ঈশ্বরকে — আত্মাকে। কিন্তু মনে করছে সে ভালবাসছে তার পুত্রবিত্তাদিকে। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলছেন, 'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি' (বৃহ : ২/৪/৫)। খোলটা ভালবাসে জীব। ভিতরে যে তিনি রয়েছেন, তা দেখতে পাচ্ছে না।

ঠাকুর বলেছিলেন, এইটি তাঁর অবিদ্যা মায়ার কাজ — যে সত্যিকার 'আপনার', তাঁকে মনে করিয়ে দেয় 'পর'। আর যে 'পর', তাকে মনে করায় 'আপনার'। ঈশ্বরের কৃপায় কেবল এই চৈতন্য হতে পারে। তাঁর মায়ার সঙ্গে কেউ পেরে উঠে না। বলতেন, বিদ্যা থেকে অবিদ্যার জোর বেশী। বিদ্যা অবিদ্যা দুই-ই মায়া।

ঠাকুরের জীবনটি এই মহাবাক্যের জীবন্ত ভাষ্য। প্রিয় যে আত্মা তাঁতে তিনি নিশিদিন নিমগ্ন। কারোও উপর মন নাই — আত্মীয় কুটুম্ব, দেহসুখ কিছুতেই মন নাই। বাড়ির লোক খেতে পাচ্ছে না, রোগে, ম্যালেরিয়ায় মর মর; তথাপি, একদিনের জন্যও ঈশ্বরকে বলতে পারেন নাই এদের এসব দাও, খাওয়াপরা। বলেছিলেন, যদি জানতুম এসব থাকবে তবে কামারপুকুর সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে বলতুম মাকে। কিন্তু জাগতিক এইসব প্রিয় শেষ অবধি থাকে না। এক ঈশ্বরই প্রিয় আর সব অপ্রিয়। এক ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য — এইটেই ছিল ঠাকুরের জাগ্রত ভাব সর্বদা। মা ঠাকরুণ কামারপুকুর চলে গেলেন। ঠাকুর পরে ভক্তদের বললেন, কে তো কে চলে গেল! নিজের অবস্থা নিজেই বর্ণনা করেছেন। বলছেন, রামলাল এরা সব হলো পর। আর বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তরা হলো আপন, প্রিয়।

দুটি কথা, একটি ঈশ্বর আর একটি জগৎ। জগৎকে না ভালবেসে ঈশ্বরকে ভালবাসা। তাঁর কৃপায় তাঁকে ভালবাসতে পারলে তখন আর জগৎ থাকে না। তখন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। ঠাকুর দেখেছিলেন এইটি। একটু নিচে নেমে এসে বলেছিলেন, মা দেখালেন সব মোমের।

বাগান, বাড়িঘর, গাছপালা, মালী সব মোম দিয়ে তৈরী, সব সচ্চিদানন্দময়, সচ্চিদানন্দে মোড়া।

কি করে ঈশ্বরে ভালবাসা হয় তাও বলে দিয়েছিলেন। যাদের ঈশ্বরেতে ভালবাসা হয়েছে, তাঁর জন্য এক ঘটি কাঁদে যারা — তাদের সঙ্গ করা, আর তাদের সেবা করা। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করতে বলেছেন। কিন্তু শুনছে কে এই মহাবাণী!

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — শিষ্যদের বলছেন ঋষি, রথের চাকায় অর্থাৎ rim-এ যেমন spoke (শলাকা) গুলি সব ঢুকানো রয়েছে তেমনি, ঈশ্বরের সঙ্গে সকলের সংযোগ। তাহলে এই সবই সেই whole-এর (পূর্ণর) part (অংশ)। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সকল জীব তাঁর সঙ্গে সংলগ্ন।

আর ঐটি আমরা discover (আবিষ্কার) করেছি — ট্রলি (trolly)। ট্রাম গাড়ী চলে ট্রলির সঙ্গে সংযোগ হলে। ঐটিতে বিদ্যুতের শক্তি। আর ঐটিই সংযোগস্থল গাড়ীর আর উপরের তারের। যেই ট্রলি আলগা হল অমনি গাড়ী বন্ধ। এটি বড়ই সুন্দর দৃষ্টান্ত। আগে এইসব ছিল না তাই ঋষিরা গাড়ীর নাভিচক্রের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এটিও বেদ। আর সেইজন্য বেদ নিত্য।

শ্রীম-র এই কথা শুনিয়া একজন ভাবিতেছেন তা'হলে ইনিও ঋষি। কেননা এই সত্যটির আবিষ্কর্তা নূতন রূপে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঋষিদের আর একনাম মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্র মানে ঈশ্বর। ঈশ্বরকে যিনি দেখেছেন তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা। উঃ, কতদূর তাঁরা ভেবেছেন! ঈশ্বর তাঁদের দেখিয়ে দিয়েছেন এই সব সত্য। ঋষিরা প্রত্যক্ষ করেছেন এই সকল তত্ত্ব। তারপর শব্দদ্বারা প্রকাশ করেছেন। তারই নাম বেদ।

এখন প্রায় আটটা। ছোট জিতেন প্রভৃতি কেহ কেহ বিদায় লইলেন।

একটি ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — আজ বড় নলিনীবাবুর বাড়িতে মঠের কয়েকজন সাধু খাবেন। উনি নরহরির help (সহায়তা)

চেয়েছেন। রাত্রে তাকে বলা হ'ল যেতে সে গেল না। বলে, একবার যাব। তা কখন যাব তার ঠিক নাই।

শ্রীম (বিরক্তির সহিত, নরহরির প্রতি) — ওঠো, ওঠো। তোমায় কি জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন? না, সাধুসেবা করবে। পরম সুহৃদের কাজ করেছেন উনি। সাধুসেবায় নিমন্ত্রণ, তোমার কত মঙ্গল। এই মাত্র যে শুনলে এ সব কথা। ওঠো, ওঠো।

নরহরি চলিয়া গেল। শ্রীম উত্তম বৈদ্য। ভক্তের শ্রেয়লাভে বলপ্রয়োগ করতেও কুণ্ঠিত নহেন।

শ্রীম (একজন ভক্তের প্রতি) — আমায় আগে বললেন না কেন?

ভক্ত — কাল রাত্রে তাকে বলেছিলাম। সে শোনে নাই; তাই আর আপনাকে বলি নাই।

শ্রীম — বড় সুবিধের লোক নয় দেখতে পাচ্ছি। হাঁড়ির একটা ভাত টিপলে সব বোঝা যায়। সাধুসেবায় যেকালে মন নেই সেকালে বুঝতে হবে ভাল লোক নয়। এসব কি জানেন — যেমন environments-এর (পারিপার্শ্বিকতার) ভিতর brought up (বর্ধিত) তেমনি তো হবে! ঠাকুর বলতেন, পুলী সব দেখতে এক রকম। কিন্তু কারো ভিতর ক্ষীরের পোর, কারো কড়ার ডালের। খালি চোখ বুজে থাকলেই ধ্যান হলো? একবার যাবে যে বলেছে, সে খাবার সময়!

আজ নববর্ষ বলিয়া সারাদিন সাধুভক্তের সমাগম। শ্রীমকে প্রণাম করিতে সকলে আসিতেছে।

এখন সন্ধ্যা। শ্রীম চারতলার বিস্তৃত ছাদে বসিয়া আছেন মাদুরে উত্তরাস্য। খুব গরম, আবার মৃদুমন্দ শীতল হাওয়াও চলিতেছে। বড় জিতেন, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, ছোট জিতেন, রমণী, ললিত, গদাধর, মণি, শান্তি, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তরা শ্রীম-র কাছে বসিয়া আছেন। আধঘন্টা ধ্যানের পর 'কথামৃত' পাঠ চলিতেছে। শ্রীম নিজে বাহির করিয়া দিলেন তৃতীয় ভাগ, ষড়বিংশ খণ্ড। ইনি খুব ক্লান্ত। শান্তি

পড়িতেছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুর বাগানে রহিয়াছেন, অসুস্থ। চড়কের মেলা কাছেই বসিয়াছে। ঠাকুর মেলা হইতে বাতাসা, বঁটি প্রভৃতি আনাইয়াছেন। শ্রীম বলিতেছেন — 'এইটি হলো ঠাকুরের বাল্যলীলার পুনরভিনয়।' এবার কর্মফলের কথা হইতেছে। শ্রীনাথ ডাক্তার বলিতেছেন, 'কর্মফল কারো এড়াবার যো নাই।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর মানলেন না একথা। বলছেন, 'ঈশ্বরকোটির অপরাধ হয় না।' জীবকোটির জন্য এসব আইন কানুন। কর্মফল ভোগ করা, এটা সাধারণ নিয়ম। তাঁর কৃপা, এটা অসাধারণ নিয়ম। তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন করলে সঞ্চিত আর ক্রিয়মান কর্ম সব নষ্ট হয়ে যায়। যেমন ভাজা ধানে গাছ হয় না। বাকী থাকে প্রারব্ধ। ঠাকুর বলেছেন, তাও তাঁর কৃপায় কম হয়ে যায়। বলতেন, যেখানে খাঁড়ার ঘা লাগতো সেখানে নরুণের আঁচর লাগে। আবার তাঁর ইচ্ছা হলে তাও তুলে নেন। ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে একটি গান গাইতেন। 'কপালে লিখেছে বিধি তাই বলবান যদি, তবে ওমা তোর দুর্গা নাম কে নেবে।' বলেছিলেন, তাঁর নাম করলে, তাঁর চিন্তা করলে, তাঁর শরণাগত হলে প্রারব্ধও নাশ হয়।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — সংসারীদের পক্ষে জ্ঞানপথ ভাল না — সব স্বপ্নবৎ মনে করা। তাদের পক্ষে ভক্তি পথ ভাল। তাই বলছেন, 'জ্ঞান জ্ঞান করলেই কি জ্ঞান হয়।' দু'চার জনের হয় ঐ! তাই নরেন্দ্রকে বললেন 'অখণ্ডের ঘর।'

ঠাকুরবাড়ি হইতে প্রসাদ আসিল — প্রচুর ফল মিষ্টি। গ্রীষ্মকাল তাই অনেক তরমুজ ভোগ দেওয়া হইয়াছে। ডাক্তার বক্সীও ইতিপূর্বে ঁমাকালীর প্রসাদ ঠনঠনে থেকে নিয়ে এসেছেন — অনেকগুলি সন্দেশ। ভক্তগণ পরিতোষপূর্বক প্রসাদ পাইলেন।

আবার 'কথামৃত' পাঠ হইবে। শ্রীম ক্লান্ত থাকিলে পাঠই বেশী হয়। তিনি এবারও দ্বিতীয় ভাগ, ষড়বিংশ খণ্ড নিজে বাহির করিয়া দিলেন। সংসারী ও ত্যাগীর কথা। শান্তি পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে

শ্রীম ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — সংসারে থেকে ঈশ্বর লাভ খুব rare (বিরল)। হয় না, একথা বলা চলে না। কিন্তু বড় কঠিন। দু' একজনের হয় তাঁর কৃপায়। অত বড় লোক কেশববাবু। তাঁকেই ঠাকুর বলেছিলেন, ঘরে থেকেও আলো পাওয়া যায়। তবে একটু একটু করে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলো আসে। আর ত্যাগীরা আলোর বন্যেয় দাঁড়িয়ে — flood of light!

যারা কষ্টে সংসার ছাড়ে তারা হীন থাকের লোক, ঠাকুর বলছেন। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে ঠিক ঈশ্বর লাভ হয়। সংসারী জ্ঞানী যেন শার্শীর ঘরে রয়েছে। কাচের মধ্য দিয়ে ভিতর-বার দুইই দেখছে। ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর থেকে দেখা। কিন্তু ত্যাগীর 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সংসারে থাকতে গেলে মেঘ উঠবেই। সূর্য ঢেকে যায় মাঝে মাঝে। আবার সব পরিষ্কার। কাজলের ঘরে থাকা। হাজার শেয়ানা হলেও একটু আধটু লেগে যায় দাগ! নির্লিপ্ত হওয়া বড়ই কঠিন। গিরিশবাবু ঠাকুরকে বলতেন, 'কি সংসারী, কি ত্যাগী সবাইকেই আপনি শুদ্ধ আর নির্লিপ্ত করে দিতে পারেন। আপনার সব বেআইনী!' কি বিশ্বাস! ঠাকুর মেনে নিলেন। বলছেন, 'হাঁ, তা হতে পারে। ভক্তি-উন্মাদ বেদ বিধি মানে না।' এইখানে ধরা দিয়েছেন নিজকে। ঈশ্বর ছাড়া কার সাধ্য একথা মেনে নেয়? শুধু কি মেনে নেওয়া। গিরিশবাবু যা চাইলেন তাই পেলেন। গিরিশবাবু নিজে বলেছেন, 'আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি।' চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলছেন ঠাকুর — আমি ঈশ্বর, জগতের কল্যাণের জন্য এসেছি। আমার কথা শোন, চির শান্তি লাভ করবে।

ভক্তরা অনেকে চলিয়া গিয়াছেন। দুই চারিজন রহিয়াছেন। শ্রীম তাদের সঙ্গে ছাদে পায়চারী করিতেছেন উত্তর দক্ষিণ। কি ভাবিতেছেন আর চলিতেছেন। হঠাৎ টিনের ঘরের সামনে দাঁড়াইলেন। এই ঘরে অন্তেবাসী থাকেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — উঃ কি উৎকট সাধনাই করেছে

লোক এই 'আমিটা' ভুলবার জন্য! (সহাস্যে) গু—ম—ফোঁ—পর্যন্ত হয়েছে। (ভক্তদের প্রতি) আপনারা বুঝতে পারলেন না বুঝি? শিষ্যটা ভয় পেয়েছে. তাই আড়ষ্ট হয়ে বলছে — গুরু, মড়াটা ফোঁস করছে যে! শিষ্য শব সাধন করছে। মড়ার উপর বসে জপ করতে হয়। ভূতে পাওয়ায় মড়াটা ফোঁস করে। তখন মুখে চাট দেয় ছোলা ভাজাটাজা। ওটা কড়র মড়র করে খেতে থাকে। সেই ফাঁকে জপ করে কাজ সেরে নেয়।

'গু — ম — ফোঁ' করলে আর হলো না। ভয় পেলে গেল! উঃ কি কঠিন সাধন হয়েছে ঈশ্বর লাভের জন্য! ঘোর অন্ধকার, সাপে কিলবিল করছে। তাতে আবার ভূতের উৎপাত — সেইস্থানে বসে সাধন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঢেঁকির একদিক যত উঠবে অন্যদিক তত নামবে। মনটা ঈশ্বরের দিকে যত এগুবে সংসারের little things (ক্ষুদ্রতা) থেকে তত পৃথক হবে।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'মা আমাকে দিয়ে সব রকম সাধন করিয়েছেন। কেন? লোকশিক্ষার জন্য আর শাস্ত্র সত্য এই প্রমাণের জন্য। তোদের অত করতে হবে না। আমি কে আর তোরা কে এটা জানলেই হলো। অর্থাৎ তিনি ভগবান আর আমরা তাঁর সন্তান। বলেছিলেন — 'মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।' এতে বিশ্বাস হইলেই শান্তি।

২

আজ মঙ্গলবার, ১৫ই এপ্রিল, ১৯২৪ খৃঃ অঃ। ২রা বৈশাখ ১৩৩১ সাল। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম এইমাত্র ঠাকুরবাড়ি হইতে আসিয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পাশেই প্রশস্ত ছাদ। তাতে মাদুর পাতা। ভক্তগণ আসিয়া বসিতেছেন। লক্ষ্মণ, সদানন্দ, মাখন, শান্তি ও তাঁহার সঙ্গী, জগবন্ধু, মহেশচৈতন্য প্রভৃতি অপেক্ষা করিতেছেন। 'প্রবাসী' আপিসের উমেশ চক্রবর্তীও আসিয়াছেন। তাঁর

হাতে একখানা ‘প্রবাসী’। কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, বলাই, ছোট জিতেন, মনোরঞ্জন প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন ছয়টা।

এইবার শ্রীম আসরে নামিলেন। তিনি উত্তরাস্য চেয়ারে বসিয়াছেন। উমেশ বেঞ্চে পশ্চিমমুখী বসিয়া শ্রীমকে ‘প্রবাসী’ হইতে মায়ের জীবনচরিত শুনাইতেছেন। লেখক ‘প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ’র বিখ্যাত সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীম ধ্যানস্থ হইয়া পাঠ শুনিলেন। পাঠ শেষ হইলে নিজের মন্তব্য বলিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — খুব কল্যাণ হবে এতে লোকের। বিশিষ্ট ব্যক্তি লিখেছেন, আবার ব্রাহ্মসমাজের লোক। অনেকে পড়বে।

ভারতীয় নারীর আদর্শ মা। মা তো সকলেরই মা। যে মেয়েরা তাঁর জীবন নেবে তারা সব ধন্য হয়ে যাবে। ঠাকুর মাকে কাছে রেখেছিলেন কেন? লোকশিক্ষার জন্য। মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ মায়েতে। আর স্ত্রীজাতির পূর্ণ বিকাশ মাতৃত্বে। সংযম আর সেবার মূর্তিমতী বিগ্রহ মা। ওয়েস্টের কত লোক তাঁকে দর্শন করে ধন্য হয়ে গেছে।

ঠাকুরকে, মাকে দেশ যত নেবে বুঝতে হবে দেশ তত উপরে উঠেছে। যেমন ঠাকুর তেমনি মা — উভয়েই নিজেদের স্বরূপ লুকিয়ে রেখেছিলেন সাধারণ মানুষের আচরণে। যাদের নিকট ধরা দিয়েছিলেন তারা ধন্য। জগতের লোক ক্রমে জানতে পারবে।

কথায় কথায় ঠাকুর ও মায়ের জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়রামবাটির নিকটবর্তী সিংহবাহিনী দেবীর কথা উঠিল। বলির সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

মহেশ চৈতন্য (শ্রীম-র প্রতি) — কেউ কেউ বলে ইন্দ্রিয়ের বলি।

শ্রীম (সহাস্যে) — তাহলে নিজেদের দেয় না কেন বলি?

মহেশ চৈতন্য — মঠে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে।

মহেশ চৈতন্য — অহৈতুকী কৃপা কি?

শ্রীম — কাজ করলে তার মজুরী মিলে। একজনের এমনি মিলে

গেল মজুরী, কোনও কাজ করে নাই তবুও এইরূপ। কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না এই কৃপার। সকলে জানে গরীব, সে রাতারাতি রাজা হয়ে গেল! কত ভক্ত কত সাধনভজন করছে কিন্তু তাদের ঈশ্বর দেখা দেন নাই। আর একজনকে অমনি দেখা দিলেন। সে কিছুই করে নাই।

ঈশ্বরের স্বভাব যেন বালকের স্বভাব। তিনি স্বতন্ত্র — কার্যকারণ সম্পর্কের বাইরে। এই কার্যকারণ সম্বন্ধ Law of causation, এও তাঁর সৃষ্টি। এই সবই তাঁতে রয়েছে কিন্তু তিনি এই সবের পার। যেন সাপের মুখে বিষ। অন্যকে কামড়ালে মরে কিন্তু নিজে মরে না মুখে বিষ থাকলেও। বিচার করে এসব বোঝবার যো নাই। কেবল তাঁর কৃপাতেই তাঁর কৃপা কি বোঝা যায়। আর পথ নাই।

আর একটি আছে অহৈতুকী ভক্তি। কেউ ধন চাচ্ছে, কেউ এটা, কেউ ওটা চাচ্ছে। কেউ কেবল তাঁর পায়ে ভক্তি চাইছে।

ছেলেকে মা মারছে। কিন্তু ছেলে সেই মায়ের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ঈশ্বর দর্শনের বাসনা বাসনার মধ্যে নয়।

কেউ কেউ অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে মুক্তি। তাঁর দর্শন হলে, আত্মদর্শন হলে সেটি হয়ে যায়।

এ সবের উপরও আর একটি আছে। মুনি ঋষিরা কেউ কেউ ঐটি নিয়েছিলেন। সেটি অহৈতুকী ভক্তি। অন্য কিছু চান না, প্রয়োজন নাই কিছু, শুধু ভগবানের পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি চান। সেখানে দুঃখ নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা নাই। আছে কেবল প্রেমানন্দ সম্ভোগ। 'আত্মারামাশ্চ মুনয় নির্গ্রন্থা অপি উরুক্রমে। কুর্বন্তি অহৈতুকীং ভক্তিং ইত্যম্ভূতগুণোহরিঃ।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৭/১০)। এটি ভিন্ন থাকের ভক্তি। সকাম নিষ্কাম থাকের উপরের জিনিষ। নরলীলায় ঠাকুর এই ভক্তি নিয়েছিলেন — মায়ের ছেলে। চৈতন্যদেবেরও ছিল এই ভক্তি।

মহেশ চৈতন্য — কৃপা কি?

শ্রীম — তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর ইচ্ছা। তাঁর কৃপার শেষ আছে! সর্বদা কৃপা রয়েছে। জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব দিয়ে রচনা করেছেন।

আবার এই সকলের ভিতর তিনি প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন! মানুষ এটি বুঝতে পারে না। তাঁর অবিদ্যা মায়ায় এটি ভুলিয়ে দেয়। তাঁকে তাই দেখতে পায় না অত কাছে তবুও। বিদ্যা মায়ার সহায়তায় জীব স্বরূপের সন্ধান পায়। ঠাকুর বলেছেন, তাঁর বিদ্যা মায়ার চাইতেও অবিদ্যা মায়ার জোর বেশী।

সাধক যত উপরে উঠে ততই এই মায়ার রূপ দেখতে পায় — ভীষণতম ঐ রূপটি। ভক্তভাবে ঠাকুর তাই সর্বদা প্রার্থনা করতেন, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।' ক্রাইস্টও তারই প্রতিধ্বনি করছেন — 'Lead us not into temptation.' যে ব্যক্তি এই দুইটি জিনিষ দেখতে পায় সেই 'কৃপা কৃপা' করে দিনরাত। এর একটি মানুষের দুর্বলতা, অপরটি মহামায়ার বিচিত্র খেলা — অঘটনঘটনপটীয়সীর এই তাজ্জব কাণ্ড!

মহেশ চৈতন্য — তবে সাধনভজনের দরকার কি?

শ্রীম — না, তাঁর কৃপা সাধনভজন দ্বারা পাওয়া যাবে এমন কোনও নিয়ম নাই। তাঁরই ইচ্ছা হলে তাঁর কৃপা হয়। তবে সাধনভজন করা, কেননা সকল মহাপুরুষগণই তা করেছেন ও এখনও করেন। তাই তা করা। যদি দয়া হয়।

মহেশ চৈতন্য — মঠে পণ্ডিতমশায় বলেন, কারণ ছাড়া কার্য হতে পারে না। তাহলে কৃপারও কোন কারণ চাই।

শ্রীম — বড় বড় কথা আমরা অনেক বলি, কিন্তু ধারণা হয় কৈ? কত কথাই তো হলো। বাজনার বোল মুখে আনা সহজ কিন্তু হাতে আসে কই! তিনি ইচ্ছা করলে সব হয়, তাঁর ইচ্ছাতে সব হয়।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন এর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিক current (তড়িৎপ্রবাহ) চালিয়ে দাও। অমনি ওয়াটার ভেপার (বাষ্প) তৈরী হবে। এটি করলে কে? মানুষ তো দেখছে জল তৈরী হ'ল, কিন্তু কার ইচ্ছায় হচ্ছে এটি। তিনি ইচ্ছা করলে এটি নাও হতে পারতো।

বড় বড় মাথা ঠিক করেছিল, A system of phenomena

is followed by a system of effects — কারণসমূহ কার্য প্রসব করে। Uniformity of Nature (অপরিবর্তনীয়া প্রকৃতি) এইটে ধরে নিয়ে তবে cause and effect এর (কার্যকারণের) কথা বলে। এখন Nature যে Uniform (প্রকৃতি যে একরূপ) তার প্রমাণ কি? এতো অনুমান মাত্র। প্রকৃতির রূপ তুমি দেখেছ কি? তবে কি করে তুমি বলছ? যাঁরা দেখেছিলেন, সেই ঋষিগণ বলেছেন, 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং (ছান্দোগ্য ৬/২/১)। Nature-ই (প্রকৃতিই) ছিল না তখন। একমাত্র সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর ছিলেন।

সকলে ধরে নিয়েছিল all crows are black (কাক কাল)। কিন্তু পরে বের হয়ে গেল white crow (সাদা কাক) অষ্ট্রেলিয়ায় আছে। Generalisation (সব এক রকম অনুমান) করবার যো নাই। কিছুই বলবার যো নাই জোর করে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বিচার করে কিছুই হবে না, কিছুই না। দেখিয়ে দিলে হয়। তিনি যাদের দেখিয়েছেন তাঁদের কথায় বিশ্বাস কর। তারপর বিচার কর। শুধু বিচারে পাত্তা করতে পারবে না। শান্তিও হবে না। তাই, গুরুবাক্যে বিশ্বাস — ঠাকুরের মহাবাক্য।

নিজেদের শরীরটার প্রতি একবার চেয়ে দেখ না। কত কাণ্ড এতে — liver, spleen, nervous system, lungs, heart, kidney, bludder (যকৃৎ, প্লীহা, স্নায়ুমন্ডলী, ফুসফুস, হৃদয়, মূত্রাশয়, পিত্তকোষ) কত কি! আবার তার ভিতর মন বুদ্ধি অহংকার। এসব সাধনেই আবার ঈশ্বর দর্শন হয়। ভেবে দেখ এসব কেমন করে এলো। এসব আবার বাইরে থেকে আসে নাই, সব ভিতরে ছিল। ক্রমে বাইরে এলো। Involved (অন্তরে পরিব্যাপ্ত) হয়ে ছিল তারপর evolved (বহিঃপ্রকাশ) হয়েছে আস্তে আস্তে। আগে involution (পরিব্যাপ্তি) তারপর evolution (ক্রমবিকাশ)। কে করেছে এসব? কি করে তুমি explain (ব্যাখ্যা) করবে বল? তার যো নাই। এই যে জন্ম থেকেই আমরা breathe (শ্বাস গ্রহণ) করছি

(অভিনয় করিয়া) এমন এমন করে, এটি করেছে কে? কেউ কেউ বলে automatic (সহজাত)। এ বললেও কিছুই explained (বোঝান) হ'ল না। Automatic (আপনি হচ্ছে) মানে mysterious (হেঁয়ালী)। কর না তর্ক, explained (বোঝান) হচ্ছে কোথায়? Argument এর (যুক্তির) এই সব weakness (দুর্বলতা) দেখে আমরা ঠিক করেছি অবতার যা বলেছেন তাই নোবো। These things have been revealed unto us (এই সব গভীর তত্ত্ব আমাদের কাছে ঈশ্বর কর্তৃক প্রকটিত)। এতে আর কোনও 'কিন্তু' নাই।

ঋষিরা বিচার করে এসব জানতে পারেন নাই। বিচার শেষ করে ধ্যানেতে বসেছিলেন। তখন ঈশ্বর ধপ্ করে এক একটা বিষয় দেখিয়ে দেন। ঠাকুর তাই বলতেন, কি আর বিচার করবো। দেখছি মা-ই সব হয়ে রয়েছেন, সব করছেন। সাকার নিরাকার দর্শনের পর এই অবস্থা হয়। তখন এই সবই তিনি, দর্শন হয়।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — বিচারের দ্বারা কিছুই হবার যো নাই, কিছুই হবে না। ক্রাইস্ট বলেছিলেন, Father-কে (ঈশ্বরকে) জানে son (ক্রাইস্ট, অবতার)। son (পুত্র) মানে ক্রাইস্ট, অবতার। আর son (অবতার) যার নিকট revealed (স্বরূপে প্রকটিত) হন তিনি জানেন। অন্যে জানে না। তাই গুরুবাক্যে, অবতারের কথায় বিশ্বাস বৈ আর উপায় নাই।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি) — বাবুরাম একবার কয়েকদিন দক্ষিণেশ্বর যায় নাই। ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, 'এখন আসিস্ না। এরপর মা অবস্থা বদলে দিতে পারেন। তখন কিছুই ভাল লাগবে না।' বলেছিলেন, 'মা আমায় যেমনি রাখেন তেমনি থাকি।' এই বাবুরাম মহারাজই রাণাঘাটে আপনাদের বাড়ি গিছলেন। অবতারকে বোঝা বড়ই কঠিন।

ক্রাইস্টকে ওরা কি বুঝতে পারে! যারা বুঝবে তারাই ভোগ নিয়ে রয়েছে। তা'হলে কি করে বুঝবে? আমরা যে কিছু বুঝতে পারছি

সে কেবল তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখেছি বলে।

সাধুভক্তগণ এইবার ঠাকুরের ফলমিষ্টি প্রসাদ খাইতেছেন। এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। মোহনবাসী আসিয়াছেন। তাঁর ইচ্ছা কিছুদিন পুরীতে গিয়ে থাকেন। শ্রীমকে ধরেছেন জগন্নাথ মন্দিরের ম্যানেজার রায়বাহাদূর সখীচাঁদকে বলে দিতে।

শ্রীম (মোহনবাসীর প্রতি) — তাঁর সঙ্গে ঘর করি নাই। একবার মাত্র দশ মিনিটের আলাপ এখানে। হঠাৎ কি করে বলা যায়। ভেবে দেখি।

দক্ষিণেশ্বরে থাকলে তো বেশ! মা কালীর সেবা করা যাবে। বশিষ্ঠ বলেছিলেন রামকে, 'তুমি আসবে জেনে পুরোহিতের কাজ নিয়েছি। নয়তো, এই হীন কাজ কি কখন নিই?' পেটে খেলে, পিঠে সয়।

৩

অপরাহ্ন চারটা। মর্টন স্কুলের চারতলা। শ্রীম আপন ঘরে বিছানায় বসিয়া আছেন, পশ্চিমাস্য। সম্মুখে জগবন্ধু বেঞ্চিতে বসা। একটু পর তোতা গৃহে প্রবেশ করিল। তোতা শ্রীম-র পৌত্র। বছর দশেক বয়স। শ্রীম তোতার সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সাধারণ লোক নাতির সহিত যেরূপ ব্যবহার করে সেরূপ নয়। শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যবহার। বালক পৌত্র হইলেও তার সঙ্গে লৌকিক ব্যবহার নাই। ছেলেটিকে যেন ভগবানের রূপ মনে করিতেছেন। স্নেহের সম্পর্ক নয়, শ্রদ্ধার।

শ্রীম (তোতার প্রতি) — শোন, শোন। ঠাকুরবাড়ির পাড়ার দুটি ছেলেকে দেখেছিলাম দাঁড়িয়ে আছে বটতলার ওখানে। দুটি ভাই। বড়টি ছোট ভাইয়ের গলায় হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে। আমায় দেখে বললে, 'আমাদের পাঠশালে পড়ে, তোমার বাড়িতে আছে'। (অন্তেবাসীর প্রতি) ওর world-এর (জগতের) এই খবর। (তোতার প্রতি) আমরা বললুম, তোমরা এখানে এসেছ কেন? গাড়ী চলে

রাস্তায়। তারা বললে, আমরা রোজ এখানে আসি। (হাস্য)।

বালকের সহিত বালকের ন্যায় ব্যবহার এই মহাপুরুষের। একটু পরই তিনি গম্ভীর মূর্তি ধারণ করিলেন। মন যেন আর এ জগতে নাই, চক্ষুর দৃষ্টি ভিতরে ঢুকে গেছে। বিছানার উপর একখানা পুস্তক ছিল সেখানে লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পুস্তকখানা 'ব্রাহ্মধর্ম'। উহা উপনিষদাদি শাস্ত্রের সংগ্রহ। শ্রীম পাঁচটা অধ্যায় পাঠ করিলেন।

জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মই 'অক্ষর' নামে পরিচিত। তাঁহারই লক্ষণ, অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে দেখাইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — এই দেখুন ঋষিরা বলছেন, সৃষ্টির পূর্বে অন্য কিছু ছিল না। এক অদ্বিতীয় সত্য বস্তু মাত্র ছিল। তিনি নিজেকে নিজে জানেন। তাই তাঁকে আত্মা বলে। তিনি সাধারণ লোকের মত নন। তিনি অজর অমর অমৃত ও অভয়; অজ ও মহান্। তিনি এমনি বস্তু যার দ্বিতীয় নাই তাই অদ্বিতীয়। সংসারে যত বস্তু, গুণতিতে তার এক আছে, দুই আছে, তিন চার আছে। কিন্তু তাঁর এসব নাই। সেই বস্তুটি সর্বদা একরূপ — কোনও পরিবর্তন নাই তার। ষট্ বিকার* বর্জিত। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তাঁরই শাসনে জগৎ চলছে 'ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ' কারণ তিনি, 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।' তাঁকে জানলে কি হয় তাও বলছেন। 'অমৃতাস্তে ভবন্তি' (কঠো ২/৩/২)। তখন জন্মমরণের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল জীব। ভগবানের কাছে থাকবে সদানন্দে। তাঁকে লাভ করতে হলে ত্যাগ চাই। সংসারের সব ত্যাগ করতে হবে। ভয় পাবে বলে একেবারে এই কথা বলেন নাই। গৃহীদের ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোমরা মনে ত্যাগ করবে।' এ যেন কলার ভিতর কুইনাইন্।

মানুষের মন একটা। দুটো জিনিষে যেতে পারে না একই সময়ে। ঈশ্বরে গেলে জগতে নাই। আবার জগতে গেলে ঈশ্বরে নাই। তাই

*ষট্‌বিকার — কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার ও ঈর্ষা।

বলছেন, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা। মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং' (ঈশ ১)। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই অন্যভাবে বলেছেন। কাম ক্রোধ লোভ ত্যাগ চাই।

যদি কেউ মনে করে তাঁকে ধরে ফেলবো এই হাত দিয়ে, কি দেখবো এই চক্ষু দিয়ে, কিংবা কোনও কর্ম করে তাঁকে লাভ করবো — যেমন পড়ে পরীক্ষা পাশ করে — তা হবে না। বলছেন, তপস্যা দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায় না। কিসে হয় তবে — 'জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ' (মুন্ডক ৩/১/৮) হলে হয়।

তাই ঠাকুর বলেছিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। আমি তাঁর ছেলে, আমি তাঁর দাস, কিম্বা আমিই তিনি, এইগুলি সম্পর্ক। 'আমিই তিনি' এ কথায় বলতেন এটা গৃহস্থের পক্ষে ভাল নয়। আমি তাঁর সন্তান এটা বেশ। ঠাকুর নিজেও এই ভাব নিয়েছিলেন। এরই নাম জ্ঞান। অজ্ঞান — আমি মানুষ, আমি অমুকের ছেলে, এইসব। 'আমি তাঁর' এই চিন্তা করলে, 'আমি সংসারের' এই অজ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়। এইটিই চিত্তশুদ্ধি। শুদ্ধ চিত্তে ভগবান দর্শন দেন — যেমন নির্মল আরশীতে ছাপ পড়ে।

যেমন গঙ্গার শেষ সাগর, তেমনি চিত্তশুদ্ধির শেষ ঈশ্বর। তাই ঠাকুর বলতেন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক।

এসবই তাঁর কৃপাসাধ্য। 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্' (তৈত্তি ২ ব্রহ্মবল্ল১) ব্রহ্মকে কি করে মানুষ — এই শোকমোহাভিভূত মানুষ, জানবে তাঁর কৃপা ছাড়া। চেষ্টাও করা, আর 'সব তাঁর অণ্ডারে' ঠাকুরের এই মহাবাক্য সর্বদা স্মরণ রাখা। চেষ্টা ও কৃপা দুই-ই চাই।

শ্রীম কিছুকাল নীরব রহিলেন। গৃহে কি প্রশান্ত গম্ভীর বাতাবরণ! গ্রীষ্মকাল, কিন্তু গরম বোধ নাই। অন্তেবাসীর মনে আর একটি কথা উঠিতেছে। এই মহাপুরুষ কিছুকাল পূর্বে বালকের ন্যায় বালকের সঙ্গে চপল ব্যবহার করিতেছিলেন। এই ব্যক্তির ভিতর কি করিয়া এই প্রশান্ত গম্ভীরভাব অভিব্যক্ত হইল!

প্রায় আধঘন্টা পর শ্রীম হাতে গীতা লইলেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়

পাঠ করিয়া শেষ করিলেন। ভাবে বিভোর হইয়া একটি শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কি মধুরকণ্ঠ!

'ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।। (গীতা ১৩/৫)

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন, সৎ অসৎ বিচার চাই। আর বলেছিলেন, যখন আত্মা আলাদা আর শরীর আলাদা বোধ হয় তখনই ধর্মজীবন ঠিক ঠিক আরম্ভ হয়। দেহের সঙ্গে আত্মা এমন জড়িত যে এ সংযোগ ভাঙ্গতে চায় না সহজে। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন, তবুও দেহবুদ্ধি ছাড়ছে না! তাই এইখানে (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) এই দুইটি জিনিষ পৃথক পৃথক বোঝাচ্ছেন — ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি ও পুরুষ, দেহ ও আত্মা। চব্বিশ তত্ত্বে দেহ হয়েছে। আত্মা আলাদা। ইনিই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

জীবের যেতে চায় না এই দেহবুদ্ধি। তাই ঠাকুরের ব্যবস্থা — তাঁর দাস হয়ে থাক, তাঁর পুত্র হয়ে থাক। আমি ঈশ্বরের এই অভিমান চাই।

এখানে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা, সাধন সাধ্য সাধক — এর ভেদ দেখাচ্ছেন তা হলে জীব নিজের position (অবস্থা) বুঝতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণ বার বার অর্জুনের মনটিকে ভগবানের স্বরূপে আকৃষ্ট করছেন। কখনও বিশ্বরূপ বর্ণনা করছেন। কখনও অন্তর্যামী রূপ। এইটি বুঝবার উপায় 'অমানিত্বাদি'র সাধন। সত্যপালন, গুরুসেবা আর নির্জনবাস ছাড়া এটি বোঝা যায় না। ঠাকুর বলেছিলেন, কি জান আমি ঈশ্বরের — সংসারের নই, এই ভাবটা আনা চাই। তাই যাদের এ ভাব পাকা হয়ে গেছে তাদের সঙ্গ চাই।

এই সব বুঝতে যখন কষ্ট হবে তখন ঠাকুরের চরিতামৃত ধ্যান করবে। এই সব অবস্থাই তাঁ'তে প্রকট হয়েছিল। বিশ্বাস চাই — গুরুবাক্যে বিশ্বাস।

এখানে বলেছেন, 'শ্রুত্বাহন্যেভ্যঃ উপাসতে' (গীতা ১৩/২৬)। গুরুর কাছ থেকে শুনে, যাঁর আত্মদর্শন হয়েছে তাঁর কাছ থেকে শুনে।

অর্থাৎ গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে তাঁকে ডাকা। এরও ফল সমান। জ্ঞানযোগ ধ্যানযোগ কর্মযোগ যা হয়, গুরুবাক্যে বিশ্বাসেও তাই হয়। বিশ্বাস যোগের কি ফল তা শোন। (মধুর সুর করিয়া) 'ততো যাতি পরাং গতিং' — (গীতা ১৩/২৯) প-রা-ং গতিং । শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।

যে নিজের ভিতর ভগবানকে দেখে এবং সকলের ভিতরও এই ভগবানই দেখে, তার হবে। এ অবস্থা ঠাকুরের দেখেছি সর্বদা, এক আধ দিন নয়। সর্বদা সমানভাবে দেখেছি। এক মুহূর্তের জন্যও এই অবস্থার কমতি হয় নাই। 'মা মা' — সর্বদা মায়ের কোলের শিশু। এই মাকেই এখানে বলা হয়েছে — 'সমং ....পরমেশ্বরম্'।

(গীতা ১৩/২৮)

চারতলার ছাদ। এখন সন্ধ্যা। শ্রীম মাদুরে বসিয়া ছাদে ধ্যান করিতেছেন, উত্তরাস্য। বড় জিতেন, সুধীর, শান্তি, ছোট জিতেন, ডাক্তার, বিনয়, বলাই, জগবন্ধু আসিয়াছেন। যোগেন আর তার ছেলে খোকাও আসিয়াছেন। সকলে শ্রীম-র সঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। খানিক পর আসিয়াছেন সতীশ আর তাঁর কাকা। সতীশ গদাধর আশ্রমে থাকিয়া কলেজে পড়েন। ধ্যানান্তে কথা হইতেছে।

শ্রীম (সতীশকে দেখাইয়া যোগেনের প্রতি) — এই ইনি আমাদের ঘরের লোক এসেছেন। কি নিষ্কাম কর্মই করছেন! সাত আট ঘন্টা হবে রোজ আশ্রমের সব কাজ করছেন। আবার কলেজে পড়েন, ধন্য ইনি। প্রথমে ললিত মহারাজ আশ্রমে থাকতে দিবেন না। ওঁর বাবাও ছাড়বার পাত্র নন। বেলুড়মঠের higher authorities (ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের) সঙ্গে consult (পরামর্শ) করে থাকার অনুমতি নিয়ে এসেছেন। ইনিই ঠিক ঠিক পিতার কর্তব্য পালন করেছেন। ছেলেকে শুধু খাওয়ালে আর পরালেই পিতার কাজ শেষ হয় না। তার ধর্মজীবনের খোরাকও পিতাকে যোগাতে হবে। শরীর তিনটা কিনা — স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ। এই তিনটার জন্যই ব্যবস্থা থাকা চাই। এর পিতা সবেরই ব্যবস্থা

করেছেন। আশ্রমের কোনও advantage (সেবা) নেয় না — মাত্র থাকা। কিন্তু সারাদিন অবসর সময়ে ঠাকুরসেবা, সাধুসেবা করে। আহারাদি বাইরে করে। আহা, কি নিষ্কাম সেবা!

শ্রীম (যোগেনকে লক্ষ্য করে ভক্তদের প্রতি) — অনেকে দক্ষিণেশ্বরে কত রইল, মঠেই বা কত গেল; কিন্তু যেই সেই। নূতন করে বিয়ে করে বুড়ো বয়সে সংসার পাততে যায়। চৈতন্য হয় কৈ! সংস্কার বদলায় কৈ!

সুধীর — সংস্কার কি বদলায়? আর কিসে বদলায়?

শ্রীম — চায় কে বদলাতে? আপনি চাইলে পারবেন বদলাতে। যে চায়, বুঝতে হবে সে মহৎ লোক। লোক চায় না যে মোটেই! আপনি যেকালে জানতে চেয়েছেন, মহৎ লোক হবেন। গীতায় আছে, জিজ্ঞাসু ও উদার। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী সকলেই 'উদারাঃ'। কেউ চায় না। খালি ঝগড়া করে। বলে, 'ও বেশী খেলে, ঐ ব্যক্তি আমায় খেতে দিলে না' এই সব করে মরে। ঠাকুর বলেছিলেন, কাঁচা দেয়ালে লোহা বিঁধান সহজ। পাকা দেয়ালে বিঁধাতে গেলে লোহাশুদ্ধ ফিরে আসে।

সাধুসঙ্গে সংস্কার বদলায়। নিষ্কামভাবে করা চাই। সংসারের কিছু না চেয়ে। কেবল জ্ঞান ও ভক্তি লাভের জন্য। সাধুসঙ্গ করলে তাঁদের সেবা করতে ইচ্ছা হবে। সেবা করলেই তাঁদের সঙ্গে ভালবাসা হবে। তখন তাঁরা যা করেন তা করতে ইচ্ছা হবে — ঈশ্বরের নাম গুণকীর্তন তাঁর চিন্তা। এই সব করতে করতে ঈশ্বরের উপর ভালবাসা হয়। তারপর শরণাগতি। তাঁর শরণাগত হলে আর ভয় নাই। তিনিই সব করবেন। দরকার হলে সংস্কার বদলে দেবেন।

ঠাকুর আমাদের এই কথা বলেছিলেন। শুধু বলেন নাই — জোর করে কাছে রেখে দিতেন আর সংস্কার বদলে দিতেন ভক্তদের। অশ্বিনী দত্তের পিতা ব্রজবাবুকে তিনদিন কাছে রেখে দিছলেন। তাঁর সংস্কার বদলে দিছলেন। যে চায় আন্তরিক, তার বদলে যায়।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — বিদ্যাসাগর মশায়ের একটি গল্প মনে

পড়ছে। (সহাস্যে) ওঁরই স্কুলের একজন হেড্‌মাস্টার (শ্রীম), নূতন লোক। বলছেন, ‘ইচ্ছা করলে ছেলেদের ভাল করা যায়।’ বিদ্যাসাগর মশায় মুচ্‌কি হেসে বললেন, ‘বেশ তো, পার তো কর না! কিন্তু বাপু, আমায় যদি বল, জিজ্ঞেস কর — তবে আমি বলি, যার হবার তার হবে।’ তারপর একটি গল্প বললেন — ‘আমি তখন সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপ্যাল। বছর দশেকের একটি ছেলে ভারি দুষ্টুমি করে। সকলেই নালিশ করে। একদিন স্কুলের ছুটীর পর তাকে নিয়ে ছাদে যাই। বললাম, দুষ্টুমি করিস কেন? ছাদ থেকে তোকে এক্ষুণি ফেলে দিব। ছেলের কানে একথা ঢুকছেই না। সে তার মৌজে আছে. মুখে কোন কথা নাই! তারপর তাকে দুহাতে ধরে একেবারে নিচে ঝুলিয়ে ধরলাম। ভ্রূক্ষেপই নাই তার! নির্ভীক — চেয়ে আছে। আমার হাতে পুঁথি ছিল। এবার তার কাঠ দিয়ে খুব মার দিলাম। তবুও কোন কথা নাই। শেষে একবার মাত্র বললে, আঃ, লাগে যে’। সেও কত patronising way-তে (মুরুব্বিয়ানা করে) (সকলের হাস্য)। আহা, কি পাকা কথাই বলেছিলেন বিদ্যাসাগর মশায় — ‘যার হবার তার হবে।’

তেমনি সংস্কার বদলানো — জ্ঞান ভক্তি লাভ, যার হবার তার হবে। সকলের হয় কৈ? কত মঠ দক্ষিণেশ্বর করলো। আবার নয়া সংসার পাততে চায়। The leviathan will never get tamed (সামুদ্রিক দানব কখনও বশ মানে না)।

শ্রীম-র চেষ্টায় যোগেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের খাজাঞ্চীর কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কর্মচারীদের সঙ্গে অমিল হওয়ায় ঐ কর্ম ছাড়িয়া দেন। আর দেশে যাইয়া পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন সংসার পাতিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁর বয়েস পঞ্চাশের উপর। পূর্বের একটি ছেলে আছে। ঐ বিপদ হইতেও শ্রীম-র কৃপায় তিনি রক্ষা পান।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একজন এসে ঠাকুরকে বলছে আমার বড় দুঃখ। ঠাকুর শুনে বললেন, বাবা সুখের চাইতে দুঃখ ভাল। প্রবৃত্তির চাইতে নিবৃত্তি ভাল। এতে মন তাঁর দিকে থাকে। আর একবার কামারপুকুর থেকে একটি স্ত্রীলোক এসেছে। সে ঠাকুরকে

বলছে, আমার কেউ নাই। শুনে ঠাকুর ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন। আর বলছেন, 'যার কেউ নাই তার হরি আছে।' মেয়েটি তারপর শান্তি নিয়ে ফিরে গেল।

শ্রীম-র রাত্রির আহার আসিয়াছে। ইনি উঠিয়া চারতলার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তরা অনেকে বিদায় লইলেন। ভোজনের পর ছাদের উপর মাদুরে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন, শিয়র পশ্চিম দিকে। পাশে বড় জিতেন, বলাই, ছোট জিতেন ও জগবন্ধু বসিয়া আছেন। সকলেই নির্বাক। শ্রীম শুইয়া শুইয়া আকাশ দেখিতেছেন। কিছুকাল পর কথা কহিলেন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — কি কাণ্ডটা তিনি করেছেন, একবার চেয়ে দেখুন না! এতকাল ধরে ওরা (বৈজ্ঞানিকেরা) অত দেখছে। কিন্তু এত চেষ্টা করেও nearest star-টার (নিকটতম তারার) দূরত্ব বের করতে পারলে কৈ। একবার বুঝি কে করেছিল, টেগোনোমেট্রিকেল সার্ভে, অর্থাৎ Given the base, and the angles at the base, solve the problem কিছুই ফল হয় নাই তাতে। (অন্তেবাসীর প্রতি) আপনার তো ট্রিগোনোমেট্রি ছিল?

আমাদের যে কথা (সমস্যা) নক্ষত্রে একজন থাকলে তারও সেই কথা। দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব যে যেখানে আছে সকলেরই একই কথা।

এখান থেকে যদি একটা straight line (সরল রেখা) টানা যায় আর ঐটে God-কে (ঈশ্বরকে) centre (কেন্দ্র) করে ওদিকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় আর base-টাও (তলদেশের রেখাটা) produce করা (বাড়িয়ে দেওয়া) যায়, it will never meet (এটা কখনও মিলবে না); কিন্তু এমনি মনে হচ্ছে vertex-এ (ত্রিভুজ শীর্ষে) meet (স্পর্শ) করবে। কিন্তু এখানে তা হচ্ছে না। They will never meet at the vertex. Because they are parallel straight lines. (তারা ত্রিভুজ শীর্ষে কখনও মিলিত হবে না। কারণ তারা সমান্তরাল রেখা)। Parallel straight lines-এর (সমান্তরাল রেখার) definition (সংজ্ঞা) হলো straight lines

which meet in infinity (অনন্তে গিয়ে যে রেখাদ্বয় মিলিত হয়)। অনন্তে আবার মিলন কি?

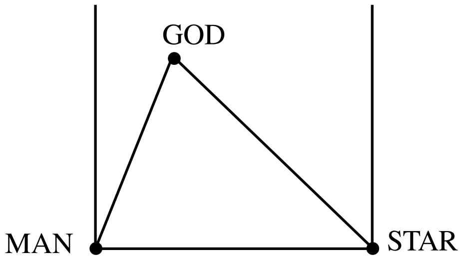

রাত্রি সাড়ে দশটা। শ্রীম উঠিয়া উত্তরের দিকে একাকী পায়চারী করিতেছেন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ১৬ই এপ্রিল, ১৯২৪ খৃঃ।
৩রা বৈশাখ, ১৩৩১ সাল। বুধবার, দ্বাদশী।

চতুর্দশ অধ্যায়

মহাসমাধিমগ্ন ক্রাইস্ট

১

অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম ঠাকুরবাড়ি হইতে মর্টন স্কুলে আসিয়াছেন। অর্চনালয়ের ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার আর গিরিশবাবুর ভক্ত যামিনী ডাক্তার শ্রীম-র জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীম চারতলায় উঠিতেছিলেন, ক্লান্ত হইয়া দোতলায় সিঁড়ির কাছে বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলেন। সংবাদ পাইয়া ভক্তগণ নিচে নামিয়া আসিলেন। প্রাণেশকুমার শ্রীমকে ইটালীর উৎসবের নিমন্ত্রণ করিলেন।

আজ ১৭ই এপ্রিল, ১৯২৪ খৃস্টাব্দ। ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩১ সাল। বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী। শ্রীম যামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেউ লিখছেন কি, গিরিশবাবুর life (জীবনী)? কে কে থাকতেন সর্বদা কাছে? এটা তাঁদেরই কাজ।' যামিনী উত্তর করিলেন, 'এতে গোঁড়ামীর ভয় থাকে।' শ্রীম প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'না, 'খালি facts (ঘটনা)গুলি দিয়ে লিখলে এ হয় না। যারা সর্বদা কাছে থাকে তাদেরই এই কাজ। অপরে করলে অন্য রকম হয়ে যায়। চণ্ডীবাবু লিখেছেন বিদ্যাসাগর মশায়ের জীবন-চরিত। উনি সর্বদা তাঁর কাছে বসতেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আমরা আগে hero worship (বীরপূজা) করতাম। একবার একটা কলেজ রি-ইউনিয়ানে বঙ্কিমবাবুকে দেখতে গেছি। উনি যেখানে যাচ্ছেন পিছু পিছু যাচ্ছি সেখানে।

(সহাস্যে) একবার বঙ্কিমবাবুকে একখানা চিঠি লিখা হ'ল তাঁর ফটো চেয়ে। উনি জবাবে লিখলেন, 'আমি বড়ই দুঃখিত। যে কয়খানা ছিল সবই ফুরিয়ে গেছে (সকলের উচ্চ হাস্য)।' তখন পড়াশোনা করা যাচ্ছে।

বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে সঙ্গেও যেতাম। এ-বাড়ির বাইরে ও-বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। উনি ঢুকছেন এ-বাড়ি ও-বাড়ি।

শ্রীম (নয়ন-হাস্যে, ভক্তদের প্রতি) — আহা, বিদ্যাসাগর মশায় কি কথাই না বলেছিলেন! বলতেন, 'ঈশ্বর তো আমাদের পিতা। আমরা তাঁর কথা না শোনায় বাবা আমাদের পঁচিশ বেত মারবেন। আর কেশব সেনকে মারবেন পঞ্চাশটা! পঁচিশটা বেশী মারবেন ওঁর দোষের জন্য। বাপ যখন ছেলেকে বলবেন, তোমার এই এই দোষ। ছেলে তখন বলবে, কেশববাবু আমাদের এ-সব করতে বলেছেন। পঁচিশটা বেশী এই জন্য। আহা কি বিশ্বাসের কথা!

ভাগ্যিস, আমাদের এ hero worship-টি (বীরপূজাটি) ছিল। তাই ঠাকুরকে যেদিন থেকে দেখেছি সেদিন থেকেই ধরে ফেলেছিলাম।

গিরিশবাবুর সম্বন্ধে আরো কিছুক্ষণ কথা হইল। ভক্তগণ বিদায় লইলেন। শ্রীম জগবন্ধু, উমেশ ও শান্তিকে সঙ্গে লইয়া চারতলায় উঠিতেছেন।

ক্ষণকাল মধ্যে ছাদে ভক্তসভা বসিয়াছে। অনেক লোক আসিয়াছেন। বড় জিতেন, ছোট জিতেন, শুকলাল, মনোরঞ্জন, ডাক্তার, বিনয়, বলাই, যোগেন, খোকা, জগবন্ধু প্রভৃতি রহিয়াছেন। গ্রীষ্মকাল কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া চলিতেছে। শ্রীম আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (যোগেনের প্রতি) — একটি স্থান করুন থাকবার। আসন করতে হয়। ঠাকুর একটি ভক্তকে বলেছিলেন, 'এই রইলো তোমার কুটীরটি। দুপুরে শাকভাত নুন দিয়ে খাবে। রাত্রে কিছু হলো তো ভাল। না হয়তো নাই হলো। আর সারা দিনরাত জপ কর।' দেখুন, কি সহজ করে problem of life (জীবনের সমস্যা) solve (সমাধান) করে দিয়ে গেছেন। ওদেশে (ওয়েস্টে) এ সব হয় কৈ? তাই আপনারা একটি আসন করুন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দক্ষ রাজা একজন প্রজাপতি। তাঁর দশ হাজার পুত্র। নারদ তাদের বললেন, 'তোমাদের পিতা বিয়ে দিয়ে রাজ্য দিয়ে তোমাদের আটকাবেন। তোমরা সংসারে বন্ধ হয়ো না।

হরিপাদপদ্ম চিন্তা কর। তাহলে মুক্ত হয়ে যাবে। তারপর তাদের নিয়ে একটি হ্রদের কাছে গেলেন। তারা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে সমাধিতে দেহত্যাগ করলো। দক্ষ বড় ভাই কিনা! রেগে নারদকে তখন বলছেন, 'ওরে অর্বাচীন তুই করলি কি? তুই কি জানিস! কর্ম না করলে কিছুই হয় না। তুই পরামর্শ দিয়ে এদের জীবন নষ্ট করেছিস্। আমার মনে কত কষ্ট দিলি। আমি তাই অভিশাপ দিচ্ছি, তুই ঘুরে ঘুরে বেড়াবি। (হাস্য) বেশ বলে কিন্তু যাত্রায়।

প্রজাপতির ইচ্ছা সংসারে জড়ান। নারদের ইচ্ছা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করা। দুটিই সত্য। দুইজনই ব্রহ্মার পুত্র। দক্ষকে তিনি বলে দিয়েছেন কর্মটর্ম করতে। নারদকে বললেন হরিপাদপদ্ম চিন্তা করতে। নারদ কেন নেবেন দক্ষের কথা!

কিন্তু অভিশাপ লাগলো। তাই নারদ ঘুরে ঘুরে বেড়ান। (যোগেনের প্রতি) — আপনিও তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ান (সকলের হাস্য)। তার চাইতে একটি কুটীর করে থাকা ভাল।

বিপিন সেনের প্রবেশ। ইনি ঠাকুরের পরম ভক্ত অধর সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। বিপিন গিল্যাণ্ডার কোম্পানীর খাজাঞ্চী। শ্রীম তাঁহার সহিত অতি স্নেহে কথা কহিতেছেন। অধরবাবুর মৃত্যুর সময়ের কয়েকটা ঘটনার আলোচনা করিলেন। শ্রীম বলিতেছেন, 'নূতন কাকীর (অধরবাবুর পত্নীর) উপর নজর রাখবেন। তাঁর কষ্ট না হয়।' 'প্রবাসী' খুলিয়া মা-ঠাকরুণের জীবনচরিত পড়িয়া বিপিনকে শুনাইতেছেন।

সতীশ মুখার্জীর প্রবেশ। উনি 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুরের ভক্ত উপেনবাবুর পুত্র। বসুমতীর সত্ত্বাধিকারী। শ্রীম পুত্রবৎ স্নেহে তাঁহাকে নিজের কাছে বসাইয়া কথা কহিতেছেন। এক একবার তাঁর গায়ে হাত বুলাইতেছেন। সতীশ নূতন 'কথামৃত' লিখিতে অনুরোধ করিতেছেন।

এইবার সন্ধ্যা হইয়াছে। আলো আসিতেই শ্রীম ঈশ্বরচিন্তা করিতে বসিয়া গেলেন। তারপর 'কথামৃত' হইবে। শ্রীম চতুর্থ ভাগ ত্রয়ত্রিংশখণ্ড বাহির করিয়া দিলেন। একজন ভক্ত পড়িতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে

বলিতেছেন, 'আমার কিন্তু বেশ বোধ হয় ভিতরে একটি আছে।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — স্পষ্ট করে বলছেন, 'আমি অবতার।' এ যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলা। ভগবান মানুষ শরীর ধারণ করেছেন। এতে আর সংশয় কি? নিজ মুখের কথা। কিন্তু তাঁর কৃপা ছাড়া এ কথা ধারণা হবার যো নাই। কতজনে শুনছে, ধারণা করতে পারে না।

শরীর ধারণ করলে শোকদুঃখ বিচলিত করে জ্ঞানীদেরও। ঠাকুর বলেছিলেন, কৃষ্ণকিশোর অত বড় জ্ঞানী। কিন্তু প্রথম!!! সামলাতে পারলো না। তাঁর দু'টি বড় বড় ছেলে মারা যায়। কলেজে পড়তো। অভিমন্যুর শোকে অর্জুন উন্মাদ — শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে তবুও।

শ্রীমও পুত্রশোকগ্রস্ত। তাঁহার ধর্মপত্নী সেই শোকে প্রায় উন্মাদপ্রায় সারাজীবন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শোকদুঃখ জ্ঞান ঠেলে ফেলে দেয়! তাই ঠাকুর বলছেন একথা। নরেন্দ্র অত বড় জ্ঞানী। পিতার মৃত্যুতে দুঃখে পড়েছেন। বলছেন, 'ঈশ্বর টীশ্বর নাই।' তা বলবেন না? শরীর ধারণ করলে শোকতাপ হয়। তখন জ্ঞান ঠেলে ফেলে দেয়। অত বেগ।

(সহাস্যে) নরেন্দ্র বলছেন, "উনি (ঠাকুর) আমায় বলেছিলেন, 'কেউ কেউ আমাকে ঈশ্বর বলে'। আমি বললাম, হাজার লোক ঈশ্বর বলুক আমার যতক্ষণ না সত্য বলে বোধ হয় ততক্ষণ বলবো না।"

বড় ফুল ফুটতে দেরী হয়। নরেন্দ্র পদ্মমধ্যে শতদল। ফুটতে দেরী হয় বটে কিন্তু থাকে অনেক দিন। অন্য ফুল আজ ফোটে কাল ঝরে। শতদল যখন ফুটলো তার সৌরভ কত, দেখ। তাঁর রচিত আরতি, স্তোত্র — এই সব সৌরভ।

কত বড় ধাক্কা। অতি বড় সংসার ঘাড়ে। হঠাৎ পিতা মারা গেলেন। ঘরে খাবার নাই। থাকে কি করে? আয়ের চাইতে খরচা বেশী। খুব খোলা হাত ছিল কিনা তাঁর বাবার! অনেক টাকা রোজগার করতেন; কিন্তু দানটানে আর ঘরের খরচায় সব শেষ হয়ে যেতো। তাই যখন হঠাৎ মারা গেলেন, ঘর শূন্য। সেই অবস্থায় কত অনাহার

গেছে। অনেক চেষ্টা করে বিদ্যাসাগর মশায়কে বলে একটি কর্ম জোগাড় হ'ল। তাঁর বৌবাজার স্কুলের হেড মাস্টারের কাজ। সেটিও গেল। কি সর্বনাশ! বিদ্যাসাগর মশায় বললেন, 'মহেন্দ্র তুমি নরেন্দ্রকে বলো আর না আসে'। ভক্তদের মাথায় যেন বজ্র পড়লো। নরেন্দ্রকে একথা কি করে বলবো? অত কষ্ট করে বলে কয়ে জোগাড় করা গেল আর হঠাৎ বললেন, নরেন্দ্রের দরকার নাই। বুকে সাহস বেঁধে নরেন্দ্রকে বললাম। কিন্তু নরেন্দ্র কোন প্রতিবাদই করলেন না। শুধু বললেন, 'কেন, ছেলেরা এ কথা বললে! আমি তো খুব খেটে খুটে পড়াতুম।' বস্ অন্য কথা নাই। তখনকার এই নির্দ্বন্দ্বভাব দেখে মনে হয়েছিল, নরেন্দ্র সত্যই মহাপুরুষ।

ঐ স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন বিদ্যাসাগর মশায়ের জামাই। উনি নরেন্দ্রের উপর favourable (প্রসন্ন) ছিলেন না। তাই ফারষ্ট আর সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেদের দিয়ে বলালেন, 'পড়াতে পারেন না'। কি বিপদ! যিনি সমস্ত জগৎকে শিখালেন তিনি পড়াতে পারেন না ছেলেদের! নরেন্দ্রকে যে পাকা মাঝি বানাবেন। তাই দারুণ শোকদুঃখ দিলেন। ঠাকুর সামনে তবুও নরেন্দ্রের দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে তবুও অর্জুনের বনবাস; পুত্রশোকে জর্জরিত। এ প্রহেলিকা কে বুঝবে?

সতীশ, বিপিন এরা সব চলিয়া গিয়াছেন। ভক্তরাও কেহ কেহ গিয়াছেন। এখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। শ্রীমও নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন নৈশ ভোজন করিতে। দশটার পর ফিরিয়া আসিলেন। মাদুরে বসিয়াছেন। খুব হাই তুলিতেছেন, শরীর বৃদ্ধ ও ক্লান্ত। শ্রীম-র কাছে মাদুরে বসিয়া আছেন, বড় জিতেন, শুকলাল, মনোরঞ্জন, ছোট জিতেন, বিনয়, বলাই ও জগবন্ধু। শুকলালবাবুর ভক্তদের মিষ্টিমুখ করাইবার ইচ্ছা। শ্রীম এই বিষয়ে রুলিং দিতেছেন।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — মা কালী কি ঠাকুরকে নিবেদন করে প্রসাদ পাওয়া যেতে পারে।

বড় জিতেন — ঠাকুরবাড়িতে দিয়ে তারপর পেলেও হয়।

শ্রীম — না, তা হয় না। তা হলে এক টাকার সন্দেশ কিনে

প্রসাদ করলে হয়।

বড় জিতেন — শুকলালবাবুর ইচ্ছে বেশী হয়।

শ্রীম — না, তা আর হয় না এখন — যে কালে suggest (প্রস্তাব) করলেন। Suggest (প্রস্তাব) না করলে শুকলালবাবুর যা ইচ্ছে তাই হতো। এখন আর হয় না।

রাধাকান্তের গয়না চুরির পর মথুরবাবু বললেন, 'কি ঠাকুর রাখতে পারলে না তোমার গয়না! ঠাকুর শুনে তক্ষুনি গর্জন করে উঠলেন। বললেন, ছিঃ, সেজোবাবু, তোমার একি হীনবুদ্ধির কথা! যিনি এই সমস্ত বিশ্ব নিমেষে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ধনের অভাব! তাঁর কাছে এসব মাটির ঢেলা।'

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঈশ্বর কি ধনে তুষ্ট! তিনি তুষ্ট হন জ্ঞান ভক্তিতে, বিবেক-বৈরাগ্যে।

একবার মা-ঠাকরুণ কালীঘাটে গেছেন। একটি ভক্তের বাড়িতে নিমন্ত্রণ। গরীব ভক্ত, দুটি খোলার ঘর মাত্র সম্বল। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। ডাল, ভাত, তরকারী মাত্র হয়েছে। মা শুধু ডাল ভাত বার বার চেয়ে এত খেলেন ভক্তরা দেখে অবাক। মায়ের এমন খাওয়া কেউ কখনও দেখে নাই! খালি বলছেন, আরও দাও, আরও দাও। ধনী ভক্তদের বাড়িতে কত রকম খেতে দিত। আঙ্গুল দিয়ে চেখে খাচ্ছেন সেখানে। আর ওখানে একরাশ ডাল ভাত খেলেন। ভক্তির অন্ন কিনা তাই শুদ্ধ।

বাইরের আড়ম্বরে ভক্তি কম পড়ে যায়। মানুষের মন তো সর্বদা ঐদিকে gravitate (আকর্ষণ) করছে। ফেশান হয়েছে ঠাকুরবাড়ি বানিয়ে খুব করে ভোগ দাও। এ যেন ঘটা করে ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা। দেখেন নাই কাতার দিয়ে মোটর দাঁড়িয়ে থাকে। ওতে ভক্তির টান পড়ে। কুড়ানো মন ছড়িয়ে যায়।

ঠাকুর ডাক্তারের অন্ন খেতে পারতেন না। বলতেন, ওরা লোকের মনে কষ্ট দিয়ে টাকা রোজগার করে। একজন বাবু যেতো ঠাকুরের কাছে আফিস কামাই করে। রাবড়ী নিয়ে যেতো। ঠাকুর খেতে

পারতেন না। একদিন বললেন, এ কে এনেছে এই মিষ্টি — গুয়ের গন্ধ বের হচ্ছে। শীগগীর বার করে দে। বলেছিলেন, 'এই ব্যক্তি বিল ডবল করে লিখে। চুরি করে রোজগার করে। তাই খেতে পারছি না তার জিনিষ।' উঃ কি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি!

আজকাল নানানখানে তাঁর উৎসব হচ্ছে। যে উপায়ে subscription (চাঁদা) তোলা হয়, ঠাকুরের সময় এটি হবার উপায় ছিল না। কাছের ভক্তরা ভিতরে ভিতরে সব চাঁদা তুলে উৎসব করতেন। অন্য লোক হয়তো ঠাকুরকে জানে না, ভালবাসে না। তার কাছে গিয়ে চাঁদা তোলা তিনি পছন্দ করতেন না। বলে দিয়েছিলেন, 'কারও কাছে চাওয়া হবে না। যার যা ইচ্ছা হয় দিক্'। ভগবান বাইরের আড়ম্বরে তুষ্ট নন। তিনি তুষ্ট হন ভক্তিপ্রেমে।

২

গ্রীষ্মের প্রভাত। এখন পাঁচটা। আজ গুড্‌ফ্রাইডে। শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন, পশ্চিমাস্য পূর্বদক্ষিণ কোণে। তাঁহার পাশে বিনয়, ছোট জিতেন, জগবন্ধু প্রভৃতি বসিয়া আছেন। সকলেই মাদুরে বসা। শ্রীম এক্ষণে উপনিষদ পাঠ করিতেছেন সুর সংযোগে।

শ্রীমকে দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন একজন ঋষি। তাঁহার কেশরাজি শুভ্র, শুভ্রশ্মশ্রু আবক্ষ বিলম্বিত। অন্তর্মুখীন সম্মুখ-ঠেলা উজ্জ্বল বৃহৎ নয়নযুগল। উন্নত ললাট, সুপ্রশস্ত বক্ষ। পদ্মাসনে সোজা হইয়া বসিয়া মধুর গম্ভীর কণ্ঠে পড়িতেছেন। মুখমন্ডলের প্রশান্তি জমাট বাঁধা। দর্শকের চিত্ত আপনিই শান্তিরসে পূর্ণ হয়। শ্রীম পড়িতেছেন আর মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিতেছেন। 'ব্রাহ্মধর্ম' নবম অধ্যায়ের আটাত্তর মন্ত্র থেকে দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত পড়িলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখুন, আমরা যে সব কথা বলে থাকি ঋষিরাও তাই বলছেন। এই রক্তমাংসের শরীরেই ঈশ্বরের দর্শন হয় — এই মানুষ শরীরে।

ঋষিরা বলছেন, 'তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বং' (শ্বেতা ৩/৯)। সেই

পূর্ণ পুরুষের দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ। ঠাকুরও বলেছিলেন, 'আমি দেখছি মা-ই সব হয়ে রয়েছেন। সব চৈতন্যময় দেখছি।' এইজন্য (মাদুরের উপর ছাদে আঘাত করিয়া) একে জড় বলবার যো নাই। (নিজের শরীরে আঘাত করিয়া) একেও জড় বলা চলে না। Outwardly (বাহ্যদৃষ্টিতে) না হলেও Potentially (তত্ত্বদৃষ্টিতে) চৈতন্যময় সব। রক্তমাংস দিয়ে কি আশ্চর্য বস্তুটি বানিয়েছেন! এর ভিতর কি করে ঢুকলো মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার। আবার জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য। এদিকে নজর করে কি লোক? এদিকে দৃষ্টি থাকলে কি করে বলা যায় creation automatic, কি chance creation (জগৎ আপনি হয়েছে, কি হঠাৎ হয়েছে)!

এ বললে তো explain (ব্যাখ্যা) করা হলো না। confuse (বিভ্রান্ত) করা হলো বুদ্ধিকে। এই প্ল্যানটির দিকে দৃষ্টি করলেই প্ল্যানারের কথা মনে এসে যায় আপনিই। Law of Probability অথবা Law of Finality (সম্ভাবনাবাদ অথবা অন্তিমবাদ) explain করতে পারে কৈ? আজ পর্যন্তও এর জবাব দিতে পেরেছে কি কেউ life (জীবন) এলো কি করে?

এই যে বিপরীত বুদ্ধি এও তিনিই দিয়েছেন। Thesis and antithesis (বাদানুবাদ, দ্বন্দ্ব, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ) বাধা না থাকলে মহত্ত্বের বিকাশ হয় না। contrast (তুলনা) তাই চাই।

সেই প্ল্যানারটি এই শরীরের ভিতর রয়েছেন। আর সমগ্র universe-এর (বিশ্বের) ভিতরও আছেন অন্তর্যামীরূপে। ঋষিরা স্পষ্ট করে বলেছিলেন, আমরা তাঁকে দেখেছি এই শরীরে — 'ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং'। কি স্পষ্ট উক্তি! আবার warn (সাবধান) করছেন — 'ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ'। এই শরীর থাকতে তাঁকে জানতে না পারলে দুঃখ অনিবার্য — 'অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি'। তাঁকে জানলে কি হয় তাও বলেছেন, — 'য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি'। মৃত্যুঞ্জয় হয়। আমি আত্মা, এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়।

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ : ৪/৪/১৪)

শরীর থাকবে না। মৃত্যুকে জয় করা মানে শরীর থাকবে না এটা বোঝা। তা হলে যা চিরকাল থাকবে তাতে মন যাবে — আত্মায়, ভগবানে। তখন মনে হবে — যে নাহং না মৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাং' (বৃহ : ২/৪/৩)। মৃত শরীরে অমৃত আত্মার দর্শন, এই শেষ কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যদি কেউ প্রশ্ন করে — কেন ঈশ্বরের শরণ নেবো, কেন তাঁকে ধরবো? তার উত্তর তিনি এই সব ধরে রয়েছেন। অতএব আমাদের উচিত তাঁকে ধরা। 'সর্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ' (বৃহ : ২/৫/১৫)। যেমন চাকার নাভি ও নেমিতে সবগুলি spokes (শলা) লেগে থাকে তেমনি সমস্ত বিশ্ব ঈশ্বরে সংবদ্ধ। কিংবা যেমন পক্ষী-সকল বৃক্ষে বাস করে তেমনি সমস্ত জীব ঈশ্বরে অবস্থিত — 'সর্বং পরমাত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে (প্রশ্নো : ৪/৭)। তাই তাঁর পূজা করা।

আর একটি কারণ আছে, কেন তাঁকে পূজা করবে লোক? শোক-দুঃখ জরামৃত্যুর হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাঁর শরণ দরকার। শরীর ধারণ করলে এগুলি অনিবার্য। এতেই লোক ভীত হয়। তাই অমৃতকে ধরে থাকলে, সুখ স্বরূপকে ধরে থাকলে নিজেও সুখময় হয়ে যায় — অমৃত হয়ে যায়।

তাঁর শরণ নেওয়ার, তাঁর পূজার minimum (সামান্যতম) আয়োজন কি তাও বলছেন ঋষিরা। শুধু নমস্কার মাত্র করলেও তাঁর পূজা হয়। 'যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ' (শ্বেতা : ২/৫) গীতায়ও আছে, 'নমস্যন্তে চ মাং' (গীতা : ৯/১৪)। ভাগবতেও আছে নমস্কার দিয়ে পূজা হয়। নমস্কার মানে শরণাগত। তাঁর তো কোনও অভাব নাই। তিনি কিছু চান না। আমরা চাই শোকদুঃখ থেকে মুক্ত হতে। সেই পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, তা যদি হতে চাও, তবে নিত্য মুক্ত, চির শান্ত 'আমাকে ধর'। আমায় ধরে সংসারে থাক। তা হলে ভয় নাই।

ঈশ্বরই জীবের আত্মা। তাঁকে জানলে অমৃতত্ব লাভ হয়, পরম

শান্তি লাভ হয়। এতো হলো। এখন সেই আত্মার জ্ঞানলাভ করতে কার কাছে যাব সেই কথা বলছেন। ঋষিরা বলছেন, যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, যাঁদের আত্মদর্শন হয়েছে তাঁদের কাছে উপদেশ নেও। ঋষিরা সকলকেই এই অমৃত দান করে গেছেন। ঘুম থেকে যেন ডেকে টেনে তুলেছেন আর বলছেন, ওঠ, জাগো। যাও যারা তাঁকে জেনেছেন তাঁদের কাছে গিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ কর, অমর হও। ইহাই জীবের একমাত্র কাম্য। বলছেন, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' (কঠো : ১/৩/১৪)। 'বরান্' মানে ব্রহ্মজ্ঞান। ঠাকুরও তাই বলেছেন — 'যে কাশী গিয়েছে,কাশী দেখেছে তার কাছে কাশীর খবর শোন।'

এখন সকাল সাতটা। বিনয় কাশীপুরের বাসায় চলিয়া গিয়াছেন। ছোট জিতেন ও জগবন্ধু শ্রীম-র কাছেই বসিয়া আছেন। আজ 'গুড্ ফ্রাইডে' শ্রীম তাই বাইবেল পড়িতেছেন। সেন্ট ম্যাথুর দ্বাদশ অধ্যায় থেকে আরম্ভ করে মাঝে মাঝে পড়িতেছেন। আর ঠাকুরের জীবন ও কথার সঙ্গে মিলাইতেছেন। তারপর ছাব্বিশ অধ্যায়ের শেষ হইতে আটাশ পর্যন্ত ক্রাইস্টের শরীর ত্যাগ বিষয়ক সমগ্র অংশ পাঠ করিলেন। সর্বশেষে সেণ্ট মার্ক, সেণ্ট লুক ও সেণ্ট জন থেকে শরীর ত্যাগ ও পুনরুত্থানের সমগ্র বিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কত করে নিজের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। কিন্তু চিনতে পারছে না লোক। বলছেন, 'That in this place there is one greater than the temple' (St. Matthew 12:67) (এইস্থানে এমন একজন আছেন, যিনি মন্দিরের চাইতেও বড়)। অন্তরঙ্গরাও কি সর্বদা চিনতে পারে? একবার বিশ্বাস হয়, আবার ঢেকে যায়। তাঁর ইচ্ছা না হলে বিশ্বাস স্থায়ী হয় না। আলো-আঁধারের মত ওঠাপড়া করে। একবার বিশ্বাস আবার অবিশ্বাস! যেন এই সূর্য এই মেঘ। ভুলিয়ে দেন তিনি তাঁর মহামায়ায়। তাইতো প্রার্থনা করেছেন — 'lead us not into temptation' (ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলিও না)। ঠাকুরও তারই প্রতিধ্বনি করেছেন,

তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।' ঋষিরাও প্রার্থনা করছেন, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়। এমনি কাণ্ড শরীর ধারণ করলে। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'। এও ঠাকুরের কথা।

তাঁকে ধরবার পূর্বে ক্রাইস্ট অন্তরঙ্গদের তিরস্কার করে বলছেন, 'এক ঘন্টা জেগে থাকতে পারছ না তোমরা। দেখ আমি কি করছি। আর শোন কি বলছি। কিন্তু তারা সব ঘুমিয়ে পড়ছে।

ক্রাইস্ট অন্তরঙ্গদের নিয়ে প্রায়ই নির্জনে একটা বাগানে চলে যেতেন। বাগানটা একটু দূরে ছিল মন্দির থেকে — চেড্রন (Cedron) নদীর তীরে। গ্রামটার নাম ছিল জেথসেমানী (Gethsemane)। আজই শেষ মিলন। একটু পরই তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে।

ভক্তদের বলছেন, 'শোন কি বলছি, দেখ কি করছি। তারপর পিটার আর জনকে (Peter, John) সঙ্গে নিয়ে আর একটু এগিয়ে গেলেন। বলছেন, এসো এখানে। শোন। ক্রাইস্ট খেদ করে বলেছেন 'My soul is exceedingly sorrowful even unto death:' (St. Matthew 26: 38) (মৃত্যু সমাগত আমি অতিশয় দুঃখিত)। এই কথাটাই ঠাকুর বাংলায় বলেছিলেন, 'আরোও দিনকতক দেহটা থাকলে জনকতকের চৈতন্য হতো। কিন্তু মা রাখবেন না।' তারপর ক্রাইস্ট আর একটু এগিয়ে প্রার্থনা করছেন, 'O my Father, if it be possible, let this cup pass from me' (St. Matthew 26:39)' বলছেন, 'এই বিপদ, আসন্ন মৃত্যু সরিয়ে নেও।' আহা, ঠিক যেন মানুষের উক্তি — মৃত্যু ভয়ে ভীত। একটু পরই আবার rally (শক্তি সঞ্চয়) করলেন। বলছেন, 'nevertheless not as I will, but as thou wilt.' (আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক)।

ক্রসের উপর থেকে চীৎকার করে বলছেন, 'Eli Eli lama Sabachthani? ... My God, my God, why hast thou forsaken me! (হে ঈশ্বর তুমি কি আমায় ত্যাগ করলে)? একেবারে মানুষের ব্যবহার।

নাইন্টিনাইন পয়েন্ট নাইন ঈশ্বরের অবতারের ভাব। পয়েন্ট ওয়ানে এইসব লোক-ব্যবহার। একেবারে ঠিক ঠিক মানুষের মত সব ব্যবহার। কেন, এ অভিনয়? না, দেখাতে — দেহবুদ্ধি যাওয়া কত কঠিন। রাম সীতার শোকে কাঁদেন, ক্রাইস্ট দেহত্যাগে ভীত। সাধারণ মানুষ সর্বদা এই ভুলের ভিতর বাস করে। যাদের কতক জ্ঞান হয়, তারা এঁদের এই সব ব্যবহারে সাহস পাবে। ভরসা হবে — এঁদেরই যদি এই আমাদের তো হবেই। এতে আর আশ্চর্য কি! তবুও তাঁকেই ধরে থাকবো। এই শিক্ষালাভ হবে জনসমাজের। দেখ কি রকম করে বলছেন, 'the spirit indeed is willing, but the flesh is weak,' (St. Matthew 26:41) বলছেন, মন যেতে চায়, কিন্তু দেহ চলছে না। কি প্রহেলিকা!

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — এই দেখ, এদিকে আবার বলছেন, — I have known thee (God) and these have known that thou hast sent me' (আমি জেনেছি তোমায়, এই শিষ্যরা জেনেছে আমি তোমার প্রেরিত)। আবার বলছেন, I came forth from the Father...again, I leave the world and go to the Father'(Compare John 14:28 and 16:30-31)। (আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি, জগৎ ছেড়ে আবার তাঁর কাছেই যাচ্ছি)। ঠাকুরও বলছেন, মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর সাকার নিরাকার সব ঐশ্বর্য, সব রূপ। আবার বলেছেন, সচ্চিদানন্দ এর ভিতর থেকে বের হয়ে একদিন বললেন, আমিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। বলেছিলেন — দেখলাম, সত্ত্বগুণের পূর্ণ আবির্ভাব। আবার শরীর ত্যাগের আগে বলেছিলেন, ‘আমি মুখ্খু বামুন, মায়ের সব ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিচ্ছি সকলকে। তাই মা নিয়ে যাচ্ছেন।’ মায়ের কাছ থেকে এসেছেন মায়ের কাছে যাচ্ছেন। মা-ই মানুষ হয়েছেন আবার চলে গেলেন।

কি আশ্চর্য! অত করে বললেন ক্রাইস্ট, তবুও যখন তাঁকে ধরে ফেললো তখন সকলে পালাল। তিনি একথা পূর্বে জানতেন, তাই

পূর্বেই বলেছিলেন, 'And (ye) shall leave me alone : and yet I am not alone, because the Father is with me.'(St. John 16:32), (তোমরা আমায় ফেলে পালাবে, জানি। কিন্তু আমি কখনও নিঃসঙ্গ নই। কারণ পরমপিতা সদা আমার সঙ্গে রয়েছেন)।

ক্রাইস্টকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পিটার ও জন সঙ্গে সঙ্গে চললেন। কিন্তু পিটারকে যখন লোক ধরে ফেললো ক্রাইস্টের সঙ্গী বলে, তখন তিনি অস্বীকার করলেন। বললেন, I know not this man (আমি একে জানি না)। তিনবার এরূপ অস্বীকার করলেন। অথচ এই পিটার-ই ক্রাইস্টের ধর্ম প্রচারের মূল স্তম্ভ। ক্রাইস্ট নিজে বলেছিলেন, "..... and upon this rock I will build my Church ; (St. Matthew 16:18) — এই বিশ্বাসের পাহাড়ের উপর আমি ধর্মচক্র স্থাপন করবো।

ধরা পড়ার কিছুকাল আগে ভক্তদের পরীক্ষাচ্ছলে বলেছিলেন, তোমরা আমার জন্য বিপদে পড়বে। পিটার বলেছিলেন, তোমার জন্য দেহ প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত করবো ; তবুও তোমায় ছাড়বো না। কেন? না, 'thou hast the words of eternal life' (St. John 6: 68) — আপনি অমৃতত্ব বিতরণ করছেন যে তাই! ক্রাইস্ট তখনই হেসে বললেন, '..... before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice.' (St. Mark 14:30) — অর্থাৎ ভোর হবার পূর্বেই তিনবার আমায় অস্বীকার করবে তুমি। পিটার অস্বীকার করলেন বটে, কিন্তু যেই এই মহাবাণী স্মরণ হল অমনি কাঁদলেন আকুল হয়ে নিজের দুর্বলতা দেখে।

ঠাকুরের হাত ভেঙ্গে গেছে; যন্ত্রণায় কাঁদছেন। আবার ঈশ্বরের কথা হতেই সমাধি। এই জগতে নাই। তখন কত নাচ গান কত ঈশ্বরীয় কথা। যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক তখন।

ঠাকুর বলেছিলেন পানায় জল ঢেকে দেয়। একটু সাফ করলে অমনি আবার নাচতে নাচতে পানায় সব ঢেকে ফেলে। এরই নাম

মহামায়ার খেলা। জ্ঞান-অজ্ঞানের ওঠাপড়া চলছে সদা। কার সাধ্য তাঁর শক্তি ছাড়া এসব তত্ত্ব বোঝে। যারা এই আলো-আঁধারের ভিতর জেনেশুনে চলে যায় তাঁরাই মানুষ। ঠাকুর যেন সাততলা থেকে একতলায় নেবে আসতেন। আবার সাততলায় চলে যেতেন।

বড় জিতেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশ প্রবেশ করিলেন। সতীশ এম.এ. পাশ।

শ্রীম (সতীশের প্রতি) — এই শোন, ক্রাইস্ট বলছেন ঈশ্বরীয়ভাবে ভক্তদের দেখিয়ে, 'এরাই আমার মা, এরাই আমার ভাইবোন।' নিজের মা-ভাইকে অস্বীকার করলেন — মায়ার সম্পর্ক কিনা! জন সর্বদা সঙ্গে থাকতেন, আর প্রেমিক ভক্ত। জন আর জেমস্ এঁরা তাঁর মাসতুত ভাই। ক্রাইস্টের অনেকগুলি ভাইবোন ছিল। দুই মেরী ও ম্যাসী। জর্জ পন্টিয়াস পায়লেট লোক মন্দ ছিল না কিন্তু সুনামের আকাঙ্ক্ষায় সাহস করে সত্য রক্ষা করতে পারলেন না। ক্রাইস্ট নির্দোষ বুঝেও তাঁকে মুক্তি দিতে পারলে না। চাকরীর ভয়, পুরোহিতগণ বিপক্ষে যাবে তা হলে। তার স্ত্রী বিচারের দিন স্বপ্নে ক্রাইস্টকে দর্শন করেছিল। স্বামীকে বলেছিল উনি মহাপুরুষ। কিন্তু তবুও জেনেশুনে ভয়ে ভয়ে তাঁকে ক্রুশে দিল। গভর্ণর ছিল, ভয় পাছে চাকরী যায়!

সব গভর্ণরদের একই অবস্থা। কোন প্রদেশে কিছু হলে অমনি হৈ চৈ পড়ে যায়। পুরোহিতরা বলেছিল, একে না মারলে আমরা বলবো তুমি সিজারের শত্রু। সিজার সম্রাট। জেরুজালেম তখন রোমের অধীন ছিল।

অন্তরঙ্গ জুডাস (Judas) betray (প্রতারণা) করেছিলেন। যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন কেঁদে অনুশোচনায় আত্মহত্যা করলেন। মহামায়ার এই খেলা। হরিদাস চৈতন্যদেবের পার্ষদ ছিলেন। তাঁর কথা অমান্য করায় নির্বাসিত হলেন। তারপর অনুশোচনায় ত্রিবেণীতে আত্মহত্যা করলেন। এঁরা লোক ভাল ছিলেন। জগতের শিক্ষার জন্য ঈশ্বরই এঁদের দ্বারা এইসব করালেন। তবে লোক নিজের অহংকার ছেড়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবে। হরিদাসের আত্মহত্যার সংবাদ যখন

একজন বললেন, চৈতন্যদেব তখন ঈশ্বরীয় কথা কইছিলেন। শুনে বললেন, 'স্বকর্মভুক্'। এই একটিমাত্র কথা কয়ে যেমন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করছিলেন তেমনি করতে লাগলেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — উত্তররামচরিতে আছে, 'বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি।' এই লক্ষণ মহাপুরুষ চরিত্রের। নৈতিক ব্যাপারে ব্রজের চাইতেও কঠোর। অন্য সময় দয়ার সাগর। মেরী কেরোলিনাতে বেশ description (বর্ণনা) আছে ক্রাইস্টের।

এখন সকাল সাড়ে আটটা। শ্রীম উঠিয়া সিঁড়ির ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একটি যুবক বসা দেড় ঘন্টা। শ্রীম বিস্ময়ে তাকে বলছেন, কি আশ্চর্য! অতসব কথা হলো — তুমি গেলে না কেন? নদীর ধারে এতো কাছে থেকেও জলের তৃষ্ণা!

৩

অপরাহ্ন একটা। শ্রীম সিঁড়ির ঘরে বসিয়া আছেন হাতে 'কথামৃত' প্রুফ ও কলম। অন্তেবাসী কপি পড়িতেছেন। সারা বিকাল দুইজনে বসিয়া প্রুফ দেখিলেন। আজ বিকালে কথা ছিল শ্রীম দক্ষিণেশ্বর যাইবেন। সেইজন্য বিনয়, ছোট জিতেন ও মনোরঞ্জন পূর্বেই দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলেন। শ্রীমকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম সব কথা শুনিয়া বলিলেন, 'হাঁ, যাওয়া তো ঠিক ছিল। কিন্তু এতগুলি প্রুফ এসে পড়লো। কপালে না থাকলে হয় না। সৎ কাজে শত বাধা। বেশ করেছেন আপনারা দর্শন করে এলেন। ওখানে দাউ দাউ করে (অধ্যাত্ম) আগুন জ্বলছে। যে প্রবেশ করে সে শুদ্ধ হয়ে যায়। সেখানে দেহ জ্বলে না। মনের ময়লা ভস্মীভূত হয়ে যায়। অমৃতত্ব লাভ হয়। ভগবান সশরীরে ত্রিশ বছর ছিলেন। একদিন থাকলেই রক্ষে নাই তা ত্রিশ বছর! জমাট বাঁধা ধর্ম সেখানে।'

একতলা থেকে চারতলার ছাদে উঠিবার একটি আছে লোহার ঘোরান সিঁড়ি (spiral staircase)। উহার উপরের কতকটা অংশ ভাঙ্গিয়া আলগা হইয়া গিয়াছে। প্রুফ দেখিতে দেখিতে সে কথা

স্মরণ হওয়ায় অন্তেবাসীকে লইয়া সেখানে গেলেন। উপরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। অন্তেবাসী একটি রশি দিয়া উহা বাঁধিয়া রাখিলেন। পুনরায় শ্রীম আসিয়া প্রুফ দেখিতেছেন। ঐ ভাঙ্গাটি বিপজ্জনক। তাই হাতের কাজ ফেলিয়া দিয়া উহা আগে করাইলেন।

এখন চারটা। বেলুড়মঠ হইতে একজন ব্রহ্মচারী আসিলেন, মনু। তাঁহাকে শ্রীম কাছে বসাইয়া বলিতেছেন, "শুনুন, ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আমার কিছু ভাল লাগে না। শুনতেও পারতেন না অন্য কথা, কইতেও পারতেন না। এমনি অবস্থা। সর্বদা মুখে, 'মা মা'।" ব্রহ্মচারী মিষ্টি মুখ করিয়া বিদায় লইলেন।

সন্ধ্যার অল্প বাকী। অতি প্রবল জল ঝড় আসিয়াছে। সিঁড়ির ঘরেও জল ঢুকিতেছে শার্শীর ফাঁক দিয়া। শ্রীম হাতের কাজ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। পা হইতে চটিজুতা অসংলগ্ন হইয়া গেল। যুক্ত করে দাঁড়াইয়া শার্শীর ফাঁক দিয়া ঝড় দর্শন করিতেছেন — মায়ের প্রলয়ঙ্করী মূর্তি।

আবার প্রুফ দেখিতেছেন; অন্তেবাসীর হাতে কপি। সন্ধ্যার আলো আসিতেই সব কাজ বন্ধ করিলেন। ভক্তগণ অনেকে আসিয়া পূর্ব হইতেই বসিয়া আছেন। অত দুর্যোগেও বড় জিতেন, অমৃত, বলাই, শান্তি, ছোট জিতেন, বিনয়, মনোরঞ্জন, জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়াছেন। মৌতাতের টান বুঝি অত দুর্যোগকেও অগ্রাহ্য করে। ডাক্তার বক্সী কোনও বিপদ মানেন না, নিত্য আসা চাই, কি বীর! তিনিও আসিয়া জুটিলেন। সকলে শ্রীম-সঙ্গে, কিছুকাল ধ্যান করিতেছেন।

এবার 'কথামৃত' পাঠ। শ্রীম অতিশয় ক্লান্ত। তাই কথা না বলিয়া 'কথামৃত' দ্বিতীয় ভাগ ঊনবিংশ খণ্ড বাহির করিয়া দিলেন। একজন ভক্ত পড়িতেছেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশান মুখার্জীকে শিক্ষা দিতেছেন। বলিতেছেন, দিনকতক পাগল হয়ে যাও তাঁর নামে। সালিসী মোড়লী ছেড়ে দাও। কোশাকুশী ছেড়ে 'মা মা' বলে কাঁদ ইত্যাদি।

পাঠক (পড়িতেছেন) ঠাকুর বলিলেন — সাধকের অবস্থায় খুব

সাবধান হতে হয়। তখন মেয়েমানুষ থেকে খুব অন্তরে থাকতে হয়। ...ভগবানকে দর্শনের পর বেশী ভয় থাকে না, অনেকটা নির্ভয়।

একজন ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — সিদ্ধাবস্থায়ও পতনের ভয় থাকে!

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, মা যাকে ধরে থাকেন, তার থাকে না। ভয় আছে বৈকি, কম।

তখন সাক্ষাৎ ভগবতী দেখে মেয়ে মানুষকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে। ঠাকুর বলছেন তাই তখন আর 'তত ভয় নাই'। তা হলে বোঝা যাচ্ছে ভয় থাকে। এতে আর আশ্চর্য কি! বলেছিলেন, 'যুবতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরমহংসেরও পতন হয়।' লোকশিক্ষার জন্য তাই ঠাকুর সারাজীবন সাবধান হয়ে থাকতেন। কেউ এলো — বেশীক্ষণ আছে বুঝতে পেরে অমনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। বলতেন, 'আচ্ছা আমি বাইরে থেকে আসি।' হয়তো মন্দিরে চলে গেলেন। বলতেন, 'কথাটা এই, বুড়ী ছুঁয়ে যা ইচ্ছা কর।' আগে তো সাবধান হয়ে সাধন করে তাঁকে দর্শন কর। তাহলে জন্মমরণের পার হয়ে গেল। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হল। ততদিন সাবধান হওয়া চাই-ই। তারপর তাঁর যা ইচ্ছা!

শ্রীম (সহাস্যে ভক্তদের প্রতি) — 'ইংলিশম্যানরা' (ইংরেজীশিক্ষিত লোকেরা) সংস্কার মানে না। তাই তাদের বলতেন 'সংস্কার মানতে হয়।' আস্তে আস্তে lead (চালনা) করছেন। আবার যুক্তিবাদী এরা। তাই বলছেন, লালাবাবুর কথা। একজন একটা খড়ের ঘর ছেড়ে দিতে পারে না। আর লালাবাবু সাত লাখ টাকা আয়ের জমিদারী ছেড়ে দিলেন যৌবনে। পূর্বজন্মে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন। তাই হলো এটি। ঠাকুর বলছেন, শেষ জন্মে সত্বগুণ থাকে, ভগবানে মন হয়।

পাঠ চলিতেছে। দয়ানন্দ সরস্বতী, থিওজফি এসব কথা আসিয়াছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজ করেছেন। কলকাতা এসেছিলেন। এইদিন সেভেন্টিটুর ডিসেম্বর থেকে সেভেন্টিথ্রির মার্চ পর্যন্ত ছিলেন। কেশববাবু তখন ঠাকুরদের নৈনানের বাগানে ছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গি'ছলেন। ঠাকুরের নিমন্ত্রণ ছিল ওখানে সেদিন। ঠাকুর হেসে হেসে গল্প

করতেন। দয়ানন্দ বলেছিলেন, 'রাম রাম না বলে সন্দেশ সন্দেশ বল।' কাপ্তেনও সেখানে ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে 'রাম রাম' করছিলেন। তাইতে ঐ কথা বললেন। নিরাকারবাদী কিনা উনি। মনে হয়, কাপ্তেন ঐ সময় প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। ঠাকুরের সমাধি হয়ে গিছলো। একজন, কাপ্তেনই বুঝি, ঠাকুরকে দেখিয়ে দয়ানন্দকে বলেছিলেন, 'আপনার এ অবস্থা হয়?' তিনি উত্তর করলেন, 'না; — পাণ্ডিত্যাভিমান হ্যায়। শাস্ত্রমে যো পড়া হ্যায় আজ ওহি দর্শন কিয়া।' এতেই মনে হয় বড় লোক। মহাপুরুষ ছাড়া এরূপ স্পষ্ট কথা লোক সমক্ষে বলতে পারে না।

শ্রীম চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পাঠ হইতেছে। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সিঁতির পণ্ডিত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছেন থিওজফি সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা? ঠাকুর বললেন, যদি ঐ পথে ভগবান লাভ হয় তো ভাল। বললেন, 'ভক্তিই একমাত্র সার — ঈশ্বরে ভক্তি।' কি উদার দৃষ্টি! এই একটা মাপকাঠি দিয়ে দিলেন। যে কোনও মত হউক যদি তার উদ্দেশ্য হয় ঈশ্বর দর্শন তবে ঐ মত ঠিক। ঈশ্বর দর্শন উদ্দেশ্য না হলে উহা ধর্মই নয়। তারপর আর একটা টেস্ট হলো, ঐ মত অনুসরণ করে কেউ ঈশ্বর দর্শন করেছেন কিনা? ঈশ্বর দর্শন না করে মত চালাতে গেলে চলে না বেশী দিন। ধরা পড়ে যায় শেষে। যিনি মত প্রবর্তক তার ঈশ্বর দর্শন করা চাই আগে। তবে অপরে নেবে। ঠাকুর বলছেন, সাধন চাই। তাঁর জন্য ব্যাকুলতা চাই। বলছেন, শাস্ত্র বল, দর্শন বল, বেদান্ত বল, কিছুতেই কিছু নাই। তপস্যা চাই।

লোক বলে কিনা অমুক বড় জ্ঞানী। তাই ঠাকুর জ্ঞানীর লক্ষণ বলছেন, ঈশ্বরের জন্য তার প্রাণ ছট্‌ফট্ করবে, অত অনুরাগ তাঁ'তে। আর একটি লক্ষণ, কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। তখন ঈশ্বরে অচলা ভক্তি হয়। বই পড়লে কি বক্তৃতা দিলেই জ্ঞান হলো না। বিষয়ীর 'বিষয়ে' যে ভালবাসা, সেটি ভগবানে গেলে তবে জ্ঞান। অত বড় লোক কেশব সেন — কত ভালবাসতেন ঠাকুর, তাঁকেই বললেন, তুমি

লোকমান্য, বিদ্যা এসব নিয়ে রয়েছ তাই হয় না। কেশববাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিনা, ঈশ্বর দর্শন কেন হয় না? তাই ঐ কথা অত স্পষ্ট করে বললেন। নইলে বুঝবে কি করে লোক।

একজন ভক্ত (বিনীতভাবে) — ঠাকুর বলছেন, সংসারী লোকগুলো তিনজনের দাস — মেগের দাস, টাকার দাস আর মনিবের দাস। পদার্থহীন যেন 'গোবরের ঝোড়া'। তাদের উঠবার উপায় কি?

শ্রীম — ঠাকুরের কথা শোনা। তিনি যা বলেছেন তা করা। তাঁর শরণ লওয়া। তাঁর প্রত্যক্ষ রূপ সাধু। তাঁদের সঙ্গ করা। তাঁদের সেবা করা। এ অবস্থা থেকে যাঁরা উপরে উঠেছে তাঁদের কথা শোনা দরকার। যে ব্যক্তি নিজের অবস্থা বুঝতে পেরেছে তার হয়ে যাবে সব যোগযোগ। তিনিই তার সব যোগাড় করে দেন। বিপদ হচ্ছে এইটা কেউ বুঝতে চায় না — নিজের অবস্থা। অপরের দোষ দেখে অপরকে খালি উপদেশ দেয় — উদ্ধার করে। নিজের অবস্থা বুঝতে চায় কৈ! বুঝলে এক্ষণি হয়ে যায়। তাহলে আর বক্ বক্ করে না।

পাঠ শেষ হইয়াছে। বড় জিতেন প্রশ্ন করিতেছেন।

বড় জিতেন — ঈশানবাবুকে সালিসী মোড়লী ছেড়ে, কোশাকুশী ফেলে দিয়ে পাগল হতে বলছেন ঠাকুর ঈশ্বরের নামে। ইনি ছাড়তে পারছেন না। বলছেন, প্রকৃতি করাচ্ছে। এখন এই প্রকৃতি — এই সংস্কার নাশ হয় কিসে?

শ্রীম — ঠাকুর যা বলেছেন তা করলে। মহামায়ার শরণ লওয়া। আর কিছুকাল এসব ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে পড়া। দিনরাত এর ভিতর থাকলে হয় না। যা বলেছেন, দূরে সরে গিয়ে তা পালন করার চেষ্টা করা চাই। চেষ্টা আর প্রার্থনা এই পথ। বাকীটা তাঁর ইচ্ছা। ঈশানবাবুর প্রকৃতি নাশের উপায় তো ঠাকুর নিজেই করিয়ে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে। ঈশানবাবু তখনই চরণ ধরে শরণ নিলেন যে। আর বাকী রইল কি? যিনি বেঁধেছেন তিনিই মুক্ত করছেন। ধন্য ঈশানবাবু!

একজন ভক্ত — স্ত্রীলোক পুরুষ সাধকের বিঘ্ন, ঠাকুর বলেছেন। তেমনি পুরুষও কি স্ত্রী সাধকের বিঘ্ন?

শ্রীম — কাজে কাজেই। দুটি একত্র মিল হলেই সংসার। যেদিক থেকেই মিল হউক। তাই সাধকের অবস্থায় দুইয়েরই সাবধানতা চাই। ঠাকুরের স্ত্রীভক্তরা পুরুষদের সঙ্গে মিশতেন না। মাকে দেখ। আমরা জানতেও পারি নাই অনেক দিন ধরে তাঁকে। বলতেন, 'রামলালের খুড়ী' নবতে আছে। মা বলতেন, কড়েরাড়ী নিজের বাপ ভাইকেও বিশ্বাস করবে না। মাঠাকরুণের মুখ কেউ দেখতে পেতো? সর্বদা ঘোমটার ভিতর থাকতেন। বুড়ো হয়ে গেলেও ঘোমটা খুলেন নাই। মায়ের আচরণ স্ত্রী সাধকের আদর্শ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর কি আর কাউকে নিন্দা করছেন? তা নয়। তাঁতে নিন্দা ছিল না। লোক-কল্যাণের জন্য যা সত্য তাই বলেছেন। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে! এখন তুমি ইচ্ছা করেই হাত দাও, কিম্বা তোমার হাতে কেউ আগুন ফেলে দিক, হাত কিন্তু পুড়বেই। তাই সাবধান। ঠাকুর বলেছিলেন, মধুর ভাবের সাধনের সময় প্রায় দুই বছর স্ত্রীবেশে ছিলেন তিনি। বলেছিলেন, পরিবার জিজ্ঞাসা করলে, আমি তোমার কে। আমি বললুম, আনন্দময়ী। বলতেন, আমি আপনাকে তখন 'পু' (পুরুষ) বলতে পারি নাই। সাধকের অবস্থায় উভয়ই উভয়কে ছেড়ে দিবে।

রাণী ভবানীর কত প্রশংসা করলেন। মেয়ে মানুষ হয়ে এতো জ্ঞান ভক্তি।

ঠাকুরের সব কথা সব আচরণ জগতের শিক্ষার জন্য। জগদম্বা এসব করিয়েছেন হাতে ধরে। কণ্ঠে বসে সব বলিয়েছেন। এক একবার বলতেন, এই দেখ মা বলতে দিচ্ছেন না। মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তাই প্রার্থনা করছেন, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। আমি ঘর তুমি ঘরণী। আমি রথ তুমি রথী। মা, যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন বলাও তেমনি বলি। মা, শরণাগত শরণাগত।

রাত্রি দশটা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। ১৮ই এপ্রিল, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ।
৫ই বৈশাখ ১৩৩১ সাল। গুডফ্রাইডে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উপনিষদ গীতা বাইবেল

১

সকাল পাঁচটা। শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া আজও উপনিষদ পাঠ করিতেছেন। 'ব্রাহ্মধর্ম' প্রথম থেকে বিয়াল্লিশটি মন্ত্র বৈদিক সুরে পাঠ করিলেন। ছোট জিতেন, বিনয় ও জগবন্ধু কাছে বসা। এইবার ব্যাখ্যা করিতেছেন।

আজ ১৯শে এপ্রিল ১৯২৪ খৃস্টাব্দ; ৫ই বৈশাখ ১৩৩১ সাল, শনিবার।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঋষিরা দেখেছিলেন ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। আবার সবই আনন্দে করছেন। মানুষ যখন কিছু করে তখন তার মনে আনন্দ থাকে, আবার উপভোগেও আনন্দ আছে। কিন্তু সেটাকে বিনাশ করে আনন্দ লাভ করতে পারে না। এ ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের কাজে। ভগবানের জগৎলীলার তিন অবস্থাতেই আনন্দ। কথাটা হচ্ছে এই তিনি ছাড়া তো অন্য কিছু নাই। তাই আদি-মধ্য-অন্ত সর্বাবস্থায় আনন্দ। আনন্দ যে তাঁর স্বরূপ — 'আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি' (মুণ্ডক: ২/২/৭)। ঠাকুর দেখেছিলেন, এই অবস্থা। বলেছিলেন, মা নিরাকার দেখালেন — সচ্চিদানন্দ সাগর অপার অসীম। আবার দেখালেন, সব 'মোমের' — বাগান, বাড়ি, গাছপালা, ফলফুল সব মোম দিয়ে তৈরী। মোম মানে সচ্চিদানন্দ। সব আনন্দে মোড়া। নাম ও রূপ আছে এ অবস্থায়, কিন্তু বিনাশ নাই। তাই বলেছিলেন লীলাও সত্য। কেন সত্য? লীলা যে নিত্য, তাই। এ একমত।

অন্য মত নিত্য সত্য, লীলা মিথ্যা — ব্রহ্মসত্য, জগৎমিথ্যা।

ঠাকুর বলেছিলেন এই নিত্যের পর লীলায় থাকা। ছাদও ইঁট চুন সুরকীর তৈরী, আবার সিঁড়িও ইঁট চুন সুরকীর তৈরী। ছাদে উঠতে হলে প্রথমে সিঁড়ি ছেড়ে উঠতে হয়।

প্রথম ত্যাগ চাই। পরে ঈশ্বরই সব এই বুদ্ধি হয়। একে ঠাকুর বলতেন বিজ্ঞানীর অবস্থা। দুইই বেদান্ত। ঠাকুর এক একটা experience-কে (অনুভবকে) অবস্থা বলতেন। এখন একটা অবস্থা আবার বদলে গিয়ে আর একটা হলো। সবই জ্ঞান। যে কোনও একটা ঈশ্বরীয় ভাব জানতে পারলেই কাজ হল। বাকী তিনি জানিয়ে দিবেন দরকার হলে। মুক্তি কি একরকম? ভাগবতে আছে পাঁচ রকম মুক্তির কথা — সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য। সবগুলিই এক ঈশ্বরকে নিয়ে। সবগুলিই অতীন্দ্রিয় বস্তু। একেরই পাঁচ ভেদ। সবই জ্ঞান।

শ্রীম (ছোট জিতেনের প্রতি) — এই আনন্দ স্বরূপ ভগবানের এককণা আনন্দে সমস্ত জগতের আনন্দ, জীবজন্তুর বিষয়ানন্দ source (মূল) তিনি। এই এককণা আনন্দে ডুবে আছে সংসারী জীব। মূলের খোঁজ নেই। বাকী আনন্দের জমাট বাঁধা তিনি নিজে। এই এককণা বিষয়ে দিয়ে তিনি কম হয়ে গেলেন কি? তা নয়। তিনি পূর্ণ, যত দেন যত নেয় তিনি একরস সদা সম্পূর্ণ। তাই ঋষিরা তাঁর স্তব করছেন, 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।' আবার বলিতেছেন, 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তিঃ' (বৃহ : ৪/৩/৩২)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — এই আনন্দ স্বরূপকে আবার 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তি ব্রহ্মবল্ল ১) বলেছেন। অনন্ত মানে যে দিক দিয়ে দেখ তাঁর শেষ নাই — জ্ঞান, কর্ম, শক্তি, কল্যাণ, দেশ, কালাদি। এই পরম পুরুষকে লাভ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁকেই ঠাকুর মা বলতেন। সর্বদা সেই মা সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। যেমন শিশুর সঙ্গে মা থাকে। আবার ঠাকুর নিজের মুখে নিজে বলেছেন তিনি নিজেই সেই মা, নিজেই ব্রহ্ম। আবার ভক্ত হয়ে রোগ ভোগ করছেন।

ঋষিরা বলছেন, এই পরমপুরুষকে প্রাপ্তিই জীবের শেষ গন্তব্যস্থল। ‘এষাস্য পরমাগতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমালোক এষোঽস্য পরম আনন্দ’ (বৃহ : ৪/৩/৩২) ধন ও আনন্দ লোক চেয়ে থাকে। বলছেন, এটি পেলে অন্য ধন চায় না তাই এটি পরম ধন। আনন্দ অর্থাৎ বিষয়ানন্দ, তাও চায় না। মিছরীপানা পেলে কে ওলাগুড় চায়? ‘স অশ্নুতে সর্বান্ কামান সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা’।

(তৈত্তি বহ্মাবল্ল : ২)।

তাঁকে পেতে হলে তপস্যা চাই। তপস্যা মানে সমগ্র মন দিয়ে তাঁকে চাওয়া। মনটা এখন জড়িয়ে আছে বিষয়ভোগে। এটাকে তুলে নিয়ে উল্টোদিকে ভগবানে লাগাতে হবে। নিরন্তর এ চেষ্টার নামই তপস্যা। সৎসঙ্গ আর নির্জনবাস এর সহায়। সৎসঙ্গে আনাগোনা করলে বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বর সত্য জগৎ অনিত্য, এ বোধ হয়। তারপর বিষয় ছেড়ে নির্বিষয় ভগবানে মন লগ্ন করা নির্জনে।

ব্রহ্ম, শক্তি, জীবজগৎ, তপস্যা, জীবের কর্তব্য — এইসব বোঝাতে, এইসব দেখাতে ব্রহ্মই যুগে যুগে মানুষ হয়ে আসেন। ঠাকুর সেই ব্রহ্ম — নিজের মুখের কথা। মানুষ তাঁকে বানায় নাই। বলেছিলেন, সচ্চিদানন্দ এর ভিতর থেকে বের হয়ে বলছেন আমিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

কি অজ্ঞান মানুষের! এই উক্তির সামনে — স্পষ্ট কথার পরও কি করে বলে জীবজগৎ এসব আপনিই হয়েছে — 'chance creation'? এও তাঁর অবিদ্যা মায়ার কাজ। নইলে খেলা চলে না। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ করে নিজেকে চালান। ঋষিদের অবতারদের এইসব কথা প্রত্যক্ষ জ্ঞান — চোখে দেখে বলেছেন। এতে ‘কিন্তু’ নাই, অনুমান নাই। পরন্তু বৈজ্ঞানিকদের জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে উক্তি অনুমান মাত্র। জোর নাই তাদের কথায়। মানুষকে তারা বলতে পারে না, আমি নিজে দেখেছি, নিজে প্রত্যক্ষ করেছি মানুষের স্বরূপ। স্ব ‘স্বরূপকে’ জানাই পরম সুখ, পরম শান্তি ও পরমানন্দ। এই অবিনশ্বর সুখ, শান্তি তারা নিজেরাও লাভ করে নাই অপরকেও দিতে পারে

না। ঋষিরা কিন্তু সকলে বলছেন — আমরা এই পরমানন্দ, পরম সুখ, eternal bliss and happiness লাভ করেছি। তোমরাও করতে পার। প্রত্যেক জীবের এটি birth-right (জন্মগত অধিকার)!

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন — ধ্যানের ভাবে। আবার পাঠ করিতেছেন। এবার বাইবেল। ইস্টার চলছে তাই। সেণ্ট লুকের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের একত্রিংশ বাণী থেকে চতুর্বিংশতি অধ্যায় অর্থাৎ পুস্তকের শেষ পর্যন্ত পড়িলেন। কোন কোন বাণী দুইবার পড়িয়াছেন। যেমন — 'I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me!' 'Father, forgive them; for they know not what they do.' 'Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise; (St. Luke 22:34 - 23:43).

'O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have sopken.' (St. Luke 24:25). ('পিটার, তোমায় আমি বলে রাখছি, আজ মুরগীর ডাকের পূর্বেই তুমি তিনবার আমায় অস্বীকার করবে।' 'পিতঃ, এদের ক্ষমা কর। কারণ এরা জানে না কি মহাপাপ করছে।' 'মাইরি বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গে নিবাস করবে।' 'তোমরা এমনি হীনবুদ্ধি ও দুর্বলচিত্ত যে মহাপুরুষগণের বাণীও সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারছ না।')

পাঠ শেষ হইয়াছে। এবার শ্রীম ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলেছিলেন তিন রকম বিশ্বাসের কথা। দুধের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন — দুধের কথা শোনা, দুধ দেখা আর দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়া তফাৎ আছে। ক্রাইস্টের বিশ্বাস পাকা বিশ্বাস। দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়া বিশ্বাস। মানে ভগবানের সঙ্গে দেখা করা, কথা কওয়ার বিশ্বাস। এক আধবার নয় বার বার। এই বিশ্বাস ছিল বলেই ক্রাইস্ট জেনেশুনে ক্রুশে বিদ্ধ হলেন। ঈশ্বর বলেছেন জগতের কল্যাণের জন্য তোমার শরীর দান করতে হবে। এই বিশ্বাস অবতারাদির হয়; জীবের হয় না। ঈশ্বর সত্য, অবতার সত্য — এই

বিশ্বাস হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। একবার হয় কতকটা, আবার যায়। কতবড় ভক্ত পিটার, অন্তরঙ্গ শ্রেষ্ঠ। তাকেই বলেছিলেন, 'Get thee behind me Satan : for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.' (St. Matthew 16:23) .দূর হও শয়তান, ভগবানের আদেশ শুনব কি তোমার উপদেশ শুনবো! পূর্বে দর্শন দিয়ে ভগবান বলেছেন, দেহ বলি দিতে হবে। এখন পিটার পরামর্শ দিচ্ছেন অন্যরূপ। তাই বললেন এই কথা। লোক যেমন বলে থাকে, 'বালাই আপনার কেন হতে যাবে শরীর ত্যাগ!' এইরূপ বলেছিলেন।

অত বিশ্বাস, জ্বলন্ত বিশ্বাস কিন্তু এর ভিতরও ভয় এসে গেছে শরীর ত্যাগে। এমনি দেহবুদ্ধি। ভয়ে — দারুণ ভয়ে, প্রার্থনা করছেন, পিতঃ রক্ষা কর এ বিপদ থেকে। ঘেমে গেছেন উৎকণ্ঠায়। একজন দেবতা এসে বুঝি তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ধরা পড়বার কিছুক্ষণ আগে হয়েছিল এই অবস্থা। কেন এইরূপ হলো? লোকশিক্ষার জন্য। দেখালেন, শরীর ধারণ করে সর্বাবস্থায় বিশ্বাস অটুট রাখা কত বড় শক্ত ব্যাপার। দেহরক্ষার এই যে চেষ্টা এরই নাম অবিদ্যা। যতদিন দেহ আছে ততদিন তার এলাকা। আবার পিটারকে দিয়ে লোকশিক্ষা দিলেন। তিনি গর্ব করে বলেছিলেন কিনা, প্রভো, আপনার সঙ্গে আমি সর্বদা থাকবো — 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ', তাঁর সেই গর্ব ভেঙ্গে দিলেন। এক প্রহরের মধ্যে তিনবার প্রাণভয়ে ক্রাইস্টকে অস্বীকার করলেন — 'I know not the man' (আমি একে চিনি না) বলে। তারপর নিজের দুর্বলতা বুঝতে পেরে কাঁদতে লাগলেন।

এ ঘটনা দু'টিও দেখুন। এদিকে এইরূপ। আবার এর পরই অন্যায়কারীদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করছেন। — পিতঃ ক্ষমা কর, এরা জানে না কি ভীষণ পাপ করছে! তিনি নিজেকে জানেন ওরা জানে না তাঁকে। অত ভয় শরীর ত্যাগে আবার অত করুণা — সমদর্শন। ক্রুশে বিদ্ধ অসহায় অবস্থায়ও একজনকে মুক্তিদান করলেন। এই সব বিরুদ্ধভাবের মিলনভূমি অবতার। তাঁর সঙ্গে আর দুই ব্যক্তি

ক্রুশে বিদ্ধ হয়। তাদের একজনের সেই অবস্থায় ক্রাইস্ট অবতার একথা বিশ্বাস হয়েছিল। শরণাগত হয়েছিল। ক্রাইস্ট তখনই বললেন, 'আজই তুমি আমার সঙ্গে ভগবানের কাছে যাবে স্বর্গে।'

একজন অবতারের জীবন ও কার্য প্রত্যক্ষ করলে বোঝা যায় শাস্ত্রের এসব কথা সত্য। নইলে মানুষ মনে করে এসব বানান কথা। ঠাকুরের ভিতরও এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের খেলা চলতো — ভক্ত ও ভগবান। কখনও ভগবানভাবে বলছেন, 'আমার ধ্যান করলেই হবে', আবার বলছেন সঙ্গে সঙ্গে, অন্যায় করলাম কি মা তাকে এ কথা বলে? আমি তো দেখছি তুমিই সব — মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার সবই তুমি! আবার শরীর ত্যাগের পূর্বে বলছেন, 'এখন আর দুটি দেখতে পাচ্ছি না, একটি ভক্ত ও একটি ভগবান। এখন দেখছি সবই তুমি, সব মা।'

মৃত্যুর সময়, তাঁর শরণ নিলে হয়। এই কয়েদীর হয়েছিল। 'স্থিত্বা স্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।'

এখন সকাল নয়টা। শ্রীম ও অন্তেবাসী প্রুফ দেখিতেছেন। 'কথামৃত' ছাপা হইতেছে।

অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম ঠাকুরবাড়ি গিয়াছেন। ভক্তগণ আসিয়া ছাদে একত্রিত হইতেছেন। শ্রীম ফিরিলেন আটটায়। বড় জিতেন, অমূল্য, বিনয়, শান্তি, বলাই, মনোরঞ্জন, ছোট রমেশ, ডাক্তার, যোগেন, তৎপুত্র খোকা, দুর্গাপদ, জগবন্ধু প্রভৃতি আসিয়াছেন। শ্রীম পরিশ্রান্ত, মাদুরে বসিয়াছেন ছাদে। একটু পর কথাপ্রসঙ্গ হইতেছে। সন্ন্যাস আশ্রমের কথা হইতেছে। খুব কঠিন আশ্রম। দুর্গাপদ বলিতেছেন, ঠাকুর সন্ন্যাসের যে আদর্শ দিয়ে গেছেন সেরূপ সন্ন্যাসী দেখা যায় না প্রায়। আজকালের সন্ন্যাস-আশ্রম নেমে গেছে।

শ্রীম (বাধা দিয়া) — সন্ন্যাস কত বড় আশ্রম। বললেই হলো কিচ্ছু না। দেখনা যেখান থেকে মানুষ পালাচ্ছে সেখানে সন্ন্যাসীরা যাচ্ছে। প্রাণের ভয় নাই। লাহোরে প্লেগ হয়েছে। রোজ পঞ্চাশজন

লোক মরছে। মঠের সন্ন্যাসীরা সেখানে গেছেন সেবা করতে। মুখে বললে কি হয়? কাজ দেখ তাঁদের। পুলী বাইরে থেকে দেখতে সব সমান। কিন্তু কারো ভিতর ক্ষীরের পুর, কারো ভিতর কড়ার ডাল।

কোন্ বীর মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে কতলু খাঁকে সুবর্ণরেখা পার করে দিতে পারে? জগৎ সিং-এর কর্ম। তিনি কৃতকার্য হলেন। মুখে তো বীরত্ব কত লোক করে থাকে, কিন্তু এ কার্যে কেউ বেরলো না। একা জগৎ সিং এগিয়ে গেলেন।

সন্ন্যাস মানে এই নয় সকলেই শুকদেব হয়ে যাবে। সন্ন্যাস মানে, সংসারের বাইরে চলে যাওয়া। বাপ মা পরিবারের বন্ধনের বাইরে যাওয়া। সেখান থেকে চেষ্টা করছে। রাস্তায় উঠেছে। ওখান থেকে ঈশ্বরের দিকে এগুতে বিঘ্ন কম। Vantage ground-এ (অনুকূল স্থানে) দাঁড়িয়ে আছে। মুড়ি মিছরীর একদর করলে চলবে কেন?

দুর্গাপদ — ঠাকুরের সন্ন্যাসের আদর্শে কি তা ছিল?

শ্রীম — না, তা নয়। তবে সন্ন্যাসীদের ঐরূপ। ঠাকুর কারোও formal (আনুষ্ঠানিক) সন্ন্যাস দেন নাই। তবে organisation (সঙ্ঘ) রাখতে হলে একটা Institution (অনুষ্ঠান, প্রথা) চাই। তাই মঠে সন্ন্যাস সংস্কার দেওয়া হয়। তিনি ভিতর ফাঁক করে দিতেন। দেখতেই সব সাধারণ মানুষ; কিন্তু তাঁদের ভিতর ফাঁক — ভিতরে সন্ন্যাস। তিনি দেখতেন, কিসে ঈশ্বর লাভ হয়। সেটি আলাদা জিনিষ। ফার্ষ্ট ক্লাস। ফার্ষ্ট ক্লাশ সন্ন্যাস হলো না ব'লে সন্ন্যাস কিছু নয় বলা চলে না। সেকেণ্ড ক্লাশ, থার্ড ক্লাশ আছে। তবুও সন্ন্যাসী। এঁরা প্রণম্য যারা ঘরে আছে তাদের। সন্ন্যাসী আর গৃহস্থের difference (পার্থক্য) যেমন সুমেরু পর্বত আর সরষে কণা, অথবা মহাসাগর আর গোষ্পদের জল।

রাত্রি এগারটা।

২

সকাল পাঁচটা। মর্টনের ছাদে শ্রীম উপনিষদ পাঠ করিতেছেন, 'ব্রাহ্মধর্ম'। শ্রোতা ছোট জিতেন, বিনয়, জগবন্ধু প্রভৃতি। পরে আসিলেন

যোগেন ও তৎপুত্র খোকা। পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত হইল। কেবল সাধনের কথা।

আজ ২০শে এপ্রিল ১৯২৪ খৃস্টাব্দ। ৬ই বৈশাখ ১৩৩১ সাল, রবিবার।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই যা পড়া হলো এর সার কথা — সাধন চাই। 'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব' (তৈত্তি ভৃগুবল্ল : ৩য় অনুবাক)। ঠাকুরও বলতেন সাধন চাই। সিঁতির পণ্ডিতকে বলেছিলেন এই কথা খুব জোর দিয়ে। নিজের জীবনে পালনের চেষ্টা চাই। ঈশ্বর দর্শন করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তার জন্য চাই সৎসঙ্গ আর গুরুসেবা। ক্রমে বুদ্ধি স্থির হবে তাঁ'তে তা হলে। ঠাকুর উপমা দিতেন, দাঁতের বেদনা। সব করছে কিন্তু মনে পড়ে আছে ঐ বেদনায়। তেমনি সংসারের সব কর কিন্তু বুদ্ধিটি থাকা চাই তাঁ'তে। 'বিজ্ঞান সারথি' হতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলি দুষ্ট ঘোড়া, মন লাগাম আর বুদ্ধি সারথি। রাশ টেনে সারথি ঘোড়াকে দমন করে।

'বুদ্ধি' মানে পাকা বুদ্ধি, সানী দইয়ের মত বুদ্ধি। চিঁড়া ভেজা বুদ্ধি নয় যা দিয়ে জগতের ভোগ্য বস্তু লাভ হয় — রাজ্য নাম যশ অর্থ। কিন্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। আমি ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর দাস এরূপ বুদ্ধি। কিংবা, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বুদ্ধি। ঠাকুর বলতেন পাত্র উল্টে ধর — সানী দই নড়বে না, পড়বে না। এইরূপ স্থির বুদ্ধি। হাজার চঞ্চলতার কারণ থাকলেও মন ভগবানে। সুদৃঢ় বিশ্বাস বুদ্ধি। কুটস্থ বুদ্ধিও বলা হয়। নেহাইর উপর অত হাতুরীর ঘা পড়ছে নেহাই অবিচলিত। যেমন কম্পাসের কাঁটা। টেনে ধর অন্যদিকে যাবে। ছেড়ে দাও তখন ঐ উত্তর দিকে। যেমন rebel (বিদ্রোহী) — মার ধর ফাঁসিতে দাও নিজের মত বদলাবে না — স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই, এইরূপ মরণপণ বুদ্ধি। এই লৌহবুদ্ধির দরকার।

স্ত্রী পুত্র কন্যা দেহসুখ ধন ঐশ্বর্য সুনাম যে বুদ্ধিকে হেলাতে পারে না সেই বুদ্ধির দরকার। নচিকেতার বুদ্ধি। অনন্তকালের বন্ধু ভগবান, আর জগতের সব দুঃখময়, সুখ শান্তির একমাত্র আশ্রয় ঈশ্বর

এই কথা যে বুঝেছে ঠিক ঠিক তার বুদ্ধি। প্রথমে শাস্ত্রও গুরুমুখে শুনে পরে মনন করে যে নিশ্চয় করেছে, ঈশ্বর সত্য জগৎ অনিত্য — এইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবান লাভ করতে পারে। এইরূপ ব্যক্তিই শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু হয়। তাঁর শুদ্ধ চিত্তে ভগবান দর্শন দেন। ঢিলে বুদ্ধি, 'চিঁড়ে ভেজা বুদ্ধি', 'আঠার মাসে বছর' বুদ্ধি লেদারুর বুদ্ধির কর্ম নয়। চাতকের বুদ্ধি, বিদ্রোহীর বুদ্ধি, সত্যগ্রাহীর বুদ্ধি, নচিকেতার বুদ্ধির প্রয়োজন।

শ্রীম অর্ধঘন্টা নীরব রহিলেন। ভক্তগণ এই আধঘন্টা ধ্যান করিতেছেন শ্রীম-র আদেশে এইমাত্র যা শুনিলেন সেই বিষয়ের। তারপর শ্রীম গীতা খুলিলেন, চতুর্থ অধ্যায় নিজে পড়িলেন মনে মনে। এইবার উচ্চৈঃস্বরে তিনটি শ্লোক পড়িয়া ভক্তদের শুনাইতেছেন। তারপর ব্যাখ্যা।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মাত্যক্ত সর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম-কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ (গীতা ৪/২১-২৩)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — কর্মযোগের দু'টি stage (অবস্থা) আছে। একটি সাধক অবস্থার আর একটি সিদ্ধাবস্থার। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধাবস্থার কথা বলছেন। সিদ্ধাবস্থায়ও দুই রকমের কর্ম থাকে। একটি শরীর ধারণের জন্য কর্ম — অন্নপানাদি, অপরটি প্রত্যাদিষ্ট কর্ম অথবা প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য কর্ম। এই উভয় কর্মেরই বন্ধনশক্তি নাই। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যন্ত্রবৎ কর্ম করে, তাই স্বতন্ত্র অহংকার না থাকায় নিজের দায়িত্ব নাই। তাই বন্ধন নাই। 'আমার কর্ম আমি করছি' — সাধকের অবস্থায় হাজার বিচার কর, এই বুদ্ধি এসেই পড়বে। সিদ্ধাবস্থায় ভগবানকে সামনে দেখতে পায়। বুঝতে পাচ্ছে তাঁর ইচ্ছায়ই সব হচ্ছে, বুঝতে পাচ্ছে স্পষ্ট — পূর্বের 'আমি-আমার'

অভিমানেরও মূল শক্তিকেন্দ্র ঈশ্বরেচ্ছা। ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ কর্ম, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এই সবই এক বস্তু থেকে এসেছে। একেরই নানা অবস্থা, নানা নাম। এক অবস্থায় দেখতে পায় তিনি ছাড়া কিছু নাই — সব সচ্চিদানন্দ। আর এক অবস্থায় এই নানারূপ ও নাম। এটা বুঝলে আর বন্ধন নাই।

ঠাকুরের জীবন এই সব আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রদর্শন ভূমি। এঁর জীবনে এই সব হয়েছে, সব দেখা গিয়েছে। আমরা দেখেছি মনবুদ্ধি সব ভগবানে সমর্পিত। সর্বদা 'মা মা' মুখে। 'ত্যক্ত সর্ব পরিগ্রহ' পূর্ণভাবে প্রকাশিত। আমরা তিনটি জামা নিয়ে গি'ছলাম — তাঁরই আদেশে জামা নিয়ে গি'ছলাম — কিন্তু দু'টি ফিরিয়ে দিলেন। একটি মাত্র রাখলেন। শরীর ধারণের জন্য যা নেহাৎ দরকার তাই রাখলেন। সঞ্চয় করতে পারেন নাই। এও যখন বিন্দুমাত্র মানুষ বুদ্ধি এল তখন দরকার হল। 'মায়ের ছেলে' এই বুদ্ধিতে এই আচরণ, এই দরকার বোধ। এর উপরে উঠে গেলে তখন কে তোমার জামার ধার ধারে! দেহবুদ্ধির বিন্দুমাত্রও নাই তখন কে দেহকে জামা পরায়? কে তখন কাপড়ের ধার ধারে? পরণের কাপড়ও কোমরে নাই তখন — দিগম্বর। এখানকার গীতার বিবরণটি আর ঠাকুরের এই আচরণ মধ্যপন্থার বিবরণ। সিদ্ধাবস্থায় লোকব্যবহার কিরূপে করে তার বর্ণনা এখানে। অসিদ্ধ, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ। ঠাকুরের অবস্থা সিদ্ধের সিদ্ধাবস্থা। অসিদ্ধ অবস্থায় কামনা বাসনা থাকে। লাভে আনন্দ, অলাভে দুঃখ, ঈর্ষাদ্বেষ, ভালমন্দ বিচার থাকে। ভগবান দর্শনের পর সিদ্ধাবস্থায় ভিতর ফাঁক হয়ে যায়। ভিতরের মনে এসব কিছু নাই সব ভগবানময়। বাইরে শরীরে, নিম্নমনে এসব থাকলেও এ দিয়ে কাজ হয় না। বন্ধন হয় না তাই। 'পোড়া দড়ি'র মত থাকে ঠাকুর বলতেন। ফুঁ দিলে উড়ে যায়। আকার মাত্র থাকে। কিন্তু বন্ধনে শক্তিহীন। এই অবস্থার কথাই এখানে বলা হচ্ছে গীতায়। ঠাকুর বলতেন কেরানী জেল থেকে ফিরে এসেও কেরানীগিরিই করে। সিদ্ধাবস্থার কর্মের বন্ধন নাই।

হাসি-তামাসা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগের ইচ্ছা — বেগুনের ঝোল খাওয়া, শাল পরা, এসব ঠাকুরের জীবনে দেখা গেছে। এ সবই নিম্ন মনের কাজ দেখাবার জন্য ঘটেছে। এসবে আসক্তি নাই। নিম্ন মন, উচ্চ মন, সর্বোচ্চ মন — মানুষ, সিদ্ধ পুরুষ, ঈশ্বর এই তিন অবস্থাই তাঁতে দেখা গিয়েছে। গীতার এই অবস্থার বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণের নিজের অবস্থার বর্ণনা। লোকব্যবহারে সিদ্ধাবস্থার প্রয়োজন তাই তার বর্ণনা। ঈশ্বরভাব এরও উপর।

শ্রীম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন। ভাবে বিভোর হইয়া সুর-সংযোগে বারংবার গাহিতেছেন।

ঋষির্ভির্বহুধাগীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।।

(গীতা ১৩/৪)

অনেকক্ষণ পর্যন্ত শ্রীম স্থির হইয়া বসিয়া আছেন চক্ষু নিমীলিত। পুনরায় কথা হইতেছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — 'অমানিত্বং অদম্ভিত্বং' — (গীতা ১৩/৭) এগুলিও ঠাকুরের জীবনে দেখেছি। এইসবই জ্ঞানের সাধন। এগুলি ঠিক ঠিক পালন করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তাতেই জ্ঞানপ্রাপ্তি হয় তাঁর দর্শন হয়। আবার এও আছে যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয় তাঁর এসব আপনিই এসে যায়।

রাণী রাসমণি, মথুরবাবু অত মান্য করতেন কিন্তু ছেলেরা তেমন মানতো না। তথাপি সমান ভাব। ছেলেদের উল্টে স্নেহ করতেন। নিজে সর্বগুণাধার হয়েও অপরের সামান্য গুণের আদর করতেন। তিল পরিমাণ গুণকে তাল বানিয়ে দিতেন। আমি গুণী বলে কোনও অভিমান দম্ভ নাই। আমি জগদম্বার ছেলে, মাত্র এই অভিমান রেখেছিলেন সর্বদা। এক নিমেষের জন্যও ভুলেন নাই। রাত্রিতে এদিকে নিদ্রিত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 'মা মা' করে উঠছেন— যেমন শিশু করে। কায়মনোবাক্যে কখনও কাউকে পীড়া দেন নাই। অপরের অনিষ্ট হয় এমন একটি কথাও মুখ দিয়ে কখনও বের হয় নাই।

যদিও কখনও হক্ কথা বলতেন, সেও কল্যাণের জন্য। মা যেমন ছেলেকে বলে। তাই অহিংসা। এক মুহূর্তের জন্যও অসহিষ্ণুতা দেখা যায় নাই। মথুরবাবুর পুরোহিত হালদার জান বাজারের বাড়িতে লাথি মেরেছে ঠাকুরকে ঈর্ষায় — এই বলে, 'বল্ তুই বাবুকে কি গুণ করেছিস্, কি দিয়ে বশ করেছিস?' তাতেও তাঁর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয় নাই। কি ক্ষমাশীল! মথুরবাবু জানতে পারলে রক্ষা ছিল না। পুরোহিতকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতো।

'আর্জবম* মানে সরলতা, অবক্রভাব। ঠাকুর মান অপমানের বিচার না করে অকপটে সব বলতেন। রাখাল ভাঙ্গা হাতটা ঢেকে রেখেছিল। ঠাকুর হাত বার করে ডাক্তারকে বলছেন, এই দেখ বড়ই যন্ত্রণা হচ্ছে। বলেছিলেন, একদিন কামও হয়েছিল। কে আপন শিষ্য সন্তানদের এ কথা বলতে পারে? গুরুসেবা তাও করেছিলেন। তোতাপুরী, ব্রাহ্মণী এঁদের সেবা করেছেন। (সহাস্যে) একটি বৈষ্ণব বাবাজীকেও তিনদিন সেবা করেছিলেন। 'শৌচম্'* — অন্তর্বহিঃশুদ্ধি তাও ছিল। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসতেন। সামান্য কটি জিনিষ ছিল, তাও খুব পরিষ্কার রাখতেন। হাতে জুতাটা লেগে গেছে অমনি দেখছি হাতটা ধুয়ে ফেলছেন। সলতেটা উসকে দিলেন, অমনি প্রদীপের শিখায় আঙ্গুল দুটি স্পর্শ করে শুদ্ধ করে নিলেন। অন্তর্শুচি হয় ভগবানের নামে। ঠাকুরের হৃদয়ে মা সদা জাগ্রত। মুখে 'মা মা' বুলি সর্বদা। সংসার জ্বালায় ভক্তগণ অস্থির হয়ে এক মিনিট তাঁর কাছে বসলেই মনস্থির হয়ে যেতো। কি অদ্ভুত 'স্থৈর্য' (স্থৈর্যম্)!*

'আত্মবিনিগ্রহ'* (*গীতা ১৩/৮) মানে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম। মানুষের মনবুদ্ধি চিত্ত অহংকার সংসারমুখী। তাঁর স্বভাবই এইগুলি, ঈশ্বরমুখী। স্বপ্নেও কখনও স্ত্রী দর্শন হয় নাই। বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য — কোনও ধাতুদ্রব্য হাতে লাগলে হাত বেঁকে যেতো। এমন deep-seated aversion(গভীর বৈরাগ্য) কামিনীকাঞ্চনে। এটিই 'ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্'। আর 'অনহংকার'। মায়ের ছেলে এই একটু অহংকার। আর কোনও অহংকার নাই। মানুষের নিজের শরীর যে অত প্রিয়,

তার উপরও মন নাই। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ দোষানুদর্শনম্ — (গীতা ১৩/৯)। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবই দুঃখময় এ জ্ঞান সর্বদা জাগ্রত ছিল। বলেছিলেন, 'মা দেখিয়ে দিয়েছেন সবেতে মৃত্যুর ছাপ লেগে রয়েছে। সংসার একটি মহাশ্মশান।' অসক্তি ((গীতা ১৩/১০)) মানে আসক্তিহীনতা। সংসারে কোনও আসক্তি ছিল না। মানুষ সর্বদা আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার অমুক এই করে পাগল। ঠাকুর 'আমার' 'আমি' মুখে আনতে পারতেন না। বলতেন 'এখানকার'। সব মা'র। সই করে মায়না নিতে পারতেন না। ওরা অমনি মা'র কাছে পাঠিয়ে দিতেন মাসে মাসে। সম্পত্তি, টাকা ভক্তরা দিতে চাইলেন সেবার জন্য, বারণ করলেন। শুধু কি তাই? শুনে একেবারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন! যেন কুড়োল দিয়ে মাথাটা কাটছে এমনি যন্ত্রণা হল শুনে। স্ত্রীকে — আমাদের মাতা ঠাকুরাণীকে বলতেন, 'মা আনন্দময়ী'। ভাইয়ের ছেলে অক্ষয়কে ভালবাসতেন। তার মৃত্যু হলে কেঁদেছিলেন, কিন্তু ঐ একবার মাত্র। পরে আর নামও নিতেন না। মানুষ কাঁদে সারাজীবন। রামলাল প্রভৃতি ভাইয়ের ছেলেরা হ'ল পর আর বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তগণ হ'ল আপনার।

সুখেদুঃখে সমানভাব, এও তাঁ'তেই দেখেছি। মথুরবাবুর অত সেবাতেও মনের যে অবস্থা, শুধু 'মা মা' মুখে। মথুরবাবুর শরীর ত্যাগ হলে যখন সেবার বড় ত্রুটি হচ্ছিল, তাঁর খবর করবার কেউ ছিল না, সারাদিনে বেলা ২।৩ টার সময় শুকনো প্রসাদী ভাত খেতে পেতেন, অত কষ্টেও মনের সেই স্থৈর্য সর্বদা 'মা' 'মা' মুখে তখনও। সেই অবস্থায় লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন সেবার জন্য, নিতে পারলেন না, মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন শুনে। বললেন, মা আমায় শেষে টাকা দিয়ে বাঁধতে চাও?

কি অব্যভিচারিণী ভক্তি! শয়নে স্বপনে মাকে চাই! নিমেষের বিচ্ছেদ নাই। সারাজীবন ঐ বাগানটিতে পড়ে আছেন আর 'মা' 'মা' করছেন। পাঁচ মিশালো লোকের ভীড় পছন্দ করতেন না।

কিন্তু এসে পড়লে অবহেলার নামমাত্রও ছিল না। 'মাকে' হৃদয়ে

সর্বদা রক্ষা করে ঐ কালীবাড়ীতে পড়ে থাকতেন। অপর লোক গেলে যাদের চিত্ত একটু শুদ্ধ ছিল, প্রভাবিত হতো। তারা দেখতো, কি আশ্চর্য, চব্বিশ ঘন্টা একটানা ভাব 'মা' 'মা'? কি করে হয় এরূপ ভাব তারা ভাবতো। অপরের জোয়ার ভাটা বয় ভাবের কিন্তু ঠাকুরের সদা স্থির, সদা একমুখী প্রবাহ। এটি দেখলেই শুদ্ধচিত্ত ভক্তগণ বুঝতে পারতো — মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন, তাঁতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি। এরই নাম মোক্ষ, নিত্যমোক্ষ।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — শ্রীকৃষ্ণ জীবনেও এইসব ভাব প্রকাশ হয়েছিল। নিজের কথাই গীতায় বলেছেন। যখন ঠাকুর সমাধিস্থ থাকতেন তখন ভিতরে কি হচ্ছে তা কে বুঝবে? ভক্তরা শুধু চেয়ে থাকতো যদি বা কিছু বুঝতে পারে। ব্যুত্থিত হয়ে যখন সাধারণ অবস্থায় থাকতেন মানুষের মত, তখন এইসব যা গীতায় বলা হ'ল তা দেখা যেত। আত্মদর্শনের পর মহাপুরুষদের মধ্যে এসব দেখা যায়। আত্মদর্শনে তাই এইগুলি সাধন। জ্ঞানলাভের সাধন বলে এগুলিকেও জ্ঞান বলা হয়েছে।

ভক্তরা কেহ কেহ উঠিয়া গেলেন। শ্রীম বসিয়াই আছেন। এখন সকাল আটটা। 'ইস্টার' চলিতেছে। বাইবেলখানা খুলিয়া সেন্ট মার্কের চতুর্থ অধ্যায় পড়িলেন। তারপর প্রথম কুড়িটি বাণীর ব্যাখ্যা করিতেছেন। — 'Behold, there went out a sower to sow...(St. Mark 4:3)

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — অবতারগণ সব কথা সবকে বলেন না। সকলে সব কথার অর্থও বুঝতে পারে না। কয়েক থাকের লোক যায় তাঁদের কাছে। এক থাক্ অন্তরঙ্গগণ, পার্ষদগণ। আর এক থাক্ বহিরঙ্গগণ। এক থাক্ সকাম ভক্তগণ। আর এক থাক্ দর্শক ভক্তগণ।

ক্রাইস্টের কাছে নানা রকমের লোকই যেতো। একদিন নদীর তীরে বহুলোক জমেছে দেখে নৌকোয় চড়ে উপদেশ করতে লাগলেন — 'sermon on the boat', পাঁচ মিশালো লোক থাকলে গল্প করে বলতেন।

একদিন বললেন একটি কৃষকের গল্প। কৃষক চাষ করে বীজ

বপন করছে (হাতে ছড়ানোর অভিনয় করিয়া) এমনি এমনি করে। কতকগুলি বীজ গিয়ে রাস্তায় পড়লো। তক্ষুনি পাখীরা সব খেয়ে ফেললে। কতকগুলি পড়লো পাথুরে মাটিতে। গাছ হলো বটে কিন্তু উপযুক্ত রস না পেয়ে মরে গেল। কতকগুলি গিয়ে পড়লো ঝোপে, কাঁটাবনে। অঙ্কুরিত হয়ে আগাছার চাপে সেগুলিও গেল। আর কতকগুলি পড়েছিল ভাল জমিতে। সেগুলিতে কেবল সুফল হলো। তিন ভাগই নষ্ট হয়ে গেল। একভাগে যা ফসল এলো তাতেই সব কাজ হয়ে গেল।

তিনি যা বললেন এর অর্থ — অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ভাল বুঝতে পারে নাই। অন্য লোক চলে গেলে তখন তাদের বুঝিয়ে বললেন। রাস্তায় পড়লো কতকগুলি বীজ, এর মানে, হৈ হট্টগোলে ধর্মভাব জাগরিত হয় না। পাখীতে খেয়ে ফেললো মানে এ কান দিয়ে ঢুকে ও কান দিয়ে বের হয়ে গেল। মহামায়া এমনি করে ভুলিয়ে দেয়। 'পাথুরে মাটিতে' পড়া মানে, কতকগুলি লোক ঈশ্বরীয় কথা শোনে, কতক বোঝেও কিন্তু পালন করতে গিয়ে যখন দেখে ভোগ ত্যাগ করতে হবে, তখন ছেড়ে দেয়। তৃতীয় কাঁটা ঝোপের বীজ মানে, সংসারের শোক তাপ অভাবাদিতে গুরুবাক্য ভুলে যাওয়া। ভাল জমির বীজ মানে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের কথা। তারাই অবতারের জীবন্ত সাক্ষী। নানা রকম কষ্ট, অত্যাচার, দুঃখ দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে গিয়েও তাঁর কথা ধরে থাকে। তারাই জগৎগুরু। তাদের জীবন দিয়েই জগৎ উপরে উঠে — ঈশ্বরীয় ভাব পায়। তাদের সম্বন্ধেই ক্রাইস্ট বলেছেন, 'Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God.'(St. Mark 4:11) তারাই গুহ্য তত্ত্ব, মোক্ষের অধিকারী।

ঠাকুরকেও দেখেছি বেশ ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে। অন্যরকম লোক এলো অমনি কথা পালটে গেল। কেউ আবার কথা শুনছে কিন্তু ভাল না লাগায় উঠে গিয়ে নৌকোতে বসে রইল। কখনও ঠাকুর নিজেই বলতেন, যাওনা একবার বাগান, মন্দির দেখে এসো, অন্তরঙ্গগণ

তাঁর কথা শুনে জগৎ ভুলে যেতো। তিনি আবার তাদের উঠবার সময় হয়েছে বলে দিতেন। এতো মজে গেছে অন্য কোনও হুঁশ নাই। কখনও কখনও অন্তরঙ্গদের কথায়ও আবার বলতেন, 'সব দেখছি কড়াইয়ের ডালের খদ্দের, কাকে বলি কেই বা শোনে'। তিনি goalএ থেকে কথা কইতেন কি না! এমনতর কঠিন ব্যাপার।

আজকাল ক্রাইস্টের কথা কে বোঝে? যারা বুঝবে তারা যে ভোগে ডুবে আছে। দু'চার জন এরই ভিতর দেখা যায় একটু বোঝে। এখন ন'টা সকাল। শ্রীম আপন কক্ষে গেলেন।

৩

আজ রবিবার। তাই সারাদিন ভক্তগণ আসিতেছে যাইতেছে। অনবরত কথামৃত বর্ষণ হইতেছে। অপরাহ্ণে শ্রীম ঠাকুরবাড়ি গেলেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যসেবা রহিয়াছে। শ্রীশ্রীমা স্বহস্তে ঠাকুরকে বসাইয়াছেন। শ্রীম, সেবার ত্রুটি না হয় তাই সর্বদা যাতায়াত করেন। সন্ধ্যার সময় স্কুলবাড়িতে ফিরিয়াছেন। চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসা। ভক্তসঙ্গে কিছুকাল ধ্যান হইতেছে। তারপর 'কথামৃত' তৃতীয় ভাগ সপ্তদশ খণ্ড পাঠ হইতেছে। পাঠক শুকলাল। শ্রীম স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যোগমায়া আর শ্রীরাধা এক নন, ঠাকুর বলছেন। যোগমায়াতে এই সমস্ত জগৎ রহিয়াছে। তিনি ভেল্কী লাগিয়ে দেন। এতে সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণই আছে। কিন্তু শ্রীরাধা শুদ্ধসত্ত্বময়ী — একেবারে বিশুদ্ধ সত্ত্ব।

সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ আধার, আধেয় শ্রীরাধা। লীলার জন্য এই সৃষ্টি।

কেউ কেউ রাধাকে জীবাত্মার সঙ্গে তুলনা করে। আর শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা। রাধাকৃষ্ণ যুগল মানে জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন। কি করে ভগবানকে ভালবাসতে হয় সর্বস্ব দিয়ে — জীবন যৌবন, রূপ সৌন্দর্য, কুল মান সব দিয়ে — তা দেখাবার জন্য ভগবানের এ লীলা।

শুকলাল — ঠাকুর বলছেন, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না। ঘরে যারা রয়েছে তারা কি করে সব ত্যাগ করে?

শ্রীম — ঠাকুর বলছেন, ভক্তি লাভ করে, জ্ঞান লাভ করে সংসারে থাক। সংসার করবার আগে চাই কিছু সাধন। নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডেকে কিছুদিন, তারপর সংসার করলে অত দোষ নাই। তখন বুঝতে পারে কোনটা নিত্য কোনটা অনিত্য। সাধুসঙ্গ চাই প্রথমে। সাধুসঙ্গ করে তারপর সাধন। তারপর সংসারে থাকা।

আপনারা যা সব করছেন তাই করা। মঠে যাওয়া, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, কখনও দু'চার দিন নির্জনে চলে যাওয়া — যা সব ভক্তরা করছেন। এই করেই হবে। ক্রমে মনে ত্যাগ হবে। অর্থাৎ ঈশ্বর সত্য সব অনিত্য এ বোধ আসবে। তারপর তাঁর ইচ্ছা হলে একেবারেও ত্যাগ করিয়ে নিতে পারেন। আর যদি ঘরে রাখেন সে যেমন শার্শীর ঘরে থাকা। ভিতর বার দেখা যাচ্ছে। ভিতর মানে ঈশ্বর — তিনিই নিত্য, তিনি পরম বন্ধু, অনন্ত সুখ শান্তিরূপ এ বোধ হয়। আর সংসার, স্ত্রী পুত্র কন্যা ধনদৌলত মান যশ এ সব অনিত্য এ বোধ 'বাইরে' দেখা। তখন সংসার 'আশ্রম' হয়ে যায়। স্নেহের সঙ্গে শ্রদ্ধার মিলন হয়। পুত্রকন্যাদিকে দেখে ভগবান এইরূপে এসেছেন, তাই শ্রদ্ধা। যত শ্রদ্ধা বাড়বে স্নেহ তত কমবে। এখন যেমন স্নেহজ্ঞান পূর্ণ তখন হবে শ্রদ্ধাজ্ঞান পূর্ণ। তাহলেই গৃহস্থাশ্রম হ'ল। ঘরে বাইরে সেই একই সৌর্য কিরণ।

যাদের সাধুসঙ্গ হয় নাই কোনটা নিত্য কোনটা অনিত্য এই জ্ঞান হয় নাই তাদের বলছেন, 'মাটির ঘরে' বাস। সাধারণ মানুষের কথা। তারা ঈশ্বরকে দেখতে পায় না, বুদ্ধি মলিন — পশুবৎ জীবন ধারণ তাদের। এদের মধ্যে যারা ভাল তাদের হদ্দ চালের ফাঁক দিয়ে — সূতোর মত আলোর রশ্মি কখনও হয়তো এসে পড়লো। সাধুরা একেবারে মুক্ত আলোতে দাঁড়িয়ে — আলোর বন্যায়। জ্ঞানী ভক্তরা ঘরে থেকেও আলো পায় — কাঁচ ব্যবধান মাত্র। কিন্তু, মাটির ঘরে

বাস বদ্ধজীবের।

ডাক্তার কার্তিক বক্সী গৃহে বাস করেন — ঈশ্বরের জন্য বড় ব্যাকুল।

ডাক্তার বক্সী — একেবারে ত্যাগ করাই ভাল। দোটানায় প্রাণ যায় যায়।

শ্রীম (সস্নেহে) — তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তা হয় কৈ? ভোগবাসনা থাকলে একেবারে ত্যাগ হয় না। তবে যদি একান্ত ব্যাকুল হয় তা হলে হয়। ঠাকুর বলছেন, মনেপ্রাণে বললে তিনি শুনবেনই শুনবেন। অত জোর দিয়ে বলেছেন। এই তীব্র ব্যাকুলতা ভোগান্ত না হলে হয় না। ভোগের জন্য সংসারের কাজ করতে হয়।

নিত্য সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, নিত্য জপধ্যান প্রার্থনা, আর মাঝে মাঝে নির্জনবাস, এসব করতে করতে তাঁর কৃপা হয়।

কর্ম বাকী থাকলে সাধুরাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারে না। তীর্থে তীর্থে ঘোরে — বহুদক। কুটীচক হতে পাচ্ছে না। অনেক ঘোরা-ঘুরির পর ক্ষোভ বাসনা মিটে গেলে তখন মনস্থির হয়। তখন এক স্থানে বসে, আর ঈশ্বর চিন্তা করে। তখনকার মনের ভাব, সব ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়। চেষ্টাশূন্য হয়ে তখনই তাঁ'তে মনোনিবেশ করে।

সংসারে থাকলে মনাকাশে মেঘ উঠবেই। এই মেঘ সূর্যকে — ভগবানকে ঢেকে দেয়। সেই অন্ধকারে, সেই বিপদে ঈশ্বরকে তখন ব্যাকুল হয়ে প্রাণভরে ডাকা চাই — রক্ষা কর প্রভো, সুমতি দাও, বলে। আবার মেঘ কেটে যায়।

বর্ষাকালে আকাশে যেমন হয়ে থাকে। এই মেঘ এল সূর্যকে ঢেকে ফেললে, সব অন্ধকার, একটু হাওয়া এসে সব উড়িয়ে নিয়ে গেল — আবার খটখটে রোদ। মাঝে মাঝে আবার কালবৈশাখীও উঠে। অন্ধকার, ঝড়, গর্জন, বৃষ্টি। যে দেশে মেঘবাদল কম সেখানে বাস করা। সূর্য কিরণ দেয় সেখানে সারা বছর। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যোগী হয়ে থাকা। 'তস্মাৎ যোগী ভবার্জুন'। (গীতা ৬/৪৬)

ঠাকুর এসেছেন এই জন্য, ভক্তদের মেঘ কাটিয়ে দিতে। এখন

বর্ষা কেটে গেছে, উজ্জ্বল সূর্যকিরণ। যত পার উপভোগ কর। ভক্তদের তুলতেই তাঁর আগমন। যারা সংসারে থাকে তারা খুব আটকে যায় কি না! তাদের জন্য বেশী ভাবনা। যাদের ঘরের বাইরে নিয়ে যান তাদের মুক্ত গা। অত ভাবতে হয় না তাদের জন্য। বাপমায়ের ভাবনা আটকে গেছে ছেলের জন্য বেশী। তারপর নাবালক, পঙ্গু, অসমর্থদের জন্য ভাবনা। ভয় কি? ঠাকুর আছেন, মা আছেন পিছনে।

পাঠ শেষ হইয়াছে। কিছুকাল সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। পুনরায় শ্রীম কথা বলিতেছেন।

শ্রীম (সহাস্যে) — দ্বিজকে বাড়িতে মারে বকে, কেন ঠাকুরের কাছে যায়। তাই তাকে ঠাকুর শিক্ষা দিচ্ছেন। বলছেন, যার জ্ঞান হয়েছে তার নিন্দার ভয় কি? কুটস্থ বুদ্ধি তার — যেমন কামারের নেহাই। কত ঘা পড়ছে তবুও নির্বিকার। এগুলি ভক্তদের জীবনের mile stones — practical Vedanta (দিক্‌দর্শন — সত্যিকার জীবনের বেদান্ত)।

আর একটি শিক্ষা। স্ত্রী পুত্র কন্যা জলের ভুড়ভুড়ি। একটা বড় ভুড়ভুড়ির সঙ্গে ছোট ছোট অনেকগুলো রয়েছে। জলই সত্য মানে ঈশ্বরই সত্য। ভুড়ভুড়ি মানে সংসার অনিত্য দু'দিনের জন্য।

এই আর একটি। যত পুরুষ সব রামের অংশে রাম; আর স্ত্রী সীতার অংশে সীতা। ঈর্ষা দ্বেষ কাম ক্রোধ এসব যখন মনে আসে তারজন্য এইটি মহামন্ত্র — ব্রহ্মাস্ত্র।

ঠাকুর নিজের জীবন দিয়ে শিক্ষা দিতেন। তবে ভক্তরা গ্রহণ করবে। বলেছিলেন, 'এখন হঠাৎ ভুল হয়ে যায়। কিন্তু জেনেশুনে হবার যো নাই।' অর্থাৎ জেনেশুনে সত্য ছাড়বার যো নাই। বলছেন, মাকে সব দিলুম, কিন্তু সত্য অসত্য দিতে পারলুম না। এ অবস্থা অবতারের এক আধবার হয়। আর সাধারণ মানুষ সর্বদা ভুলে আছে। এ কেন বললেন? না, শরীর ধারণ করলে এ সব দমকা ঝঞ্ঝা হবেই। কিন্তু জেনেশুনে কখনও সত্য বিসর্জন করবে না। সত্য ব্রহ্ম। রাত্রি দশটা।

৪

মর্টন স্কুল। চারতলায় শ্রীম-র কক্ষ। এইমাত্র তিনি ঠাকুরবাড়ি হইতে ফিরিয়াছেন। এখন অপরাহ্ন সাড়ে চারটা। গ্রীষ্মকাল। সূর্যের তেজ প্রখর। দশটার সময় তিনি ঁঠাকুরবাড়িতে গিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নের স্নানাহার ঐখানে করিয়াছেন। বিশ্রামের পর সূর্যের তেজ কমিলে ফিরিয়াছেন।

ঠাকুরবাড়ি গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। উহা শ্রীম-র পৈতৃক ভবন। বড় পরিবার। ওঁর নিজের হিস্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যসেবা রহিয়াছে। শ্রীশ্রীমা নিজ হস্তে ঐ বাড়িতে ঠাকুরকে স্থাপন করিয়াছেন। তদবধি উহা ঠাকুরবাড়ি নামে পরিচিত।

ইদানীং পরিবারবর্গ ঐবাড়িতে আছে। মাঝে মাঝে তাদের খবর লইতে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার পর্যবেক্ষণ করিতে শ্রীম ওখানে যাইয়া থাকেন। অন্তেবাসী স্কুলবাড়িতে প্রহরী ছিলেন। শ্রীম আসিলে উনি বাহিরে গেলেন।

সন্ধ্যার একঘন্টা বাকী। অনেকগুলি ভক্ত চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন। মনোরঞ্জন, মাখন, গদাধর, বিনয়, ডাক্তার, বলাই, শুকলাল, শান্তি, জগবন্ধু প্রভৃতি শ্রীম-র জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সন্ধ্যা হয় হয়, শ্রীম আপন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ছাদে আসিলেন। হেরিকেনের আলো আসার সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণ ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন। তারপর ঈশ্বরীয় কথা। এখন আটটা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — যে যার সেবা করে সে তার সত্ত্বা পায়। (শান্তির প্রতি) তুমি যদি বিদ্যাসাগর মশায়ের সেবা কর তবে দানটান, দয়া, পরোপকার এই সব নিয়ে থাকতে ভালবাসবে। আবার যদি সুরেন বাড়ুয্যে মশায়ের সেবা কর তাহলে পলিটিক্স বেশ ভাল লাগবে। সি.আর. দাশ মশায়ের সেবা করলে স্বরাজ লাভে রুচি হবে। আর গুরু সেবাতে ঈশ্বর লাভ হবে। যে যাকে পূজে সে তার সত্ত্বা পায়।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — গুরুসেবা করা মানেই higher manকে

(উচ্চতর মানবের) পূজা করা। অর্থাৎ highest ideal-এর (সর্বোচ্চ আদর্শের) উপাসনা করা। ঈশ্বরই গুরুরূপে প্রকাশিত। গুরু পূজা মানে ঈশ্বর পূজা।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — ঠাকুর ছিলেন উত্তম বৈদ্য — অবতার, গুরু। তিনি জোর করে সেবা করিয়ে নিতেন। একটা সতরঞ্চি এনো এখানকার জন্য। নিজে গিয়ে কিনে আনবে। অপরকে দিয়ে নয়, এ কথা একজনকে বলেছিলেন। জানেন অপরের হাতে কিনাবে। তাই আগে থাকতে বলে দিলেন, নিজে কিনে আনতে। কেন করাতেন এইরূপ সেবা? না, ভক্তরা এইসব কথা স্মরণ করে পরে শান্তি পাবে।

একজনকে বললেন, 'তুমি একটা বাটি এনো'। অন্য একজন বললেন, 'আপনি যে অমুককে বলেছেন বাটি আনতে'। ঠাকুর উত্তর করলেন, 'হাঁ, সে আনুকগে। ও-ও আনবে।' দুটো বাটির কি দরকার ওঁর? তার মানে সেবা করিয়ে নিচ্ছেন ভক্তদের নিজের মঙ্গলের জন্য।

কাউকে হয়তো বলছেন, 'পা-টা কামড়াচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো?' ভক্ত পায়ে হাত বুলোতে আরম্ভ করেছে। তখন বলছেন, 'দেখ, (নিজের বুকে হাত দিয়ে) এখানে যদি কেউ থাকে তবে হাত বুলালে ভাল।' মানে, ফিল্ডে নামিয়ে নিয়ে তখন বললেন যুক্তি দেখিয়ে। ভক্তগুলি যুক্তিবাদী কিনা (হাস্য)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — বেদে আছে এসব কথা। 'যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ।'(শ্বেতা ৬/২৩) গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ তারই প্রতিধ্বনি করেছেন। 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। (গীতা ৪/৩৪) গুরুসেবা ছাড়া জ্ঞান লাভ হয় না, ভগবানে ভক্তি হয় না। (কার্তিকের প্রতি) আর একটা কি আছে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার — ইদং তে নাতপস্কায় না ভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।।
(গীতা ১৮/৬৭)

শ্রীম (সকলের প্রতি) — দেখ বলছেন, 'ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং'। যে গুরুসেবা করে নাই তাকে এই গুহ্য কথা বলবে না — আত্মজ্ঞানের কথা। এতে কি কোন পক্ষপাতিত্ব আছে? তা নয়। শত্রুমিত্রে সমান তিনি — যাঁর মুখ দিয়ে একথা বের হয়েছে। সূর্য যেমন ভাল-মন্দ সকলকে কিরণ দেন তেমনি শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি সকলের উপর সমান। কি করে ভিন্ন দৃষ্টি হবে? তিনি নিজেই যে এই সব হয়ে রয়েছেন। তিনি ছাড়া যে কিছুই নাই। তাহলে বিষমভাব কি করে হয়। ক্রাইস্ট তাই বলেছিলেন 'for he maketh his sun to rise on the evil and on the good,' (St. Matthew 5:45) (সূর্যকিরণ ভালমন্দ সকলের উপরই সমভাবে বর্ষিত হচ্ছে)। তবে যে এই বিষম ব্যবস্থা? তার মানে, সকলে তো আর এক stage (অবস্থার) নয় spiritual evolution-এ (আত্মিক বিকাশের পথে), তাই এ সব ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। যারা শুধু তাঁকেই চায় ঈশ্বরকে, সংসারে কোন বস্তু নয় কেবল তাদেরই জন্য অন্য ব্যবস্থা।

মোক্ষশাস্ত্র সকলের পক্ষে নয়। গুরুসেবা করলে বোঝা গেল একান্ত মনে ঈশ্বরেতে মন আসছে। শুধু তাঁকে চায় অন্য কিছু নয়। তখন ভক্ত তপস্যা করে ভগবানে ভালবাসার জন্য, গুরুর শরণ নিয়ে। গুরুর প্রতি ভালবাসা ক্রমে ভগবানে সঞ্চারিত হয়। শেষে দেখতে পায় গুরু আর ভগবান অভেদ।

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চার রকম objective (উদ্দেশ্য) মনুষ্য জীবনের। এর মধ্যে গীতায় কেবল মোক্ষের কথা রয়েছে। গীতার ব্যবস্থা শুধু মোক্ষকামীর জন্য। তারাই বুঝতে পারবে এর অর্থ, অপরে পারবে না। এদের preliminary requirements (প্রাথমিক সাধন) জানা আছে। সেগুলি পার হয়ে তবে তাঁর দর্শন। তাই তারা ফস করে ধরতে পারে next step (পরবর্তী সাধন) কি? মনে কর, এম.এ. ক্লাশের পাঠ পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেকে বললে কি সে বুঝতে পারে? না তার কাজে লাগবে কিছু! সেইরূপ এখানেও তাই বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। যাদের পালন করবার শক্তি আছে তাদের বলতে বলেছেন।

অধিকারীবাদ জগতে সর্ব বিষয়ে কার্যকারী।

শ্রীম (জনৈক যুবক ভক্তের প্রতি) — যারা শুধু ঈশ্বরকে চায় তারা 'অখণ্ডের ঘরের লোক' ঠাকুর বলতেন। অখণ্ডের ঘরের লোকদের লক্ষণ আছে, তাও বলেছেন। তাদের প্রথম চিহ্ন হল তারা লোকমান্য চায় না, দেহসুখ চায় না, অষ্টসিদ্ধি চায় না। কেবল শুদ্ধাভক্তি, জ্ঞান চায়। লোকশিক্ষার জন্য তাই ঠাকুর নিত্য নিজে মায়ের কাছে এইগুলির জন্য প্রার্থনা করতেন। আর একটি লক্ষণ, তারা নিরহংকার। 'আমি তাঁর' এই অহংকার মাত্র থাকে। জাগতিক কোনও পদার্থের সঙ্গে নিজেকে identify (অঙ্গীভূত) করে না। বলতেন, এরা যেন মূলো গাছ, শিকড় শুদ্ধ উঠে আসে টান মারলে। আর যে ভক্তের মন কতক ঈশ্বরে কতক সংসারে তাদের বলতেন খণ্ডের ঘরের লোক। তাদের অহংকার যায় না। তারা যেন অশ্বত্থ গাছ। হাজার কাট, ফেকড়ী বেরুবেই। কি আশ্চর্য, ঠাকুর এক মুহূর্তের জন্য ভুলেন নাই, ঈশ্বরই সব — মা-ই সব হয়ে রয়েছেন, মা-ই সব করছেন।

দু'টি contradictory point-এ (বিপরীতভাবে) ঠাকুর move (যাতায়াত) করতেন। একটি 'মা', অপরটি 'ছেলে'। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই মা। স্বরূপে থাকেন সময় — ব্রহ্ম, আর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন যখন তখন মা! আর একটি 'ছেলে' মানে ভক্ত, জগতে প্রচারের, প্রকাশের যন্ত্র। জীব, ভক্ত, এটি অবলম্বন করে মা জগতের good and evil (ভাল মন্দ), সব প্রদর্শন করেন — যেন একটি exhibition ground (প্রদর্শনীক্ষেত্র)। এই জীবত্ব কি করে perfectly saturated with (সম্পূর্ণরূপে সংপৃক্ত) শিবত্বে, তাই ঠাকুরের জীবনে দেখা গিয়েছে। ভেদ না থাকলে লীলা হয় না। তাই মা ও ছেলে। আবার মা-ই ছেলে, কিম্বা ছেলেই মা — সম্পূর্ণরূপে এ জ্ঞান ঠাকুরের সর্বদা ছিল। এই inconceivable points (অভাবনীয় ভাবদ্বয়) যেখানে meet (মিলিত) হয়, তাকেই অবতার বলে। এদিক দিয়ে গেলে অচিন্ত্য ভেদাভেদ দাঁড়ায়। আর কেবল উপর থেকে দেখলে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' — ব্রহ্ম সত্য জগৎ

মিথ্যা, এই অদ্বৈতভাব।

অখণ্ড abstract term (অতিসূক্ষ্মতত্ত্ব) কিনা। তাই এটা বোঝাবার জন্য তিনি এক একবার অবতার হয়ে আসেন। অবতার হলেন concrete (বাস্তব ফল)। অবতার না হলে মানুষ ঈশ্বরকে ধরতে পারে না, বুঝতে পারে না। মানুষের মনের গঠনই এইরূপ, concrete (বাস্তবরূপ) ছাড়া কিছু বুঝতে পারে না। অবতারের জীবন ও কার্য দেখলে তবে ধারণা হয় 'অখণ্ড' কি। আতর যেমন শুধু নেওয়া যায় না, তুলোতে করে নিতে হয়। তেমনি অবতারকে দেখলে অখণ্ডের জ্ঞান হয়। অবতারাদি ঈশ্বরকোটিগণ অখণ্ডের ঘরের লোক।

শ্রীম এতক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সাগরে নিমগ্ন ছিলেন। তাই দেহের জ্ঞান ছিলনা। গ্রীষ্মকাল দারুণ গরম। বৃদ্ধ শরীরে উহা বোধ হয় আরোও বেশী। কিছুক্ষণ ধরিয়া তাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন — ক্লান্তির ভাব দেখা যাইতেছে। তবুও মন ঈশ্বরীয় বিষয়ে সংলগ্ন। বলিতেছেন, 'আহা, এই স্থানটি (ছাদ) কি সুন্দর, তপস্যার স্থান। চারদিকের কিছুই দেখা যায় না।'

শুকলাল ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করিলেন। তারপর 'কথামৃত' পাঠ হইতে লাগিল, দ্বিতীয় ভাগ চতুর্দশ খণ্ড — শ্রীরামকৃষ্ণের চৈতন্য-লীলাদর্শন। শান্তি পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে কথাও হইতেছে।

একজন ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — হাজরা মশায়কে ঠাকুর একদিন 'পাজি' বলেছিলেন কেন?

শ্রীম — নরেন্দ্রকে উল্টো মত শিখিয়ে ছিলেন বলে। হাজরা মশায় শক্তি মানতেন না; বলতেন শক্তি মিথ্যা। আজও পড়া হলো, হাজরা মশায় বলছেন — চৈতন্যলীলা 'এসব শক্তির লীলা — বিভু এর ভিতর নাই।' ঠাকুর বলছেন বিভু ছাড়া কখনও শক্তি নাই। 'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ' যেমন, জল আর জলের হিমশক্তি, অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। ব্রহ্ম বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। তবে শক্তির প্রকাশের তারতম্য আছে — কোথাও বেশী কোথাও কম।

শঙ্করাচার্যও শক্তি মানতেন। কত স্তবস্তুতি তিনি লিখেছেন।

বলেছেন, 'কুপুত্রো জায়তে কচ্চিদপি কুমাতা ন ভবতি।' ব্রহ্ম ছাড়া শক্তি হয় না। আবার শক্তি ছাড়া লীলা হয় না। চৈতন্যদেবও শক্তির আরাধনা করেছিলেন। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ শক্তির পূজা করেছিলেন।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে জগৎগুরু বানাবেন। তাই শক্তি সত্য এই শিক্ষা দিচ্ছেন। হাজরা বলেন, শক্তি মিথ্যা। তাই বলেছিলেন, 'তুমি তো বড় পাজি'। শক্তির সহায়তা ছাড়া লোকশিক্ষা হয় না। নরেন্দ্র প্রথম শক্তি মানতেন না। পরে মেনেছিলেন। তবেই তো তাঁকে দিয়ে জগতের শিক্ষা হ'ল।

ঠাকুর বলতেন, যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণ শক্তির এলাকা। নিজের বেদান্ত সাধনের গুরু তোতাপুরীও শক্তি মেনেছিলেন শেষে ঠাকুরের সংস্পর্শে থেকে। রোগে ভুগে ভুগে শেষে মান্‌তে হয়েছিল।

হাজরা মশায়কে কি গাল দিয়েছেন যেমন মানুষে দেয় তা নয়! তাতে বিষ নাই। শাসন করলেন মাত্র, যেমন ছেলেকে শাসন করেন পিতা। তাঁতে দ্বেষ, ঈর্ষা ছিল না। তিনি সকলের পিতা। হাজরা মশায়কে তো উনিই ওখানে রেখেছিলেন। আবার নিজের দুধের ভাগ তাঁকে দিতেন।

বড় জিতেন — অত জ্বালাতন করেন তবুও কেন কাছে রাখা — যেন একটা standing criticism (স্থায়ী নিন্দুক)।

শ্রীম (সহাস্যে) — তার জবাব ঠাকুর নিজেই দিয়ে গেছেন। বলেছিলেন, জটিলে কুটিলে না হলে লীলা পোষ্টাই হয় না। রাধাকৃষ্ণ লীলার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়েছে জটিলা আর কুটিলার বাধাতে। এঁরা শ্রীরাধার শাশুড়ী আর ননদ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনে বাধা দিতেন ওঁরা সর্বদা। তাতেই শ্রীরাধার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হত। হাজরা মশায়ের উল্টো কথাতেই ঠাকুরের সিদ্ধান্তের সুপ্রকাশ। যেমন কালো ভেলভেটের উপর ডায়মণ্ডের উজ্জ্বলতার বৃদ্ধি হয় তেমনি হাজরা মশায়। আজও পড়া হলো, হাজরা মশায় বলছেন — ঈশ্বর লাভ হলে ঈশ্বরের মত ষড়ৈশ্বর্যশালী হয়। ঠাকুর protest (আপত্তি) করলেন একথা। ঠাকুরের মত শুদ্ধভক্ত কখনও ঐশ্বর্য চায়

না। ঠাকুর বলছেন, 'যে কখনও ঐশ্বর্য ভোগ করে নাই সে-ই ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য করে অধৈর্য হয়।'

'কথামৃত' পাঠ শেষ হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিতেছেন। মাঝে মাঝে ভাবসমাধিতে নিমগ্ন — সঙ্গে শ্রীম ও বাবুরাম।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই যে থিয়েটার দেখতে যাওয়া এটা কি হঠাৎ কিছু হলো? তা নয়। পূর্ব থেকে ঠিক ছিল ওখানে যেতে হবে। এটি অবতার লীলার একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। ভগবানের নাম পতিতপাবন। এখানে এই ভাবটির প্রকট হলো। ভক্ত যেখানেই থাকুক না কেন ভগবান তার কাছে যাবেন। ছুঁচ চুম্বককে আকর্ষণ করে। আবার কখনও চুম্বকও ছুঁচকে আকর্ষণ করে। ভগবান অন্তর্যামী। তিনি ভক্তদের হৃদয়ের ডাক শুনতে পান। নিজে গিয়ে নিয়ে আসেন ধরে আপন জনকে যেমন বাপ মা আপন সন্তানকে গিয়ে ধরে আনে।

অনেকে তখন থিয়েটার ঘৃণা করতো মেয়েরাও তাতে পার্ট নেয় বলে। ব্রাহ্মসমাজের একজন বলেছিলেন, 'যখন পরমহংস মশায়ের কাছে থিয়েটারের লোকেরা আনাগোনা করতে আরম্ভ করলো তখন আমরা সেখানে যাওয়া বন্ধ করলাম।' তাঁরা good boy (ভাল ছেলে) সাজলেন আর কি! কিন্তু ভগবান হৃদয় দেখেন ভক্তের বাইরেটা নয়। কথাও নয়, বাইরের কাজও নয় — কেবল ভিতরটি। ভক্তরা যখন খুব আটকে যায় তখনই প্রাণপণে তাঁকে ডাকে। গিরিশবাবুর অন্তরের ডাক পৌঁছেছিল তাঁর কানে। তাই গেলেন তাঁকে কোলে টেনে আনতে। যাবেন না? পুত্রকে কে ছাড়তে পারে? আপনজন যে!

'চৈতন্যলীলা'টি গিরিশবাবুর পূজার নৈবেদ্য। এই নৈবেদ্য দিয়ে তিনি ভগবান লাভ করলেন। কত ভক্তির কথা এতে। যার তার কাজ নয় এরূপ রচনা। নাটক লেখার লোকের অভাব নাই; কিন্তু ঈশ্বরে এরূপ আন্তরিক ভক্তি ক'জনের হয়? গিরিশবাবুতে এ দুটি শক্তি রয়েছে — কাব্যশক্তি ও উর্জিতা ভক্তি। পড়না শেক্সপীয়র, এসব উচ্চভাব কোথায় সেখানে। কিন্তু কালীদাস পড়, তাতে পাবে।

কতবড় ভক্তবীর গিরিশবাবু! শোনা যায়, প্রথম জীবনে বহু তপস্যা করেছেন। নিত্য গঙ্গা স্নান করে হবিষ্যি খেয়ে সর্বদা শিবনাম জপ করতেন। চুল দাড়ি রাখতেন, খালি পায়ে চলতেন — যেমন তপস্বীরা করে থাকেন। মনে করেছিলেন এতেই ঈশ্বর দর্শন হবে শুধু তপস্যায়। কিন্তু অত করেও হলো না। তাঁর কৃপা ছাড়া কি হয়? কৃপালাভ তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়।

তপস্যা দিয়ে তাঁকে লাভ হ'ল না। কেবল পুরুষার্থে তিনি দেখা দিলেন না। তখনই উল্টো রাস্তা ধরলেন। থিয়েটারে নাবলেন। নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন।

থিয়েটারের আনুষঙ্গিক সব ব্যসন একে একে দেখা দিল। এরূপও শোনা যায়, বলেছিলেন, 'যদি ঈশ্বর নিজে গুরুরূপে এসে টেনে নেয়, তবেই ফিরবো নচেৎ চললো গিরিশ উল্টো পথে।' বীরভক্ত কিনা, কোনও গোপন নাই তাতে। প্রকাশ্যে সব করতে লাগলেন। কে কি বলবে তাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। এটিও পুরুষার্থ বটে; কিন্তু উল্টো পুরুষার্থ। কে পারে এরূপ করতে?

চললেন বটে উল্টো পথে কিন্তু ভক্তটি লুকিয়ে রইলো তাঁর ভিতর। বাইরে যাই করুন না কেন, ভিতরের ভক্তটি অমর, শুদ্ধ, বুদ্ধ। নাট্য সম্রাট গিরিশ, আর ভক্ত শিরোমণি গিরিশ এ দু'য়েতে লড়াই লেগে গেল। ভক্তেরই জয় হলো শেষে। অভিমানী ছেলেকে স্নেহময় পিতা কোলে তুলে নিয়ে এলেন। এই মহাকার্যটি সাধনের জন্য ঠাকুরের থিয়েটারে গমন। এটি তাঁর পতিতপাবন নামের নূতন সংস্করণ। গিরিশবাবুর সঙ্গে আরোও কত লোকের উদ্ধার হয়ে গেল। ভক্তের মান রক্ষা হলো।

শেষে আর থিয়েটার করতে চান না। ঠাকুর বললেন, 'না যেমন করছো কর। এতেও মার নাম প্রচার হচ্ছে, লোকশিক্ষা হচ্ছে।' যে বিষে প্রাণ যায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে পড়লে তাতেই প্রাণ রক্ষা হয়। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য এঁদের জীবনেও এই লীলার অভিনয় দেখা যায়।

গিরিশবাবু অপরের কাছে সিংহ। কিন্তু ভক্তদের কাছে একেবারে শিশু। অত মহৎ ছিল অন্তরটি। আমরা যেতুম, তখন কাজ ফেলে

দিয়ে তাঁর কথা বলতে আরম্ভ করতেন — কি দীনভাব, কি আর্তি। তাইতো ঠাকুর বলেছিলেন, 'গিরিশের পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।' তিনিই তো ধরে ফেললেন অবতার বলে, আর তাই অপরকেও বলতে লাগলেন।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — 'he maketh his sun to rise on the evil, and on the good'(St. Matthew 5:45) — সমদর্শী ভগবান। সূর্যের ন্যায় তাঁর প্রেম সর্বভূতে সমান। গিরিশ-উদ্ধার দেখে অপরের ভরসা হল। ক্রমে সব শোধরাতে লাগলো। বাজারের মেয়েরা পর্যন্ত উপরে উঠতে লাগলো। ক্রাইস্টের একটি ভক্ত মেরী, খুব বড় ঘরের মেয়ে ছিলেন। বাপ মার মৃত্যুর পর অন্যরকম হয়ে গিছলেন। কিন্তু ভিতরে ছিল ভক্তি। তাই খুব অনুশোচনা এলো। তখন ক্রাইস্ট গিয়ে তাকে উদ্ধার করলেন। তাঁকেই প্রথম দেখা দেন ক্রাইস্ট মৃত্যুর পর। কত ভালবেসেছিলেন বোঝ। ম্যাগ্‌ডালা (Magdala) প্রাসাদ ছিল তাঁর নিবাস।

অম্বপালীকে উদ্ধার করলেন বুদ্ধ। আর চৈতন্যদেব প্রব্রজ্যার সময় উঠিয়ে দিলেন অপর একটি বিত্তশালিনী পতিতাকে। তাঁদের কাজই এই। তাঁরা আসেনই এইজন্য, ভক্তদের তুলতে। অত নিচে পড়ে গেছে যে তাঁকে আসতে হয় তাদের তুলতে, অবতার হয়ে। ভিতর দেখেন অবতারগণ। ভিতরে ভক্তি দেখলে, সাফ দেখলে একটা ছুতো করে গিয়ে ধরে নিয়ে আসেন। সাধারণ মানুষ এ লীলা কি বুঝবে! 'কহত কবীর শুন ভাই সাধু — সব সন্তান কে সাথ ম্যায়।'

প্রাসাদের উপর থেকে ক্রাইস্টকে একদিন দেখেছিলেন মেরী। তারপরই অনুশোচনা আরম্ভ হলো। তারপর উদ্ধার।

মর্টন ইনস্টিটিউশন, কলিকাতা, ২১শে এপ্রিল, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ।
৮ই বৈশাখ, ১৩৩১ সাল, সোমবার। কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি।

ষোড়শ অধ্যায়

কলির নিদান ব্যাকুল ক্রন্দন

১

কলিকাতা। মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। অপরাহ্ণ পাঁচটা। শ্রীম পশ্চিমাস্য চেয়ারে উপবিষ্ট। সম্মুখে ভক্তগণ — ডাক্তার বক্সী, ছোট নলিনী, বিনয়, 'ভবরাণী' (ভোলানাথ মুখার্জী), বড় জিতেন, ভাটপাড়ার ললিত, গদাধর, বসন্ত, 'ভীম', জগবন্ধু প্রভৃতি উপস্থিত। একটু পর ভাই ভূপতি, মহারাজের একজন ভক্ত আসিলেন — সঙ্গে একজন বন্ধু।

আজ অমাবস্যা ৫৫ দণ্ড।৪১ পল; ৩রা মে, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ ২০শে বৈশাখ, ১৩৩১ সাল। শনিবার বলিয়া অনেকেই অফিসের ফেরৎ আসিয়াছেন। শাস্ত্রাদি পাঠের কথা হইতেছে ভক্তদের মধ্যে পরস্পর।

শ্রীম (ভাটপাড়ার ললিতের প্রতি) — শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে? শুধু শাস্ত্র পড়ার সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নাই। সঙ্গে সঙ্গে বিবেক-বৈরাগ্য থাকে — শাস্ত্রের বাণী পালনের চেষ্টা থাকে, তবেই শাস্ত্র পড়া সার্থক হয়। ঠাকুর তাই বলতেন, কেবল বই পড়া, শাস্ত্র পড়াতে কি আছে? ধারণা করতে চেষ্টা করতে হয়। তবেই নিজের ও অপরের উপকার হয়। তাই ঠাকুর বলতেন, চিল শকুন খুব উঁচুতে উঠে বটে কিন্তু দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ে — কামিনীকাঞ্চনে। শুধু পাণ্ডিত্যে কিছুই নেই। তপস্যা করতে হয়, শাস্ত্রের কথার সাধন করতে হয়, তবে শাস্ত্রের অর্থ বোধগম্য হয়, ধারণা হয়।

শাস্ত্রে আবার আর এক বিপদ ঢুকেছিল। Interpreter-রা (ভাষ্যকাররা) নিজ নিজ opinion (অভিমত) ঢোকাতে আরম্ভ

করেছিল। এই করে অত interpolation-এর (প্রক্ষিপ্তের) সৃষ্টি হয়েছে। ঠাকুর তাই বলতেন, শাস্ত্র শুনতে হয় গুরুমুখে, অবতারের মুখে। শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশান রয়েছে। গুরু কেবল বালি ছাড়িয়ে চিনিটুকু মুখে তুলে ধরতে পারেন। গুরুমুখ ছাড়া পড়লে সমূহ বিপদে পড়তে হয় — অধিকতর সংশয়ে পড়তে হয়। 'যদি ছিল রোগী বসে, বদ্যিতে শোয়ালে এসে', — এই অবস্থা হয়, ঠাকুর বলতেন।

বর্তমান সময়টি বড় সঙ্কটজনক — নানা মতবাদের সংঘর্ষের সময়। একদিকে ভারতীয় নানা ধর্ম্মমতের সংঘর্ষ, তাতে আবার খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মমতের বিকাশ হয়েছে। এইসব মতই চিরসুখ শান্তি প্রাপ্তিকে আদর্শরূপে মান্য করে। মতভেদ থাকলেও ঐমতে সব এক। এ সবের সঙ্গে নূতন এক মহাবিপদের সংঘর্ষ উপস্থিত, পাশ্চাত্য জড়বাদের materialism-এর। এটিই হলো প্রধান প্রতিপক্ষ। চিরকালই এই মতবাদ রয়েছে। কিন্তু এখন 'সায়েন্সের' প্রভাবে এর বিকটরূপ প্রকাশিত হয়েছে। আহার বিহার, মৈথুন ভয় — এই মতবাদের সার এই। এর উপরে উঠতে পারে না। মনে করে লোক 'good life' lead করবো কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় না। স্বাভাবিক কামক্রোধাদি রিপু প্রবল হয়ে মানুষকে পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত করায়। এদেশের ঋষিরা মানুষের এই স্বাভাবিক পশুবৎ আচরণের সংবাদ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাই তাঁরা এ ভাবটাকে transform (পরিবর্তিত) করবার জন্য উপায় খুঁজে বের করেছিলেন। সেইটে সমাজে শিক্ষা দিয়েছেন। তারই প্রভাবে ভারত ধর্মক্ষেত্র হয়েছিল। সেটি হলো মানুষের দেবত্বর আবিষ্কার। মানুষ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' — এই সত্যটি তাঁরা দর্শন করেছিলেন। এটি সমাজের সকল স্তরে অচ্ছেদ্যরূপে fit in (অনুপ্রবেশ) করিয়ে দিয়েছিলেন। এই দেবত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা প্রধান চারটি রাস্তা আবিষ্কার করেছিলেন — জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ।

ঠাকুর বলতেন, কলিকালে মানুষের মন দুর্বল, আয়ু কম, একবেলা

না খেলেই প্রাণ যায় যায়। তাই এই কালের জন্য তিনি ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন ভক্তিযোগের। এটাই যুগধর্ম। এই ভক্তিযোগেরও একটি নূতন সংস্করণ তিনি নিজে আবিষ্কার করেছেন। এই পথেই তিনি ব্রহ্মদর্শন করেছেন। তাই করতে উপদেশ দিয়েছেন লোকদের। বলেছেন নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাক, বল — হে প্রভো, দেখা দাও, দেখা দাও। নিজগুণে দেখা দাও। আমি সাধনহীন ভজনহীন, বিবেক বৈরাগ্যহীন - কৃপা করে দেখা দাও। আবার সত্যি করে, প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, আন্তরিকভাবে তাঁকে বললে দেখা দিবেনই দিবেন। কে বলতে পারে একথা ঈশ্বর ছাড়া? ঈশ্বর স্বতন্ত্র, তিনি দর্শন দিবেনই, নিশ্চয় করে একথা কেবল ঈশ্বরই বলতে পারেন। তিনি যখন সত্যি করে বলেছেন তখন বলতে হবে তিনি ঈশ্বর, মানুষরূপে এসেছেন, সোজা পথ দেখিয়ে দিতে।

এসব হলো তাঁর মহাবাক্য। এ যেন কষ্টি পাথর, মিলিয়ে নাও এতে ঘষে — সোনা যেমন সেকরারা নেয়। এ সব মহাবাক্য যেমন 'life belt' (জীবনতরী) জড়বাদের সংঘর্ষে পীড়িত মানব মনের জন্য বর্তমান সংশয়-সাগর রূপ মহাবর্তে।

শ্রীম-র উপর দিয়া একটি চিল উড়িয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া শ্রীম কি ভাবিতেছেন। যেখানে যা দরকার সব একেবারে ঠিক। আমাদের হাতগুলি জোড়া থাকলে আমরাও উড়তে পারতাম। ‘এনজেল’দের এমনতর পাখা আছে শোনা যায়। মানুষ নিজেকে বড় শ্যেয়না — বড় বুদ্ধিমান মনে করে। একবার এদিকে দৃষ্টি করলে ভেঙ্গে যায় ঐ অহংকার। মানুষ জীবজন্তু প্রভৃতির দেহের নির্মাণ, জন্ম ও জীবন পরিচালনার দিকে গভীর মনোযোগ দিলে শেষে মন বিশ্বস্রষ্টার চরণে গিয়ে উপস্থিত হয়। এক নিমেষে এই বিশ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে compare (তুলনা) করলে নিজের ক্ষুদ্রতা ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হতাশভাব আসে আর সেই সঙ্গে জীবের স্বরূপের জ্ঞান লাভ হয় — জীব ঈশ্বরের সন্তান — অমৃতের সন্তান। তা হলেই কার্য উদ্ধার হয়ে গেল। এখন এই ভাবটি নিয়ে পড়ে থাক

সংসারে — তা হলেই শোকে মোহে দুঃখে পথভ্রান্ত হবে না। দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার শক্তি আসবে — ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি বাড়বে। মনে হবে, আমার আপনার লোক ঈশ্বর — পিতামাতা বন্ধু। ব্যস্, তা হলেই অনেকটা শান্তি! বাকী সাক্ষাৎ দর্শন, সেটা তাঁর ইচ্ছা। এ অবস্থাটাই লক্ষ্য করে ঠাকুর বলছেন, একটুকু খেটেখুটে সাধুসঙ্গ, তপস্যা করে বেয়ে চেয়ে নৌকোটা মাঝগঙ্গায় নিয়ে যাও। তখন পালে আপনি চলবে নৌকো। কেবল বৈঠেটা ধরে থাক। আর গান গাও, তামাক খাও অর্থাৎ নিশ্চিন্ত আনন্দে থাক। 'বৈঠে' ধরে থাকা মানে, ঈশ্বর সর্বমঙ্গলময় — আমার মঙ্গলের জন্য সব হচ্ছে এই বিশ্বাস।

ঈশ্বরের সম্বন্ধে লেকচার দিবে, তা শুনবে কে? কিন্তু তাঁর ইচ্ছায় যদি কেউ তাঁর কথা বলে তবে শোনে লোক। তাতে কাজও হয়। ঈশ্বরের সম্বন্ধে সব কথা মোক্ষতত্ত্ব যার তার কাছে বলতে নাই। পাত্র ছোট বলে সকলে ধারণা করতে পারে না — তাই তো গীতায় ভগবান সাবধান করে দিয়েছেন — 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্' (গীতা ৩/২৬)। আবার পাত্র বড় থাকলেও আবর্জনাপূর্ণ। একটু কিছু রাখলেই উপচে পড়ে। এই যে অবতার পুরুষরা এসে কথা কন তাই ক'জনে নিচ্ছে? আর তুমি বললেই নেবে?

বাইবেলে আছে লেজারাস্ ও এব্রাহামের কথা। লেজারাস্ একজন ভিক্ষুক — এক ধনীর বাড়িতে ভিক্ষা চাইছে। ধনী ভিক্ষা দিলে না, অন্নাভাবে লেজারাসের মৃত্যু হয়। কয়েক দিনের মধ্যে ধনীরও মৃত্যু হয়। ধনী গেল নরকে আর লেজারাস্ গেল স্বর্গে এব্রাহামের কাছে। এব্রাহাম তাকে কোলে তুলে নিলেন, লেজারাস্ ভক্ত কিনা তাই! স্বর্গ থেকে নরক দেখা যায়। ধনী নরক থেকে লেজারাস্‌কে দেখে চিনতে পারলো। নরকে তার দারুণ যাতনা হচ্ছে। তাই তার সাহায্য প্রার্থনা করলো। ভক্তের হৃদয় কোমল। লেজারাস্ তক্ষুণি কাপড় পরে রওনা হলো সাহায্য করতে তাকে। এব্রাহাম বললেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি অত তাড়াতাড়ি। লেজারাস্ উত্তর করলে নরকে — ঐ ধনীকে

সাহায্য করতে। সে বড় কষ্টে আর্তনাদ করছে। এব্রাহাম শুনে বললেন, লেজারাস্ তুমি কি পাগল হয়েছো! এখান থেকে কেউ নরকে যেতে পারে না — দেখা গেলেও। There is an impassable gulf between heaven and hell! এক অনতিক্রমণীয় সাগর রয়েছে স্বর্গ ও নরকের মধ্যস্থলে। অতিশয় দুঃখিত হয়ে এই কথা ধনীকে বললে লেজারাস্। ধনী তখন বললেন, আচ্ছা তাহলে আমার আর একটি উপকার তুমি কর। আমার বাড়িতে গিয়ে আমার পরিবারবর্গকে বলে এসো — 'স্বর্গ নরক দুইই আছে, দুইই সত্য। শুভ কর্মে স্বর্গ লাভ হয় দুষ্কর্মে নরক বাস।' লেজারাস্ আবার কাপড়চোপড় নিয়ে রওনা হলো। এব্রাহাম দেখে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? লেজারাস্ উত্তর করলো, এবার যাচ্ছি ঐ ধনীর বাড়িতে তার আত্মীয়বর্গকে বলতে যে স্বর্গ নরক দুইই আছে। তোমরা ভাল কাজ কর, দান ব্রত দয়া ধর্ম অনুষ্ঠান কর — ঈশ্বরকে ভক্তি কর। এব্রাহাম সস্নেহে হাস্য করে বললেন, বাছা, তুমি বড়ই পাগল। তুমি গিয়ে ওদের এইসব কথা বললে, তারা বিশ্বাস করবে কেন? তারা মনে করবে তুমি একটা imposter (প্রতারক)।

বললেই কি লোকে শোনে! সময় না হলে কেউ শোনে না। অবতার এসে কত বললেন, তাই শোনে ক'জন? আর তোমার লেকচার শুনবে? শুনতেও পারে, কিন্তু পালন করা, বিশ্বাস করে — এটি হবে না সময় না হলে।

তাইতো ঠাকুর ভক্তদের বলতেন, 'কাকেই বা বলি কেই বা শোনে।' 'সব দেখছি কড়ার ডালের খরিদ্দার'। দেখ, নিজের অন্তরঙ্গদের সম্বন্ধেই যদি এই কথা তবে সাধারণ লোকের কা কথা।

ঠাকুর যা করতে বলেছেন তা করে কে? (বড় জিতেনকে লক্ষ্য করে) — খালি বলে, কিচ্ছুই হলো না, কিচ্ছুই হলো না। (একটি অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারী ডাক্তারের বাড়িতে এখন রয়েছেন তাঁকে লক্ষ্য করে) — দেখ না ঠাকুর বলেছেন, সাধু গৃহস্থের বাড়িতে আসবে না। গৃহস্থ বাড়ি মানে ভোগের আড্ডা। কে শুনছে তাঁর এই কথা।

কোথাও কিচ্ছু নেই একটু চোখ বুজলেই হয়ে গেল সব ধর্ম। এতো সোজা নয় — প্রথম প্রথম কথা শুনতে হয়, পালন করার চেষ্টা করতে হয়। গাছ মোটা হলে হাতী বেঁধে দাও অনিষ্ট হবে না।

(অন্য একজন ভক্তকে লক্ষ্য করে) — ঠাকুর একদিন বললেন একজনকে, বাছা, 'আমিটা'কে অনেক খুঁজেছিলাম কিন্তু পেলাম না। খুঁজে খুঁজে শেষে দেখলাম তিনি, মা, ঈশ্বর। আর দেখলাম, এই শরীরটা যাকে লোক 'আমি' বলে এটা একটা যন্ত্রবিশেষ, অচেতন নশ্বর। সেইদিন থেকে ঠাকুর প্রার্থনা আরম্ভ করলেন, মা আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী — যেমন চালাও তেমনি চলি যেমন করাও তেমনি করি।

যাদের দেখতেন ঈশ্বরীয় কথা ধারণা করতে পারছে তাদের জন্যই ভাবতেন। কেন? না তারা উপযুক্ত পাত্র বলে। বহিরঙ্গ ভক্তদের কাছেও যেতেন ঈশ্বরীয় কথা শোনাতে — যেমন যদু মল্লিক।

কেউ কেউ আছে খালি ছুটাছুটি করে বেড়ায়। আজ এখানে কাল ওখানে। বুঝতে হবে এদের আধার ছোট। বড় আধার হলে অল্প ছুটাছুটির পরই একটা ভাব আশ্রয় করে পড়ে থাকে।

ধর্ম সাধনে ধৃতিযুক্ত বুদ্ধির দরকার। তবে progress (উন্নতি) করতে পারে। কুয়া খুড়তে হবে। একস্থানে একটু খুড়ে শক্ত মাটি দেখে ছেড়ে দিলে প্রায় কুয়া খোড়া হয় না। সে জলও পাবে না — ছটফটানি করবে সারাজীবন। যে এক স্থানে খুঁড়ে ধৈর্যের সহিত, সে-ই জল পায় অর্থাৎ বস্তু লাভ করে। ভগবানের জ্ঞান ভক্তি লাভ করে — তাঁর দর্শন হয়।

২

এখন সাড়ে সাতটা সন্ধ্যা। শ্রীম বললেন, 'ললিতবাবু উঠুন এইবার আপনার অনেক দূর যেতে হবে। ললিত, 'ভীম', 'ভবরাণী', বসন্ত উঠিয়া গেলেন রেল ধরিতে হইবে।

শ্রীমও নৈশ ভোজনের জন্য তিনতলায় নামিয়া গেলেন। বিনয় ও জগবন্ধু শ্রীম-র জন্য চটিজুতা খরিদ করিতে বাজারে গেলেন।

রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম ভোজনের পর উপরে আসিয়াছেন। বিনয় ও জগবন্ধু ফিরিয়াছেন। বড় জিতেন প্রভৃতি ভক্তগণ ছাদে এই একঘন্টা বসিয়া আছেন।

শ্রীম আসন থেকে উঠিয়া গিয়া ছাদের উত্তরের দিকে জিতেন মুখুয্যের সহিত কি কথা কহিতেছেন। একটু পর আসিয়া পুনরায় আসনে বসিলেন। ভৌমিক মশায় শ্রীম-র হাতে বেলুড়মঠের প্রসাদ দিলেন। শ্রীম জুতা ছাড়িয়া উহা গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন আর দর্শন করিতেছেন। এক কণিকা গ্রহণ করিয়া একজনের হাতে দিলেন ভক্তদের বিতরণ করিবার জন্য।

অমৃত গুপ্তর প্রবেশ। একটু দূরে দাঁড়াইয়া যুক্ত করে ইনি শ্রীমকে প্রণাম করিতেছেন। ইনি সাবরেজিস্ট্রার, কর্মস্থল চাকদা। সেখান হইতে আসিয়াছেন।

শ্রীম (সহাস্যে জনান্তিকে) — জগবন্ধুবাবু, আপনার মিশন successful হয়েছে দেখছি। শ্রীম ও সকলের উচ্চহাস্য। অমৃত অপ্রস্তুত।

শ্রীম ভক্তদের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে বারণ করেন, বলেন এতে তাঁর কষ্ট হয়। ভক্তগণ ইহা জানেন। তবুও কেহ কেহ পায়ে হাত দিতে যান আর শ্রীম চঞ্চল হইয়া পড়েন। আজ তিনি জগবন্ধুকে বলেছিলেন, তিনতলা থেকে উঠবার সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া সকলকে বলেন আবার, পায়ে হাত না দিতে। আজ সকলেই উহা পালন করেছেন। অমৃত সর্বশেষ আসিয়াছেন। তিনি খুব ভক্তিমান লোক। তিনি যুক্তকরে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়াই শ্রীম ঐ কথা বলিলেন, 'মিশন' সিদ্ধ হয়েছে। অমৃত সব ব্যাপার বুঝিয়া হাসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও হাসিলেন। শ্রীমও মুচকি হাসিলেন। কিছুক্ষণ সকলেই নীরব — রঙ্গরসের পর। আবার ঈশ্বরীয় কথা আরম্ভ হইল।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আপনারা এতক্ষণ কি করছিলেন?

বড় জিতেন — আপনি যেমন বলেন, 'মায়ের মাই' খাচ্ছিলাম।

শ্রীম — হাঁ, মায়ের মাই-ই খাচ্ছি — এই যে নিঃশ্বাসটি নিচ্ছি এটি মায়ের মাই বৈ কি। এটি না হলে হাওয়া না থাকলে এক্ষুণি প্রাণ বেরিয়ে যাবে। এ সবই মায়ের মাই — হাওয়া জল খাদ্য সব — অর্থাৎ যা দিয়ে শরীর রক্ষা হয়। তারও উপরে রয়েছে তাঁর মহাবাক্য। ও দিয়ে আমরা তাঁর চিন্তা করতে পারছি। তাতে ত্রিতাপ জ্বালা দূর হয়, spiritual life (ধর্মজীবন) বেঁচে থাকে।

বড় জিতেন — আমরা পরস্পর কথা কচ্ছিলাম।

শ্রীম — হাঁ, কিন্তু এতেও বিপদ আছে। ভগবানের কথা সকলে ধারণা করতে পারে না। তখন উল্টা উৎপত্তি হয় — কুতর্ক এসে যায়। তাতে নিজের অনিষ্ট হয়। উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে কথা কইলে উভয়ের কল্যাণ হয়। তাইতো গীতায় ভগবান সাবধান করেছেন,

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।। (গীতা ১৮/৬৭)

তপস্যাহীন, ঈশ্বরে বিশ্বাস বর্জিত গুরুসেবাহীন অভক্তকে ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলতে মানা করেছেন। এতে কি আর পক্ষপাতিত্ব আছে? বললে ফল হবে না বরং বক্তার অকল্যাণ হবে — হয়তো অশ্রদ্ধা বেড়ে যাবে; তাই মানা করছেন। গীতায় নিবৃত্তির উপদেশ করেছেন কি না, মোক্ষের উপদেশ। অধিকারী কে? না যার সংসার ভোগের প্রবৃত্তিতে অসন্তোষ এসেছে বিরক্তি এসেছে। অতএব শাস্ত্র, গুরুবচন ও ঈশ্বরে বিশ্বাস হতে আরম্ভ হয়েছে, এমনতর লোককে বললে ফলপ্রসূ হবে। এখন এম.এ. ক্লাশের পাঠ্য যদি ফোর্থ ক্লাশের ছেলেকে বলা হয় কোনই ফল হবে না। এইরূপ minimum qualification (সর্বনিম্ন অধিকার) যার লাভ হয়েছে তাকে বললে সুফল হবে। সেটি হ'ল গুরুসেবা, কতক ধ্যানজপের চেষ্টা — এই সব।

আর উপযুক্ত পাত্রকে বললে উভয়েরই কল্যাণ হয়। তাও ভগবান গীতামুখে ব্যক্ত করেছেন ঃ—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।। (গীতা ১০/৯)

ভগবানে যার বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়েছে, তাঁর কথা ছাড়া যার প্রাণ ছট্‌ফট্ করে যেমন জল ছাড়া মাছ মর মর হয় — এরূপ ভক্তদের মধ্যে তাঁর কথা হলে উভয়ের আনন্দ লাভ হয়, উপকার হয়।

ঠাকুর তাই কেশব সেনের জন্য এতো চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন — তাঁর অসুখের সংবাদ শুনে। কেঁদে কেঁদে মাকে বলেছিলেন — মা কেশবের অসুখ হলো, যদি কিছু হয় তাহলে কার সঙ্গে তোমার কথা কইবো কলকাতা গেলে। তাই রোগ মুক্তির জন্য মায়ের কাছে ডাব চিনি মেনেছিলেন। কতখানি ভালবাসা হলে এরূপ উদ্বেগ হয়। কেশব সেন চিনেছিলেন কিনা ঠাকুরকে।

একদিন একজন লোক গেছে ঠাকুরের কাছে। তিনি এদিককার সব কথা বলতে লাগলেন — কি করে সাংসারিক অভ্যুদয় হয়, জাগতিক কর্তব্য এই সব। সেই লোকটি শুনে বললো, এসব তো সব জায়গায়ই শুনি। আপনি দুটো ঈশ্বরীয় কথা কন। ঠাকুর উত্তর করলেন, বাবা এখন আমি এই বলছি। তোমার ভাল না লাগে উঠে যেতে পার। তিনি জানেন কার ভিতর কি আছে! কি বলে, 'কানা গরু থেকে শূন্য গোয়াল ভাল'। ভক্তরা সংবাদ নিয়ে জানলেন ঐ লোকটির চাকরি নাই, ঘরে খাবার নাই,বিবাহের উপযুক্ত মেয়ে ঘরে। এখন যার এই অবস্থা তাকে ঈশ্বরীয় কথা বললে কি কাজ হবে? তাই তাঁকে কর্মের উপদেশ, সংসারের কর্তব্য এসব কথা বললেন।

আর একদিন হয়েছিল একটি ঘটনা। কীর্তন থেকে উঠে গিছলেন — কখনও এরূপ দেখি নাই। যে গান গাইছিল পরে শোনা গেল তার পঞ্চাশটা কি একশটা রাঁড় আছে। বলেছিলেন এর গান ভাল লাগছে না। অপর একটি লোককে দেখিয়ে বললেন, এ গাইলে বেশ হয়। কিন্তু তা হবার যো নাই। যে গাইছিল সে দলপতি। তাকে ছাড়িয়ে কেউ গাইতে সাহস করলে না। তাইতো ঈশ্বরের কথা যার তার কাছে কইতেও নেই আর যেখানে সেখানে শুনতেও নেই।

আর এক ধরনের লোক আছে, এরা খালি বলে 'উপায় কি'? মণি মল্লিক ছিলেন একজন ঐরূপ ভক্ত। প্রাচীন ব্রাহ্মভক্ত — প্রায় বিশ বছর ঠাকুরের কাছে আনাগোনা করেছেন। তবুও যাকে দেখেন তাকেই বলেন, মশায় উপায় কি?

ঠাকুর একদিন অধর সেনের বাড়ি গেছেন ভক্তসঙ্গে। একজন বসে মালা জপ করছে ঠাকুরের সামনে। ঐ ব্যক্তি ঠাকুরকে ভালবাসতো। ঠাকুর তাকে লক্ষ্য করে নিজেই ভক্তদের প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা এরা ত্রিশ বছর ধরে মালা জপ করছে তবুও এদের হয় না কেন? নিজেই আবার উত্তর দিচ্ছেন, বলছেন, কি করে হবে — এদের যে ব্যাকুলতা নাই। হচ্ছে হবে, হচ্ছে হবে করে এরা — আঠার মাসে বছর এদের। আঁট নেই, ভেদভেদে লোক সব। মালাটা আঙ্গুল দিয়ে ঘোরাচ্ছে, মুখ নড়ছে, মন বিদেশে চলে গেছে বিষয়ে, কিম্বা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এই মনকে সানাতে হয়। তপস্যা করলে মন তীক্ষ্ণ হয়। তখন ব্যাকুলতা আসে। তখন বুঝতে পারে ক্ষণস্থায়ী এই দুর্লভ মানব দেহ। তাড়াতাড়ি সেরে নিতে প্রবল ইচ্ছা হয়। এইবার অযথা দেহপাত হলে পুনরায় কখন মানুষদেহ হবে তার নিশ্চয়তা নেই — তাই উঠে পড়ে লাগে। আহার নিদ্রা ছেড়ে চেষ্টা করে সোনা গালান হলে উঠবো এই দৃঢ় সঙ্কল্প। জমিতে জল এনে তবে স্নান আহার করবো, এই প্রতিজ্ঞা।

ঠাকুর বলতেন নিজের ব্যাকুলতার কথা। বলতেন, পঞ্চবটীতে পড়ে থাকতাম দিন রাত্রি হুঁশ নেই। কখনও উপর দিয়ে সাপ চলে যেতো লক্ষ্য নেই।

বড় জিতেন — রামপ্রসাদ বলেছিলেন সং সাজার কথা।

শ্রীম — সং সাজার কথা বললেও নিজের অহংকারের কথা এসে যায়। ঠাকুর কিন্তু খুঁজে পেতে নিজের অহংকারটাকে দেখতে পান নাই — দেখেছিলেন ওখানেও মা বসে আছেন, জগদম্বা। সবই তিনি, মা। সে অবস্থায়ই বলতেন, মা আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, যেমন চালাও তেমনি চলি। এটি শেষ কথা, এটি আদর্শ, এটি প্রাপ্তব্য।

ব্রহ্মজ্ঞানের পর নির্বিকল্প সমাধির পর এ অবস্থা — 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

৩

আজ ৫ই মে শুক্রবার। এখন অপরাহ্ন পাঁচটা। শ্রীম মর্টন স্কুলের দোতলার বারান্দার পূর্বদিকে অফিস ঘরের পাশে বসিয়া আছেন উত্তরাস্য ঠেস-দেওয়া বেঞ্চিতে। শ্রীম-র সঙ্গে হেড মাস্টার মুকুন্দ ও শচীনন্দনও বসা। বিনয় ও জগবন্ধু জলে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগবন্ধু আজ দশটার সময় শ্রীম-র কাপড়-জামা প্রভৃতি লইয়া কাশীপুর ডাক্তারের বাড়িতে গিয়াছিলেন। কাপড় কাচিয়া বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়াছেন।

একটু পর স্বামী সদ্ভাবানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীম সস্নেহে তাঁহাকে নিজের সামনে চেয়ারে পশ্চিমাস্য বসাইলেন। শ্রীম-র সম্মুখের বেঞ্চিতে বসা শান্তি ও তাহার সঙ্গী, বিনয় আর জগবন্ধু।

স্বামী সদ্ভাবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা। দুই বৎসর পূর্বে অতি সামান্য ভাবে ভগ্নগৃহে বিদ্যাপীঠ মিহিজামে আরম্ভ হয়। শ্রীম গিয়া তখন ওখানে ছিলেন সাধুদের আমন্ত্রণে। তারপর অন্য বাড়িতে ভক্তসঙ্গে আট মাস বাস করেন। জামতাড়া আশ্রমেও সাত আট দিন ছিলেন স্বামী রামেশ্বরানন্দের অনুরোধে। ইনিই এই আশ্রম করেন।

স্বামী সদ্ভাবাবনন্দ বিদ্যাপীঠের পরিচালন সম্বন্ধে শ্রীম-র সহিত পরামর্শ করিতেছেন। গোড়া থেকেই তাঁহার পরামর্শ মত কাজ চলিতেছে। শ্রীম বলিতেছেন, ওখানে মনে কর একসঙ্গে অনেক duty (কর্তব্য) সেবকদের। এঁরাই (সাধুরা) father, mother, teacher, friend (পিতা, মাতা, শিক্ষক, বন্ধু) আবার আর একটিও বলা যায় spiritual guide (গুরু)। ওসব কাজে খুব responsible man (দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকের) দরকার। খুব strenuous (পরিশ্রমের) কাজ।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া স্বামী সদ্ভাবানন্দ মিষ্টিমুখ করিয়া

চলিয়া গেলেন। শ্রীম ভক্তসঙ্গে চারতলার সিঁড়ির ঘরে গিয়া বসিলেন। বৃষ্টি হওয়ায় আজ ছাদে বসিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার আলো আসিতেই শ্রীম ধ্যান করিতে বসিলেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীম 'কথামৃত' চতুর্থ ভাগ পঞ্চদশ খণ্ড পাঠ করিতে দিলেন শান্তিকে। উল্টারথ। ঠাকুর বলরাম মন্দিরে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। আজ ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ ৩রা জুলাই। বলরামের পিতা শ্রীবৃন্দাবনবাসী। সেখান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি পরম ভাগবত, সাহিত্যিক ভক্ত রামদয়াল ও ডাক্তার প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি আসিয়াছেন।

ঠাকুর বলরামের পিতাকে বলিতেছেন একঘেয়ে হওয়া ভাল না। বলরামের পিতা বৈষ্ণব; বৃন্দাবনে নিজের কুঞ্জে বাস করিয়া শ্যামসুন্দরের সেবাপূজার তদারক করেন আর সাধন ভজন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে সমন্বয় করেছে সে-ই লোক। এক সচ্চিদানন্দই জগতের আধার। তাঁকেই বেদ পুরাণতন্ত্রে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব। সব মতের লোকই আপনার মতটাকেই বড় করে গেছে। কিন্তু, যে সকল মতের ভিতর একই উপাস্যকে দর্শন করতে পেরেছে সে-ই লোক, সে-ই ধন্য!

ঠাকুর বলিতেছেন নিজের অবস্থা, পরমহংসের নাম করিয়া। পরমহংস আর চার পাঁচ বছরের বালকের বাহ্য অবস্থা এক। বলিলেন পরমহংস বালকের ন্যায়, গতিবিধির হিসাব নাই। আত্মপর ভেদ নাই। ঐহিক সম্বন্ধের আঁট নাই। সব ব্রহ্মময় দেখে। কোথায় যাচ্ছে, কোথায় চলছে হিসাব নাই। বলিতেছেন, কখনও উন্মাদবৎ অবস্থা হতো। তখন শিবলিঙ্গজ্ঞানে নিজের লিঙ্গ পূজা করতাম।

কথামৃত পাঠ চলিতেছে। এইবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই শুনলেন তো ঠাকুর বলছেন তপস্যার দরকার — কেবল বই পড়ে পণ্ডিত হলে হবে না। গৌরী পণ্ডিত আর নারায়ণ শাস্ত্রীর কথায় ঠাকুর বললেন এঁরা উচ্চকোটির সাধকও ছিলেন। গৌরী পণ্ডিতের স্তবপাঠ শুনে অপর পণ্ডিতরা

কেঁচো হয়ে যেত। আর নারায়ণ শাস্ত্রীর 'হর হর' বলতে বলতে ভাব হতো, ঠাকুর বলেছিলেন। নারায়ণ শাস্ত্রী বলতেন, কেশব সেন জপে সিদ্ধ আর ভাগ্যবান লোক। বেলঘরের বাগানে কেশব সেনের সঙ্গে দেখা করার পূর্বে ঠাকুর নারায়ণ শাস্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নারায়ণ শাস্ত্রী দেখে এসে ঐ কথা বলেছিলেন।

বলরামের বাড়িতে আজ পণ্ডিত শশধরকেও ঠাকুর কৃপা করেছেন। ভালবাসতেন বলেই বলরাম নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছিলেন। তাঁকে বলেছিলেন একদিন, বাবা তপস্যা করে আর একটু বল বাড়াও। বিবেক বৈরাগ্য সাধন ভজন না থাকলে শুধু লেকচার কেউ শুনবে না — কাজ হবে না। আজ শশধর প্রশ্ন করছেন, কিরূপ ভক্তিতে ভগবান দর্শন হয়। ঠাকুর উত্তর করিলেন, শুদ্ধাভক্তিতে তিনি লভ্য। জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই — এমনি ভাবা — কি আমি একবার ঈশ্বরের নাম করেছি আমি শুদ্ধ হয়ে গেছি, আমি নিষ্পাপ। ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আঁটুপাটু করে — জলে চুবিয়ে ধরলে যেমন হয় — ঐরূপ ব্যাকুলতা হলে তাঁর দর্শন হয়।

শ্রীম-র নৈশ ভোজন আসিয়াছে। অন্তেবাসী ঘরে গিয়া আসন ঠিক করিতেছেন। পাঠ শেষ হইলে শ্রীম নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, 'সকাল থেকে ভাবছি কোথায় গেল সারাদিন। কাপড় কাচার কথা মনেও ছিল না।' শ্রীম ভোজন শেষ করিয়া আসিয়া পুনরায় বসিলেন ভক্তসভায়। নিজে নিজেই বলিতেছেন, — ঠাকুর কেশব সেনকে কেন এতো ভালবাসতেন? ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। 'দৈবী লোক' ঠাকুর বলতেন। কেশববাবু আনাগোনায় ঠাকুরকে বুঝতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন, 'এই যে লোকটি (ঠাকুর) ইনি আজকাল world এর মধ্যে greatest man.' তাঁরা তো অবতার মানেন না, তাই বললেন greatest man (সর্বশ্রেষ্ঠ মানব) তা হলেই হলো। দেখ যিনি Hero of a hundred platforms' (বাগ্মীতার বীরাগ্রণী), 'observed of all observers' (দর্শকের নয়নমণি) তিনিই এইকথা বলছেন। পরে ক্রমে অবতার বলে

চিনেছিলেন। কিন্তু দলের ভয়ে প্রকাশ্যে বলতে পারেননি।

৪

মর্টন স্কুল। সকাল সোওয়া সাতটা। চারতলার শ্রীম-র কক্ষ। শ্রীম বিছানায় বসিয়া আছেন। জগবন্ধু ও বিনয়কে তিনি পাঠাইয়াছিলেন হিন্দু স্কুল ও হেয়ার স্কুলে কবে গ্রীষ্মের ছুটি হইবে জানিয়া আসিতে। তাঁহারা ফিরিয়াছেন। শ্রীম তাঁহাদের সহিত কিছুক্ষণ মর্টন স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটির বিষয় আলোচনা করিলেন।

এখন শ্রীম গীতা পাঠ করিতেছেন সুর করিয়া — ষোড়শ অধ্যায়। ছোট জিতেন, জগবন্ধু, বিনয় ও গদাধর বেঞ্চিতে বসিয়া আছেন। শ্রীম এইবার অর্থ বলিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দৈবী সম্পদ আর আসুরিক সম্পদের কথা বলিতেছেন। দৈবী সম্পদ মানে ভগবান লাভের অনুকূল স্বভাব। আর আসুরিক ঠিক তার বিপরীত। মানুষের ভিতর তিন ভাবই রয়েছে পশু, মনুষ্য ও দেব। আসুরিকভাব আর পশুভাব একই কথা। মানে extremely selfish (অত্যন্ত স্বার্থপর) ভাব। দৈবভাব এর বিপরীত selfless ভাব। পশু থেকে দেবতা হতে হবে সকলকেই একদিন। তাই ভগবান উভয়ের লক্ষণগুলি বলছেন। এ জানা থাকলে নিজের বা অপরের অবস্থা বুঝা যায়। এগুলি ধর্মজীবনের milestone (দূরত্ব নির্দেশক) সকলেরই মুখস্থ রাখা উচিত। কেউ কেউ কট্ কট্ করে কথা কয় — যেমন মাথার উপর পাথর ভাঙ্গে। এখানে বলছেন এসব ভাল না। একে পারুষ্য বলে। আবার অনেকে সর্বদা বক্ বক্ করে এও ভাল না। চুপ করে বসে থাকা ভাল। সন্ধ্যার সময় অনেকে এসে বাজে কথা সব বলে। জিহ্বার সংযম করা ভাল। শম দম এগুলি দৈবীগুণ। বরানগর মঠে ওঁরা একে false talk (বাজে কথা, গ্রাম্য কথা) বলতেন। কেহ অন্য কথা বললেই অপর সাধুরা বলতেন, ঐ দেখ এরা সব false talk (বৈষয়িক আলোচনা) করছে। ঠাকুর এসব কথা শুনতে পারতেন না। চৈতন্যদেব রঘুনাথ দাসকে বৃন্দাবন

লীলা-উদ্ধারের জন্য সনাতনের সাহায্য করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বলে দিছলেন, 'গ্রাম্য কথা না কহিবে (আর) গ্রাম্য কথা না শুনিবে'। গ্রাম্য কথা মানে বিষয় কথা — সংসারের কথা, ঈশ্বরীয় কথার বিপরীত কথা। তাই অনেকে সংযম অভ্যাসের জন্য মৌনব্রত ধারণ করে। ব্রহ্মচারীদের ইহা অবশ্য কর্তব্য। এখানে কেহ বাজে কথা বললে তা তখুনি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

আর সরল ও সত্যবাদী হওয়া উচিত। অবসর পেলেই ধ্যান করতে হয়। অতি যত্ন সহকারে তা পালন করতে হয়। তবে কাজ হয়। সরলতা, সত্য, মৌনব্রত আর মধুরভাষণ — এসব ব্রহ্মচারীদের পালন করা চাই।

(সহাস্যে একজনকে লক্ষ্য করিয়া) আবার কাজের ফাঁকি দিবার জন্যও অনেকে ধ্যান করে। এই ফাঁকি একদিন না একদিন ধরা পড়বে।

(একজনকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তদের প্রতি) — অমুক প্রদেশের লোকদের কয়টা দোষ আছে। জল ঝড় হচ্ছে একজন আশ্রয় চাইছে, তাকে বারান্দায় দাঁড়াতে দিবে না। ডাক, দরজা খুলে দেখবে না কিজন্য ডাকছে। পথিক চলছে; অন্ধকার রাস্তা। সামনে কূয়ায় পড়ে যাবে হয়তো, তাকে সাবধান করবে না। আবার suppressio veri verai আছে —truth-কে (সত্যকে) গোপন করবে। একজন লোক টেলিগ্রাম পেয়ে দৌড়ে যাচ্ছে বাড়িতে বিদেশ থেকে ছেলের অসুখ। সামনে একটা ব্রিজ (পুল) আছে ওটা মাঝখানে ভেঙ্গে পড়েছে। যে জানে তার উচিত পথিককে বলে সাবধান করা। যদি না বলে তবে দুটি পাপ হবে — একটি জীবহত্যা, দ্বিতীয়টি সত্য গোপন। (একজনের প্রতি) তুমি ক'টা গুণের নাম করতো, ঐ দেশের লোকদের। আবার চুরির অভ্যাস আছে বাজার করতে গেল, দাম বাড়িয়ে বলবে আর পয়সা চুরি করবে। আবার অশুচি — হেগো কাপড়েই হয়তো ঠাকুর সেবা, গুরু সেবা করবে। ঠাকুর তো এসে দেখছেন না।

শ্রীম (বিনয়ের প্রতি) — আজ থেকে তুমি রোজ দু'টি করে

গীতার শ্লোক মুখস্থ করবে। (জগবন্ধুর প্রতি) আপনি তারিখ লিখে রাখুন আজ থেকে। তারপর হিসেব করে একদিন পাঠ নেওয়া যাবে। ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, পরীক্ষা পাশ করা যায় আর গীতার শ্লোক মুখস্থ করা যায় না? (গদাধরের প্রতি) তুমিও করবে রোজ দুটি শ্লোক মুখস্থ। (জগবন্ধুর প্রতি) এর কথাও লিখে রাখুন। রোজ দুটি করে মুখস্থ করা চাই-ই।

ভৃত্য রামলালের নাতি — বছর দশেকের ছেলে শ্রীম-র হাতে দৈনিক 'forward' সংবাদপত্র দিল। শ্রীম সহাস্যে বলিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ' (Thank you) বালক হাসতে হাসতে চলে গেল। শ্রীম গদাধরকে বলিলেন, 'দেখ মিষ্টি কথায় কি হয়।'

অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম নিজের ঘরে বিছানায় বসিয়া আছেন। গদাধর আশ্রমের মহন্ত স্বামী কমলেশ্বরানন্দ আসিয়াছেন। একটু পর ব্রহ্মচারী সূর্য (নীলবড়ি) আর স্টুডেন্টস্ হোমের একজন বিদ্যার্থী আসিলেন। গদাধর আশ্রমে কাজের লোকের অভাব। শ্রীম-র সহিত আশ্রম পরিচালনার পরামর্শ করিতেছেন। জগবন্ধু ও গদাধর রহিয়াছেন। স্বামী কমলেশ্বরানন্দকে মিষ্টিমুখ করাইতে শ্রীম জগবন্ধুকে বলিলেন। মিষ্টিমুখ করিয়া মাসিক আশ্রম সেবার অর্থ লইয়া স্বামী কমলেশ্বরানন্দ চলিয়া গেলেন। ফরিদপুরের রমেশকে জগবন্ধু শ্রীম-র আদেশে একটি পত্রের উত্তর লিখিলেন এবং পড়িয়া শুনাইলেন। শ্রীম বলিলেন, 'ওদের (চাকরদের) হাতে দিলে বলে দিবেন বাক্সে ফেলে এসে খবর দেয়।' জগবন্ধু বলিলেন, 'আজ তো যাবে না চিঠি।' শ্রীম বলিলেন, 'তা হোক, রাস্তার বাক্সে দিয়ে এলেও হয়।' ভক্তগণ সকলে বিদায় লইলেন। এখন সাড়ে ছয়টা।

শ্রীম আর অন্তেবাসী বসিয়া আছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — আমার এতদিন ধারণা ছিল আমি লোক চিনি। কিন্তু আজ সে ধারণা উল্টে গেছে। গদাধর আশ্রমে সেবকের অভাব — ঠাকুরের পূজা প্রায় অচল। একজনকে দেবার জন্য ললিত মহারাজ বলেছিলেন। আমি অমুককে বললুম সে গেল

না। বলে কি অসুখ — কি কি! সাধুর আশ্রমে খেতে পাবে ভাল, থাকতে পারবে। একটু সেবা করবে — তাও ঠাকুরের সেবা। ওখানকার যে কাজই করুক সবই ঠাকুরের সেবা। ঠাকুরের সেবা করলুম না, আর অমনি চোখ বুজে রইলুম — এতে কি হবে? কি করে থাকে চোখ বুজে তাই ভাবি!

(সহাস্যে) একবার আলমবাজারের নিকট এক জেলেনী — মাথায় মাছের ঝুড়ি — বলছে, 'জোর করে পিরিত?' নূতন বাজার হয়েছে। এখন জেলেনী সেখানে না গিয়ে পুরানো বাজারে যেতে চায়। জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায় দারোয়ান নতুন বাজারে। তাই জেলেনী রেগে বলছে এই কথা — জোর করে পিরিত (হাস্য)!

ঠাকুরের সেবা না করে চোখ বুজলে কি হবে? আমার এত দিনের ধারণা উল্‌টে গেল — ধিক্কার আসছে নিজের উপর। সূর্যও গেল না।

সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীম চারতলার ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন — চেয়ারে দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ — বড় জিতেন, ছোট জিতেন, ডাক্তার, বলাই, ছোট রমেশ, গদাধর, মনি, জগবন্ধু প্রভৃতিও শ্রীম-র সম্মুখে বেঞ্চিতে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন।

স্বামী সদ্ভাবানন্দ ও সুরেন গাঙ্গুলী ইতিমধ্যে আসিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সুরেন গাঙ্গুলী যখনই আসেন এক প্যাকেট ধূপ লইয়া আসেন ঠাকুরের সেবার জন্য। ঐ ধূপ একজনের হাতে দিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

একঘন্টা ধ্যানের পর শ্রীম উঠিয়া গিয়া ছাদের উত্তরের দিকে একা পায়চারী করিতেছেন, — তালু ডান হাতে এক একবার চাপিতেছেন। গভীর ধ্যানের পর প্রায়ই এইরূপ করেন। খানিক পর আসিয়া নিজের আসনে বসিলেন এবং ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বড় জিতেনকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর

নিরঞ্জনকে বলেছিলেন, তুই মার জন্য চাকরী করছিস্। যদি মাগ-ছেলের জন্য করতিস্ তাহলে বলতুম ধিক্!! মাগ-ছেলের জন্য চাকরী করলে বদ্ধ হয়। ঠাকুরের সেবা করলে, ঈশ্বর বুদ্ধিতে সেবা করলে, মুক্তি লাভ হয় — সাধুদের সেবা করলেও মুক্তি হয়।

সন্ধ্যার পূর্বে অন্তেবাসীকে যা বলেছিলেন সেই কথা পুনরায় বলিলেন। ‘আমার নিজের উপর ঘৃণা আসছে আমি লোক চিনি বলে ধারণা ছিল। আজ তা উল্টে গেল। ইত্যাদি!

সাধুর সেবা ঈশ্বরের সেবা না করলে কখনও ভক্তি হবে না। চোখ বুজলেই যদি ভক্তি হতো তাহলে আর রক্ষে ছিল না। সংস্কার চাই। ও না থাকলে সেবায় মন যায় না।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন — পুনরায় বলিতেছেন। সংস্কার বড় প্রবল। আজ একটা স্বপ্ন দেখলুম। তখন কলেজে পড়াশোনা করছি। সাটলিপ সাহেব পড়াচ্ছেন সেই কথা মনে পড়লো। দেখ, সংস্কার কিরূপ! ওকি যেতে চায়? ঠাকুরের কথায় এসব চাপা ছিল এতদিন। আজকাল দেখছি পূর্বের কথা একটু একটু স্মরণ হচ্ছে।

তাই পূর্বের করা থাকলে ঠাকুর সেবায় মন যায়।

কলিকাতা, ৮ই মে, ১৯২৪ খৃঃ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩১ সন।
বৃহস্পতিবার, শুক্লা চতুর্থী ১৫।১৪ পল।

সপ্তদশ অধ্যায়

মধুকর শ্রীম — গীর্জা গুরুদ্বারা আশ্রম

সৎপ্রসঙ্গ সভা। মর্টন স্কুলের নিচের তলার পূর্বধারের হল ঘরে। ছাত্র ও শিক্ষকগণ একত্রিত হইয়াছেন। পশ্চিমের উঠানেও বেঞ্চ পাতা হইয়াছে। সেখানেও অনেকে বসিয়াছেন।

এখন সকাল সাড়ে সাতটা। আজ ৪ঠা জানুয়ারী ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ। ২০শে পৌষ, ১৩৩০ সাল। শুক্লা দশমী ৪১।২।

শ্রীম আসিয়া ঘরে বসিলেন উত্তরের দরজার ডানদিকে পূর্বাস্য, চেয়ারে। গদাধর, বুদ্ধিরাম, ছোট নলিনী, বিনয় এঁরাও আসিয়া বাহিরে বেঞ্চিতে বসিলেন। খানিক পর বড় জিতেন আসিলেন। জগবন্ধুও ঘরে বসিলেন। উনি শিক্ষক; শ্রীম রেকটার।

আজের আলোচ্য বিষয় ক্রাইস্ট। প্রথমে জগত্তারণ গীতা পড়িলেন। তারপর বামনদাস মুখার্জী পড়িলেন ভাগবত। এইবার বক্তৃতা হইবে। শ্রীম কিছুকাল হইতেই একটি ভক্ত শিক্ষককে সৎপ্রসঙ্গ সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। ভক্তটি বক্তৃতা দিতে সঙ্কোচ করেন। বলেন, নিজে পালন করতে পারিনা অপরকে বলা। শ্রীম তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন, সেবাভাবে বললে দোষ নাই তাতে নিজেকেও include (অন্তর্ভুক্ত) করা হয়। গুরুভাবে বলতে পারেন কেবল তাঁরা যাঁরা প্রত্যাদিষ্ট। আজ এই ভক্ত শিক্ষককে দিয়ে বক্তৃতা দেওয়াবেন শ্রীম-র এই সঙ্কল্প। তাঁর কাছে থাকেন এই শিক্ষক। শ্রীম শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হন না। বুকে হাঁটু গেঁড়ে ঔষধ খাওয়ান — উত্তম বৈদ্যের মত।

শ্রীম সভাপতিকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'ইনি (ঐ ভক্ত শিক্ষক) তো ক্রাইস্টের কথা অনেক জানেন। উনি বলুন না।' ভক্ত অগত্যা

বাধ্য হইয়া ক্রাইস্টের জন্ম বৃত্তান্ত বলিতেছেন সেণ্ট লুকের গস্‌পেল থেকে।

শিক্ষক — ভগবানের বিচিত্র লীলা। তিনি জন্ম নিলেন এক দরিদ্র সূত্রধরের গৃহে কুমারীর গর্ভে। বালিকা মেরী লজ্জায় ম্রিয়মাণা। তখন এক দেবদূত আসিয়া রাত্রিতে তাঁকে স্তব করে বললেন, ধন্য তুমি, স্ত্রী। তোমার গর্ভে ভগবান আসিয়াছেন। মাভৈঃ। সকল জগৎ তোমাকে ও তাঁকে পূজা করবে। ভগবান অপর অংশে মেরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গর্ভে ইহার ছয় মাস পূর্বে প্রবেশ করলেন। এলিজাবেথ ও পুরোহিত জাকেরিয়ার পুত্ররূপে সেন্ট জন দি ব্যাপটিস্ট নামে। এ যেন কৃষ্ণ বলরামের নূতন জন্মলীলা এসিয়া মাইনরে।

যিনি জগতের এক তৃতীয়াংশ লোকের শান্তি ও সুখরূপ, তাঁর জন্ম হ'ল একটা অশ্বশালায়। আর তাঁকে রাখা হলো স্থানাভাবে একটা গামলার ভিতর। এ রহস্য মানুষ বুঝবে কি করে?

জন্ম হওয়া মাত্রই দেবদূতগণ দিব্য জ্যোতির্ময় শরীরে ঐ অশ্বশালায় আসিয়া তাঁহার স্তব স্তুতি করিলেন। যাবার সময় বলিয়া গেলেন, সরল ও সত্যবাদী মেষপালকগণকে, গভীর নিশীথে মাঠে — ভগবান ঐখানে অশ্বশালায় জন্ম নিয়েছেন। যাও, দর্শন করে ধন্য হও সকলে।

পিতামাতা দৈবলীলা দেখিয়া অবাক্। অষ্টম দিনে, ইহুদীদের রীতি অনুসারে শিশুকে জেহোবার মন্দিরে লইয়া গেলেন শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে। তখন মহাত্মা সিমিয়ন আসিয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া ভাব সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে, বলিলেন, এবার আমায় শান্তিতে যেতে দাও। তুমি আসছো এই প্রত্যাদেশেই এতদিন অপেক্ষা করলাম। এখন এই বৃদ্ধ শরীর ত্যাগ করব।

অপর একটি ভক্ত মহিলা আসিয়াও অনুরূপ স্তব করিতে লাগিলেন ইনি অ্যানি। আশীর উপর বয়স। এক প্রকার বাল্যকালে বিধবা হওয়ার পর থেকেই মন্দিরে বাস করিয়া শ্রীভগবানের ধ্যান, চিন্তা ও মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত। তিনিও শিশুকে চিনিলেন। তাঁরও প্রত্যাদেশ

লাভ হইয়াছে।

নিরক্ষর দরিদ্র পিতামাতা এসব ব্যাপারে বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত। কোন্ বাপ-মা নিজের শিশু সন্তানকে অপরের দ্বারা এভাবে পূজিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হয়? তাঁরা হয়তো ভাবিলেন, কোনও অপদেবতার ভর তো হয় নাই! আবার দেবদূতগণের অভয়বাণী ও স্তব, ও সূত্রধর দম্পতির উপর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন দেখিয়াও বিস্মিত। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে পিতামাতার দিন যাইতে লাগিল।

শিশু ক্রাইস্ট এখন বার বছরের কিশোর। আমরা তাঁকে এখন দেখিতেছি কোথায়? আভের মন্দিরে, ইহুদীগণের শ্রেষ্ঠ তীর্থ জেরুজালেমে। শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রার্থ করিতেছেন। একদিকে অজ্ঞাত কিশোর অপরদিকে ইহুদী জাতির ধর্ম বিষয়ে গণমান্য বিশেষজ্ঞগণ। বালকের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় বিমোহিত হইয়া পণ্ডিতগণ সমস্বরে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে বলিতে লাগিলেন, কে এই দেবশিশু? কে বলিবে ইনি সূত্রধর জোসেফ আর মেরীর ছেলে। এই বালকের শাস্ত্রব্যাখ্যা কি হৃদয়গ্রাহী; কি সুগভীর! কি তাঁর মোহিনী শক্তি! মনকে যেন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লইয়া যায়। মন যেন ঈশ্বরের পাদপদ্মে বিলীন হইয়া যায়। এমন তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা। কে এই অদ্ভুত বালক! তাঁর কথার এই তেজ কোথা হইতে আসিল! ইনি কি স্বয়ংসিদ্ধ! ঈশ্বর প্রেরিত, কিংবা ঈশ্বর!

পিতামাতার সঙ্গে বাৎসরিক উৎসবে জেহোবা ভগবানকে দর্শনের জন্য যীশু মন্দিরে গিয়াছিলেন। তখন বয়স তাঁর বার বৎসর। এইস্থানে এই দেবলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পিতামাতা ও প্রবীণ ধর্মাচার্যগণ-সঙ্গে বিচাররত আপন পুত্রকে দেখিয়া আরো বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন।

তারপর আঠার বৎসর তাঁর আর কোনও খবর নাই। হয়তো পিতার কার্যে সহায়তা করিতেন। একমত আছে, ঐ সময়ে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন।

ত্রিশ বৎসর বয়সে বাহির হইলেন বিদ্রোহী হইয়া। এ বিদ্রোহীর ধৃষ্টতা নাই, ঔদ্ধত্য নাই, বাগাড়ম্বর নাই, দল বাঁধার প্রয়াস নাই। তিনি

শান্ত, সরল, সত্যবাদী, সহানুভূতিশীল; তিনি দুঃখী দরিদ্রের চির সুহৃদ। অন্ধ আতুর অনাথ নিরাশ্রয়ের মাতৃবৎ স্নেহময় সেবক। তিনি নির্বিবাদী, স্বার্থগন্ধহীন, ঈশ্বরপরায়ণ। কিন্তু অন্যায়ের শান্ত প্রতিবাদে সুমেরুবৎ অচঞ্চল, ব্রজসম কঠোর। সহনশীলতায় ধরিত্রীর মত স্থির ও ধীর।

তিনি অতি সুদৃঢ় শান্ত ভাষায় ইহুদীদের দুর্নীতির প্রতিবাদ করিলেন। ধর্মের নাম করিয়া, ঈশ্বরের নাম করিয়া, ধর্মরক্ষকগণ সরলমতি জনসাধারণকে প্রতারণা করিতেছে। ধর্মধ্বজী পুরোহিতগণ সত্য, পবিত্রতা, সংযম, পরোপকার, ঈশ্বরপ্রীতিকে জলাঞ্জলি দিয়াছে। বজ্রস্বরে বলিলেন, 'প্রতারকগণ সাবধান হও। পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়ে আর কতদিন সমাজের অকল্যাণ করবে। একটু ভেবে দেখ, করছো কি, করা উচিত কি! একজন আছেন; তিনি সব জানেন। তাঁকে ফাঁকি দিতে পারবে না। অনন্ত নরক যাতনা ভোগ করতে হবে তোমাদের এই দুষ্কার্যের জন্য। ক্ষান্ত হও। তাঁর শরণ লও, তিনি ক্ষমা করবেন।'

পুরোহিতগণ হইল তাঁর শত্রু।

তাঁর অনুরক্তগণকে বলিলেন, তোমরা নিশ্চয় করে জান, তোমরা ভগবানের অংশ। তোমরা তাঁর সন্তান। তোমরা শুধু মানুষ নও, তোমরা দেবতা। যদি ভোগবাসনায় ডুবে গিয়ে পশুর পংক্তিভুক্ত হয়ে থাক তবে অনুশোচনা কর, কাঁদ। কেঁদে বল, হে পিতঃ, আমাদিগকে ক্ষমা কর। সরল অন্তরে এই কথা বললে তিনি নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। তাঁর শরণ লও, সত্য আশ্রয় কর। কাঁদ, কাঁদ, কেঁদে বল তাঁকে। তিনি সন্তান বলে অবশ্য গ্রহণ করবেন।

আর আমায় ধর। তবে শোকতাপ দুঃখদারিদ্র্য জরামৃত্যুময় এই সংসারে আনন্দে থাকবে। কেন না আমি যে এ সবই জয় করেছি পরম পিতার প্রসাদে। আমি তাঁর পুত্র, তিনি আমার পিতা। পিতাপুত্র এক।

আমার বিধান অতি সহজ। মনেপ্রাণে পরম পিতাকে আপনার পিতা বলে ভালবাসতে চেষ্টা কর। আর সর্বভূতে এই প্রেমময় পিতা, এই জেনে তাদের সেবা কর, তাদের ভালবাস। যেমন নিজেকে নিজে ভালবাস, যেমন নিজের সেবা, নিজের কল্যাণের জন্য চেষ্টা

কর তেমনি অপরের জন্য কর। কারণ তাঁরাও যে পরম পিতার রূপ, তারা যে তাঁর মন্দির।

সেই যীশু এবারে শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীম-র কৃপায় আজ ভক্তের মুখে যেন ভগবান কথা বলিতেছেন। সকলে নির্বাক আনন্দে সব শুনিলেন। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া ভাবাবিষ্ট, চক্ষু অর্ধনিমিলিত স্পন্দনহীন। উপসংহার সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সভা ভঙ্গ হইল নয়টায়।

ভগবান যীশুর জন্মোৎসবের আনন্দরেশ এখনও চলিতেছে। খৃষ্ট ভক্তগণ প্রতি গীর্জায় তাঁহার অমর বাণীর আলোচনা করিতেছেন। দুঃখশোক সেই প্রভাবে কিছুকালের জন্য তিরোহিত।

পাশেই সেণ্ট পল ক্যাথিড্রাল আমহার্স্ট স্ট্রীটে। মর্টন স্কুলের অদূরে। শ্রীম-র ভিতর বুঝি আজের সৎপ্রসঙ্গ সভার যীশুলীলামৃতের উল্লাসানন্দ জীবন্ত। ক্ষিপ্র বেগে শ্রীম গীর্জায় প্রবেশ করিলেন। এখন ৯টা বেজে দশ মিনিট। রাস্তা থেকে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম দিক থেকে বাঁ দিকের ষষ্ঠ সারিতে বামপ্রান্তে বসিলেন। বড় জিতেন, জগবন্ধু, গদাধর, বুদ্ধিরাম প্রভৃতি শ্রীম-র পাশে বসিয়াছেন।

সবে মাত্র Mass 'ম্যাস' বা সমবেত প্রার্থনা শেষ হইয়াছে। পুরোহিতের হাত থেকে প্রসাদ ও চরণামৃত লইতেছেন, স্ত্রীপুরুষ ভক্তগণ নতজানু হইয়া। এখানেও যেন ধর্ম আজ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কি শ্রদ্ধায় কত প্রেমেই না বিশ্বাসী ভক্তগণ শ্রীভগবানের চরণামৃত ধারণ করিতেছেন। কই দেহ সুখে, বিষয় সুখে তো সকলে ভুলিয়া থাকিতে পারিতেছে না সর্বদা? মাঝে মাঝে অন্তর হইতে ডাক আসিতেছে, 'মন চল নিজ নিকেতনে।' তাই ছুটিয়া আসিয়াছেন ভক্তগণ তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে। সংসার ও তাঁহার সহিত সংযোগ। ভক্তগণ এই উভয় কেন্দ্রে বিচরণ করেন।

প্রশান্ত গম্ভীর ভাবময় শ্রীম, প্রেমভক্তির এই প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শন করিতেছেন উন্নত বিস্ফারিত নয়নে। দেখিতেছেন যেন ধর্ম মূর্তিমান হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। শ্রীম-র নির্বাক আচরণ যেন নীরবে

'কথামৃত' বর্ষণ করিতেছে।

মধ্যাহ্ন সাড়ে বারটা। শ্রীম রাজা রামসিং-এর গুরুদ্বারে বসিয়া আছেন। প্রথম পশ্চিমের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। পরনে সাদাপাড় ধুতি, গায়ে ওয়ারফ্লানেলের পাঞ্জাবী, মাথায় পশমী সাদা চাদর। একজন বৃদ্ধ নির্মলা সন্ত আসিয়া শ্রীমকে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলিয়া অভিবাদন করিলেন, এবং আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

ভক্তগণ ইতিপূর্বেই এগারটার সময় আসিয়া বসিয়া আছেন। জগবন্ধু, ছোট নলিনী, বিজয় প্রভৃতি। পরে গদাধর ও বুদ্ধিরাম আসিলেন। ডাক্তার বক্সীও ঝাঁকি দর্শন করিয়া স্বকর্মে গিয়াছেন।

রামচন্দ্র সিং এন্ড ব্রাদারস্ এর মালিক রাজা রামসিং সঙ্গতিপন্ন ও ভক্তিমান লোক। তাঁহার প্রাসাদোপম গৃহ হ্যারিসন রোডে অবস্থিত। এঁরা ভগবান শ্রীগুরু নানকের ভক্ত। অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তির সহিত অনেক অর্থ ব্যয়ে এই উৎসব করিয়া থাকেন। গুরুগোবিন্দ সিং-এর জন্মোৎসব। শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংই শেষ গুরু। ইনি শিখগণকে ভক্তি বিশ্বাসের ভিত্তিতে এক মহা শক্তিশালী সম্প্রদায়ে সংগঠিত করিয়াছেন। শ্রীগুরু গোবিন্দ সিং-এর জীবনী সত্যিকার নাটকের মত। কি মহাশক্তিশালী পুরুষ, কি ত্যাগ! সিংহের শিশু সিংহ হয়। তাঁহার কিশোর পুত্র ফতে সিং পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক, তার নয় বৎসর বয়স্ক ভাইয়ের সহিত শহীদ হইয়াছিল। মুসলমান গভর্নরের প্রলোভন পদদলিত করিয়া বালকদ্বয় নিজ ধর্ম রক্ষা করিল। কিন্তু তার পরিণাম, তাদের শিরচ্ছেদ হইল জল্লাদের কৃপাণে। বালকদ্বয়কে দেয়ালে গ্রথিত করিয়া শিরচ্ছেদ করা হইল। হাসি মুখে ধর্মের জয়গান করিতে করিতে দুই ভাই শৈশবে দেহত্যাগ করিলেন, তবু ধর্ম ছাড়িলেন না। তাঁদের বিজয়মন্দির আজ ফতেপুর সাহেব গুরুদ্বারা নামে সুপরিচিত।

গুরু অর্জুনদেবই এই নরসিংহ পরিবারের আদি গুরু। তাঁহার পৌত্র মহাযোগী গুরু ত্যাগ বাহাদুরের মস্তক বাদশাহের আদেশে করাত দিয়া দ্বিখণ্ডিত হয় দিল্লীর চাঁদনীতে। আজ সেখানে শিষমহলে গুরুদ্বারা। জাহাঙ্গীরের আদেশে কাশ্মীরের হিন্দুগণকে নির্মম ভাবে

মুসলমান করা হয়। সেই স্রোত বন্ধ করিবার জন্য কাশ্মিরী পণ্ডিতগণ শরণাপন্ন হন গুরু ত্যাগ বাহাদুরের। শতদ্রুর তীরবর্তী হিমালয়ের পাদদেশোস্থিত আনন্দপুর সাহেবে শিখগণ কেল্লা রচনা করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন।

দরবার বসিয়াছে। কাশ্মিরী হিন্দুগণ গুরু ত্যাগ বাহাদুরের শরণাপন্ন। গুরু কহিলেন, অন্য উপায় দেখছি না এই বলপূর্বক ধর্মান্তর রোধ করবার। যদি কোন মহাপুরুষ স্বীয় জীবনদান করেন তবেই এই উৎপীড়ন বন্ধ হতে পারে।

ক্রীড়ারত গোবিন্দের বয়স তখন দশ বৎসর; পিতার এই বাণী শুনিয়া দৃপ্ত সিংহশিশুর মত তেজীয়ান হইয়া উঠিলেন। করজোড়ে সবিনয়ে আপন পিতাকে কহিলেন, 'পিতঃ, আপনার চাইতে বড় মহাপুরুষ কে আর আছেন এখন এখানে!' পিতার চমক ভাঙ্গিল, নিজের মহাযোগ শক্তির স্মৃতি সম্পূর্ণ জাগরূক হইল। তিনি তাই সস্নেহ বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন, হাঁ বেটা ঠিক কহিয়াছ। শ্রী অর্জুনদেবের পরিবার সত্যই নরসিংহ পরিবার।

এখন এই বীর যোগী ত্যাগ বাহাদুরের বাণী পাঠ হইতেছে। নবম মহলা। গ্রন্থী পাঠ করিতেছেন। আর মাঝে মাঝে যন্ত্র সহযোগে কীর্তন হইতেছে। পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম আর একটি ছোট অরগান বাজিতেছে। কয়েকজন শিখ সাধু বসিয়া আছেন। গৃহ পরিপূর্ণ ভক্তগণে। একজন রামায়ত সাধুও বসিয়া আছেন। তাঁহার গলদেশ ও হাত বহু মালায় বিভূষিত। একজন শ্রদ্ধালু গ্রন্থ সাহেবের উপর চামর দোলাইতেছে।

গ্রন্থী পড়িতেছেন জ্ঞানীর লক্ষণ।

গুরু ত্যাগবাহাদুর কহিতেছেন ঃ —

গুণ গোবিন্দ গায়ো নহী জন্ম অকারথ কীন।
কহু নানক হরি ভজ মনা জিহি বিধি জল কৌ মীন॥
ধনু দারা সম্পতি সগল জিনি অপনী করি মানি।
ইন মে কছু সংগী নহী নানক সাচী জানি॥...

সুখু দুখু জিহ পরসৈ নহী লোভ মোহ অভিমানু।
কহু নানক সুন রে মনা সো মূরত ভগবান॥
উস্তুতি নিন্দিয়া নাহি জিহি কাঞ্চন লোহ সমানি।
কহু নানক সুনি রে মনা মুকতি তাহি তৈ জানি॥
হরখ সোগ জাকৈ নহী বৈরী মীত সমান।
কহু নানক সুনি রে মনা মুকতি তাহি তৈ জান॥
ভৈ কাহু কউ দেত নহি মৈ মানত আনি।
কহু নানক সুনি রে মনা গিআনী তাহি বখানি॥
জিহি বিখিআ সগলী তজী লীয়ো ভেখ বৈরাগ।
কহু নানক সুন রে মনা তিহ নর মাধৈ ভাগ॥
জিহি মায়া মমতা তজী সম তে ভই আে উদাস।
কহু নানক সুন রে মনা জিহ ঘটি ব্রহ্ম নিবাসু॥...
নামু রহিও সাধু রহিও রহিয়ো গুর গোবিন্দ।
কহু নানক ইহ জগত মে কিন জপিয়ো গুর মংতু॥

শ্রীম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুনিতে শুনিতে একবারে স্থির।

আরতি অবসান হইল দেড়টায়। কাশী মল্লিকের টোলের কাছে আসিয়া শ্রীম ট্রামে উঠিয়া বসিলেন।

অপরাহ্ন সাড়ে চারটা। শ্রীম মোটর কারে গৌরীমা'র আশ্রমে রওনা হইলেন। সঙ্গে জগবন্ধু ও রমণী। আজ নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা — সারদেশ্বরী আশ্রম। ছোট নলিনী রহিলেন স্কুল বাড়ির প্রহরী।

শ্রীম চেয়ারে বসিয়াছেন সামিয়ানার নিচে। পূর্বদিকের মাঠে সামিয়ানা টাঙ্গান হইয়াছে। সেখানেই আসর। পুত্রপুষ্পে সব সজ্জিত। পূজনীয়া গৌরীমা এই সারদেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী। শ্রীমকে সাদরে আহ্বান করিয়া বসাইলেন। বহুলোক — সুখেন্দু, বড় অমূল্য, ডাক্তার, বিনয়, বীরেন প্রভৃতিও আসিয়াছেন। বেলুড়মঠের সাধুরাও কেহ কেহ আছেন।

'নিমাই সন্ন্যাস' কীর্তন হইতেছে। শিবপুরের দল। গায়কগণ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছেন — গায়ে আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ী, গলায়

মালা, কাঁধে নামাবলী। বেশ জমিয়াছে কীর্তন।

শ্রীম-র আদেশে অন্তেবাসী একটি টাকা প্রণামী দিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। অবেলায় শ্রীম প্রসাদ পাইলেন না। সকলের হইয়া বড় অমূল্য ও জগবন্ধু প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

ফিরতে রাত্রি সোওয়া নয়টা হইল।

শ্রীম মর্টন স্কুলের অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। অমনি একটি সাধুবেশী যুবক, ২২।২৩ বছর বয়স, গায়ে গেরুয়া কাপড়, গলায় মালা — আসিয়া শ্রীমকে অভিবাদন করিলেন। শ্রীম চলিতে চলিতে ফটকের পাশে ফুটপাথে দাঁড়াইয়াছেন।

'গুরু তোমার পায়ে রেখো মোরে' — শ্রীম-র আদেশে সাধু একটি গান গাহিতেছেন। 'গুরু তোমার পায়ে রেখো মোরে।' ইত্যাদি।

সাধুটি আকুতি মিনতি করিতেছেন। ভাবের আতিশয্যে ফুটপাথে শ্রীম-র পায়ের কাছে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, রেকটার মশায়, আমি আপনার ছাত্র। তখন চিনতে পারি নাই পড়ার সময়। ভগবানের কৃপায় এখন চিনেছি। আমায় কৃপা করতেই হবে। নইলে আমার আর উপায় নাই।' শ্রীম মিষ্ট বচনে আশ্বস্ত করিলেন। সাধু প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

গৌরীমা'র আশ্রমে যাইবার সময় শ্রীম গাড়ীতে একটি ভক্ত শিক্ষকের সঙ্গে স্কুলের বিষয় আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীম (শিক্ষকের প্রতি) — প্রভাসবাবুর ঠিক নেই কবে ফিরবে। এবারে এলেও, বলছে join (যোগদান) করবে না। তাই শ্যামলধন বাবুকে ডেকে পাঠালাম। তিনি তো অবসর নিয়েছেন। কিন্তু আবার অনুরোধ করতে হ'ল কিছুদিন কাজ করতে। প্রভাসবাবু সুপারিন্টেন্ডেন্ট। আবার হেড্‌মাস্টারেরও অনেক কাজ করেন। শ্যামলধন বাবুকে বললাম। 'যেমন কচ্ছিলেন, তেমনি করুন।' যাকে আমরা সিনিয়ার করেছিলাম, এখন দেখছি তিনি তার উপযুক্ত নন্‌ — খুব irresponsible (দায়িত্বজ্ঞানহীন)। অনেকদিন কাজ করতে করতে authority-কে (কর্তৃপক্ষকে) মানার অভ্যাস হয়। (সহাস্যে) স্বরাজের দিন কিনা।

এখন নন্‌কোঅপারেশন আবার চলছে। মানতে চায় না লোক কাউকে। তাই পুরাণো লোকের দরকার।

কথায় বলে, An obedient wife commands the husband (সতীর কথায় পতি চলে)।

ভক্ত টিচার পাওয়া যায় তো বেশ হয়।

শিক্ষক (ইঙ্গিতে রমণীকে দেখাইয়া) ইনি! (রমণী এম. এ পাশ)।

শ্রীম — ট্রেনিং চাই। এ দুটো বিষয়ে লক্ষ্য রাখে এমন লোক চাই — formation of character and passing of university examination (চরিত্র সংগঠন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ)।

কত লোক কত বড় কাজ করছে। কি কর্তব্য বুদ্ধি তাদের। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে হয়তো জীবনই গেল। তারা খুব স্থির ধীর। ঈশ্বর ভক্ত তারও উপর। ঐ গুণগুলির সঙ্গে ভক্তি, ঠিক ভক্তি থাকে তবে তারাই হয় জগতের আদর্শ। তারা খুব বড় বড় কাজ করতে পারে। আর তাদেরই সুনাম চিরকাল থাকে।

দুদিকে দৃষ্টি কিনা এদের — ঈশ্বর ও জগৎ। তারা জানে ঈশ্বর আগে পরে জগৎ। অন্য বড়লোক শুধু জানে জগৎই সব। খুব হদ্দ হয়তো নাম যশ তাদের আদর্শ।

ঈশ্বর ভক্তের আদর্শ ঈশ্বর। তারাই 'salt of the earth', (জগতের শ্রেষ্ঠ মানব) ক্রাইস্টের কথায়।

দেখুন না ভারতের প্রাচীন ইতিহাস। যাদের নাম ইতিহাস বয়ে এনেছে তাঁরা সকলেই ঈশ্বর ভক্ত। আবার সংসারের কাজে অতি দক্ষ।

ঈশ্বর ভক্তরাই ঠিক ঠিক বড় কাজ করে।

মর্টন স্কুল কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯২৫ খৃস্টাব্দ।
২০শে পৌষ, ১৩৩১ সাল, রবিবার।

অষ্টাদশ অধ্যায়

কর্ম উদ্দেশ্য নয় — উপায়

মর্টন ইনস্টিটিউসান। চারতলার ছাদ। এখন অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম ছাদে আসিয়াছেন আপন কক্ষ হইতে। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেছে। তাই গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী, পরণে লালপেড়ে ধুতি। চেয়ারে উত্তরাস্য বসিয়াছেন। সম্মুখে ও দুপাশে বেঞ্চিতে সুখেন্দু, শুকলাল, রজনী প্রভৃতি ভক্তগণ বসা। ভবানীপুরের সূর্য আইচ্ আসিয়াছেন। তিনিও বসিলেন।

আজ ২০শে অক্টোবর, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ রবিবার, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। গতকাল লক্ষ্মীপূজা গিয়াছে।

অন্তেবাসী এখন মঠে থাকেন। কর্মোপলক্ষে কয়েক বৎসর মাদ্রাজ মঠে ছিলেন। এখন ফিরিয়া মঠেই আছেন। আজ মহাপুরুষ মহারাজের ঔষধ নিতে কলিকাতা আসিয়াছেন। ৩টা ৩৬ মিঃ-এ কুমারটুলী নামিয়া, অমর মুখার্জীর নিকট হইতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লইয়া, শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত মহাপুরুষ মহারাজের স্বাস্থ্যের কথা হইতেছে।

অন্তেবাসী — কাল রাত্রে সামান্য দুধ খেয়েছিলেন। আজ দুপুরে ঝোল ও সাগু। একটু জ্বর হচ্ছে।

শ্রীম — ঐটেই তো ভয় হয়।

অন্তেবাসী — আপনার শরীর কেমন চলছে?

শ্রীম — ভাল। তবে বুড়ো শরীর, weakness (দুর্বলতা) যাচ্ছে না। সবই হচ্ছে।

এবেলা ওবেলা একসের পাঁচপো দুধ খাওয়া হচ্ছে। ভাত দুটি। তবুও দুর্বলতা যাচ্ছে না।

সূর্য আইচ্ — কে বড়? আপনি না মহাপুরুষ?

শ্রীম — একই বয়েস। এক আধ বছরের ছোট বড়। তা তিনি বড় বলে claim (দাবী) করেন (হাস্য)। আমার পঁচাত্তর বছর তিন মাস চলছে।

শ্রীম নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হাতে একটি কৌটা লইয়া পুনরায় বাহিরে আসিলেন। কৌটা খুলিয়া দু'টি সন্দেশ অন্তেবাসীর হাতে দিলেন। আর দুটি সূর্যবাবুকে এবং দু'টি সিলেটের ব্রহ্মচারী দেবেনের হাতে দিলেন। সূর্যবাবুর দুই ভাই মনু ও সনৎ মঠে সাধু হইয়াছেন। তাঁহাদের খবর লইতেছেন।

সন্ধ্যা হয় হয়। বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। শ্রীম উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির ঘরে বসিলেন — চেয়ারে উত্তরাস্য। সামনের বেঞ্চিতে অন্তেবাসী, ব্রহ্মচারী দেবেন, সূর্য, বলাই, হিমাংশু গুহ, পূর্ণেন্দু, কমল, শুকলাল, সুখেন্দু, রজনী প্রভৃতি অনেক ভক্ত বসা। কথা হইতেছে।

সূর্য — আচ্ছা, ঠাকুর ভবানীপুর গিছলেন কি?

শ্রীম — হাঁ, কোন উকীলের বাড়ি গিছলেন শুনেছি। আমরা সে স্থানটি identify (শনাক্ত) করতে পারি নাই। তবে কালীঘাটে অনেকবার গিয়েছেন।

তাঁর কি অদ্ভুত vision (দৃষ্টি) কে বুঝবে? বলেছিলেন, একদিন মা কালীকে কালীঘাটের পুকুরপাড়ে বেড়াতে দেখেছিলেন।

আবার বলতেন, কালীঘাট আর দক্ষিণেশ্বর একটা ক্ষেত্র। কিসের (কুর্মের) আকার। এতে দেবীপীঠ প্রশস্ত। আমরা তার কি বুঝবো!

একদিন বললেন, যে মা মন্দিরে, যিনি গর্ভধারিণী, আর যিনি আমাদের মা ঠাকরুণ — এই তিনই এক।

কি বুঝবো আমরা তাঁর কাণ্ড! মুহুর্মুহুঃ সমাধি হচ্ছে তাঁর। কি অদ্ভুত সব perception (অনুভূতি)!

তাঁর এই সব কথা শুনে কেশববাবু একটা sermon (বক্তৃতা) দিয়েছিলেন ঐখানে (নববিধান ব্রাহ্মসমাজে) — 'মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী'। 'মৃণ্ময় আধার' তা হলেই মূর্তিপূজা মানা হলো।

সূর্য — চেলারা আপত্তি করলো না?

শ্রীম — তিনি অমনি করে বলতেন ওরা সব ধরতে পারতো না।

একজন ভক্ত — কেশববাবু ঠাকুরের কাছে কতদিন আসাযাওয়া করেছেন?

শ্রীম — এইটিন সেভেন্টিফাইভ থেকে এইটিফোর পর্যন্ত (১৮৭৫-৮৪ খৃঃ) — এই দশ বছর আসাযাওয়া করেছেন। ঠাকুরও যেতেন ওঁর বাড়িতে। খুব strenuous life (আয়াসসাধ্য জীবন) ছিল কিনা! মাত্র forty two (৪২) বৎসর বেঁচে ছিলেন।

একজন ভক্ত — ঠাকুরের উপর কিরূপ ভাব ছিল তাঁর?

শ্রীম — বলেছিলেন, এঁর মত লোক জগতে দেখিনি। আঙ্গুর যেমন তুলোর উপর রাখে তেমনি এঁকে (ঠাকুরকে) রাখা উচিত। অথবা কাঁচের আলমারিতে রাখা উচিত। খুব ভালবাসতেন কেশববাবু।

শ্রীম (সহাস্যে) — ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলেছিলেন, দেখ বিজয় একদিন 'কে...' আমায় বললে, আপনি কৃপা করে আমাদের পূজার ঘরটি পবিত্র করে যান। ঘরে গেলে দরজা বন্ধ করে দিল, আর ফুল চন্দন দিয়ে আমার পা পূজা করেছিল। বললে কাউকে বলবেন না। আমি উত্তর করলাম, 'তোমারও দরজা বন্ধ রইল।' ভয়, পাছে জানাজানি হলে schism (বিভেদ) হয়ে যাবে আবার। অমনি তো দুটো দল। নবগোপাল বিশ্বাসও ছিলেন গোস্বামীর সঙ্গে ঠাকুর যখন এই কথা বলেন। আমরাও ছিলাম উপস্থিত।

সন্ধ্যার আলো আসিয়াছে। শ্রীম সর্ব কর্ম ছাড়িয়া ধ্যান করিতে বসিলেন। ভক্তগণও ধ্যান করিতেছেন। ধ্যান শেষ হইলে শ্রীম ভজন গাহিতে বলিলেন। কিন্তু ভজন হইল না। প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের greatest message (শ্রেষ্ঠ বাণী) হলো — ভগবানকে দর্শন করা যায়। আবার কথা কওয়া যায়। যদি বল, hallucination (মনের মোহ) তা কেমন করে হয়? জলবৎ তরল; মিলে যাচ্ছে যে। বেদ হয়ে রয়েছে ঐসব কথা।

যারা সংস্কারবান, কিম্বা যারা তাঁর কৃপা লাভ করেছে তারাই তাঁকে দেখতে পাবে। চাবি তো তাঁর হাতে। তাঁর ইচ্ছা হলে কতক্ষণ তাঁকে পেতে!

যাদের তাঁর জন্য ব্যাকুলতা হয়েছে তারা হয়তো এই জন্মেই তাঁকে লাভ করবে। ঠাকুরকে যারা দর্শন করেছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই জন্মেই লাভ করেছে।

আবার যাদের এমন ব্যাকুলতা হয় নাই তারা অনেক জন্মে লাভ করবে। 'অনেক জন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্' (গীতা ৬/৪৫)।

তাইতো তেমন ব্যাকুলতা না হলে তিনি বলেছেন, কাজ কর আমার জন্য। নিয়তং — 'কুরু কর্ম ত্বং' (গীতা ৩/৮)।। আবার কিরূপ কাজ তাও বলেছেন — নিষ্কাম কর্ম কর। তাতে মনস্থির হবে। এমনভাবে কাজ কর যাতে বন্ধন না হয় কর্মে। কর্ম — not the end of life but means. (কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়, উপায়)।

তিনি কি জানেন না নিষ্কাম কর্ম কত কঠিন। তাই আবার ভরসা দিয়েছেন — 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (গীতা ২/৪০)। এই যে stupendous difficulty (দারুণ কঠোর) নিষ্কাম কর্ম, তার একটু করতে পারলেও তাঁকে পাওয়া যাবে। তিনি কি জানেন না মানুষের weakness (দুর্বলতা)!

যদি বল, কর্মে যদি তাঁকে পাওয়া না যায় তা হলে কর্ম কেন করবো। না, তা নয়। গীতায় আছে, 'ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়' (গীতা ১২/৮)। — আমাতে মন সমাধিস্থ কর। যদি না পার তবে, 'অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়' (গীতা ১২/৯)।। অভ্যাস কর। অভ্যাসও যদি করতে না পার তবে, 'মৎকর্মপরমো ভব' (গীতা ১২/১০)। (আমার প্রীতির জন্য বা আমাতে ভক্তি উৎপাদক কর্ম কর।)

তিনি মানুষের weakness (দুর্বলতা) জেনেই সব বলে গেছেন। কিছুই বাদ রেখে যান নাই। মন সমাধিস্থ হচ্ছে না বলেই কর্ম করা। তবে মনটা স্থির হবে।

আবার বলেছেন,

'যস্তু আত্মরতিরেব স্যাৎ আপ্তুতৃপ্তশ্চ মানবঃ
.......তস্য কার্যং ন বিদ্যতে' (গীতা ৩/১৭)।

অনেক contradictory statements (বিরুদ্ধ উক্তি) আছে। সবই সত্য। Different state এর (বিভিন্ন অবস্থার) জন্য এই সব।

কর্ম not the end of life but means (কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নয়, উপায়)। End of life (জীবনের উদ্দেশ্য) ভগবান দর্শন, আর (তাঁর সঙ্গে) কথা কওয়া। এই কথা ঠাকুর বলে গেছেন। আবার নিজের জীবনে দেখিয়ে গেছেন। এক আধবার নয়, সর্বদা, চব্বিশ ঘন্টা। যেমন South pole-এ (দক্ষিণ মেরুতে) দিবানিশি ঝড় বইছে।

শ্রীম একটু চুপ করিয়া আছেন, পুনরায় কথা হইতেছে।

শ্রীম (শুকলালের প্রতি) — একেবারে কামনা বাসনা কেমন করে যায়, যদি প্রশ্ন কর। তার উত্তর — ভগবান দর্শন হলে যায়। ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম করতে পারেন তিনি, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।

তাই গুরু (অবতার) এসে বলে দেন, এই ভাবে চেষ্টা কর। আমাদের চেষ্টা করা উচিত। 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি।' (গীতা ২/৪৮)। সিদ্ধি অসিদ্ধির দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কাজ করা।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — অর্জুন বলেন, 'ন যোৎস্যে' (গীতা ২/৯)। শ্রীকৃষ্ণ হেসে উত্তর দিলেন — দাদা, তুমি তা পারবে না। ক্ষত্রিয় শরীর, যুদ্ধ করতেই হবে। 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি' (গীতা ১৮/৫৯)। তবে এই ভাবে কর — 'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ' (গীতা ৩/৮)। (নিয়ত কর্ম কর, কর্মশূন্যতার চেয়ে কর্ম শ্রেষ্ঠ)।

কর্ম not the end but means, end of life is (কর্ম উদ্দেশ্য নয়, উপায়, জীবনের উদ্দেশ্য) ভগবান দর্শন, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া।

তিনি কি জানেন না যে — কর্মে থাকলেই মলিনতা আসবে।

অর্জুন আবার সংসারী। তাই বললেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ' ভরসা দিলেন, 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি।' (গীতা ১৮/৬৬)। অর্থাৎ এই মলিনতা আমি দূর করে দিব। তুমি আমার শরণাগত হয়ে কাজ কর।

মনে রেখো — কর্ম not the end of life but means (জীবনের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু উপায় মাত্র)।

শ্রীম (সূর্যের প্রতি) — 'কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ' (গীতা ৪/১৬)। 'কবয়ো' মানে ঋষিরা। তাঁরাও বুঝতে পারেন নাই — কর্ম অকর্মের ভেদ। তাই বললেন, 'কর্মণি অকর্ম য পশ্যেৎ অকর্মণি চ কর্ম।' তিনি, 'কৃৎস্ন কর্মকৃৎ' (গীতা ৪/১৮)।

কর্ম কি এক রকম, কর্ম নানা রকম।

তাই কর্ম is not the end but means (উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র)।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, মশায় কামনা যায় কিসে? ঠাকুর উত্তর করলেন, 'তাঁকে দর্শন করলে'। তাঁর জন্য ব্যাকুলতা হলেই তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন হয়। ব্যাকুলতা হয় — তাঁর নাম গুণকীর্তনে, প্রার্থনা আর সাধুসঙ্গে।

'সৎগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে'। এই যে nice distinction, (সূক্ষ্ম প্রভেদ) তা সৎগুরু যিনি তিনি বলে দেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — তাঁর অজ্ঞানে সব ঢেকে রেখে দিয়েছে, জানতে দিচ্ছে না। তিনিই আবার মানুষ হয়ে এসে বলছেন — এর উপরও একটা আছে।

যিনিই অজ্ঞান দিয়েছেন তিনিই আবার পথ বলেছেন। যিনি বদ্ধ করেছেন তিনিই মুক্ত করছেন।

অবতার যখন আসেন তিনি কি দুটি লোকের জন্য আসেন? তিনি আসেন whole humanity-র (বিশ্ব মানবের) জন্য। সকলেরই উপায় তিনি বলে দিয়ে গিয়েছেন।

দেখ না একটি দল তিনি করেছেন। তারা ঈশ্বর বৈ কিছুই জানে

না। যেমন মৌমাছি ফুল বৈ কিছু জানে না। আবার কারুকে কারুকে সংসারে রেখেছেন।

তিনি কি শুধু সাধুর জন্য আসেন — সকলের জন্য তাঁর আসা। একজন ভক্তকে বলেছিলেন, তিনি বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন — 'তোর জন্যই বেশী ভাবনা'। জানেন কিনা যে জড়িয়ে গেছে।

কর্ম not the end of life but means (জীবনের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু উপায়)। End (উদ্দেশ্য) — ভগবান দর্শন।

আবার মনে কর, যারা পূর্বজন্মের সংস্কারে নূতন সংসার আর পাতে নাই এই জন্মে, যারা সর্বদা তাঁকে নিয়ে আছে, তারা কি আবার ইচ্ছা করে সংসার করতে যাবে নাকি! যখন তিনিই সব দেখছেন, তাই বলে কি আবার নিজেকে জড়াতে যাবে নাকি?

বাইবেলে আছে, কি বলে, 'Do not tempt thy Lord (ঈশ্বরকে পরীক্ষা করতে যেয়ো না) টেম্‌ট্ মানে examine (পরীক্ষা) করা।

সূর্যের প্রতি — এই আপনার ভাইরা আবার বিয়ে করতে যাবে নাকি?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — দেখ না, তিনি সাধু করেছেন কেন? তবে গৃহে যারা আছে তারা তাদের পূজা করবে। তবে তাদের মঙ্গল হবে। মাছের তেলে মাছ ভাজা। একজনকে দিয়ে আর একজনকে ভালো করাচ্ছেন।

The end of life is (জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে) ভগবান দর্শন। কর্ম means (উপায়)।

এই দেখ আমরা অতগুলো এখানে রয়েছি। সকলেই ভাবছি, আমি কর্তা। কিন্তু কর্তাটা কোথায়? যখন মা'র পেটে ছিলাম তখন তিনি কোথায় ছিলেন? দেখ না কি helpless state (নিরুপায় অবস্থা)। আবার দশমাসের বেশী থাকবার যো নাই। তাঁর এমনি সব ব্যবস্থা। ক্রমশঃ হাত পা হতে লাগলো প্রায় অদৃশ্য একটি স্পারমেটোজুন (বীর্যাণু) থেকে। বাইরে এলো। এখানে এমনি environment (পারপার্শ্বিক অবস্থা) করে রেখেছেন তাতে ক্রমে

sensation, perception (ইন্দ্রিয় ক্রিয়া, বস্তুজ্ঞান) হতে লাগল। আবার ঐগুলি localise (অনুভব) করবার জন্য একটা centre (কেন্দ্র) হলো। তার নাম মন। মন থেকে বুদ্ধি। তার থেকে personal identity (ব্যক্তি জ্ঞান, অহংকার) যাতে 'আমি' 'আমি' করছি। কি অদ্ভুত ব্যাপার nervous system (স্নায়ুমণ্ডলী)! এইসব তিনি করে রেখেছেন। এখন মানুষ কিসে ভাবে নিজেকে কর্তা?

শ্রীম (সকলের প্রতি) — যিনি এত সব কাণ্ড করেছেন তিনি আবার পরে যা হবে করবেন। আমার অত ভাববার দরকার কি? তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তি।

একটি নূতন ভক্ত আসিয়াছেন। তিনি চেয়ারে শ্রীম-র বাঁ পাশে বসা। তিনি কথা কহিতেছেন।

নূতন ভক্ত (শ্রীম-র প্রতি) — তাঁকে লাভ করা যদি জীবনের উদ্দেশ্য হলো — অবশ্য এটা বোঝাও যায়, তবে তাঁতে মন যায় না কেন?

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, সাধু দর্শন, সাধু সেবা কর। আর তাঁকে প্রার্থনা কর। এটা হল direct (সহজ) পথ।

সাধু আবার তিন রকম বলে গেছেন — নির্জলা, ফুলমূলাহারী আর লুচিছক্কাভোজী। লুচিছক্কা মানে যারা ভোগ করে। দেহসুখ, লোকমান্য, টাকাকড়ি, প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা, এইসব চায় তারা। তুমি যদি তাদের সঙ্গ কর তবে তুমিও ঐ রকম হয়ে যাবে।

যারা ভগবানের জন্য ব্যাকুল তেমন সাধু দেখলে তো তোমারও ব্যাকুলতা হবে।

থিয়েটারেও সাধু আছে — মাত্র ভেক রয়েছে। তার সঙ্গ করলে কি হবে?

হঠাৎ একটি হুড় হুড় শব্দে কথার প্রবাহ রুদ্ধ হইল। সকলে স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছেন, ঘরের উত্তরপূর্ব কোণে হাইবেঞ্চের উপর থেকে একটি দেবদারু কাঠের বাক্স নিচে পড়িয়া গিয়াছে।

এখন রাত্রি সাড়ে সাতটা। কথামৃত পাঠ হইতেছে। হিমাংশু

তৃতীয় ভাগ, চতুর্থ খণ্ড পড়িতেছেন। মণি তিনটি আম নিয়া আসিয়াছেন ঠাকুরকে দর্শন করতে দক্ষিণেশ্বরে। তিন পরিচ্ছেদ পাঠ হইল।

অন্তেবাসী ও ব্রহ্মচারী (দেবেন) বিদায় লইতেছেন প্রণাম করিয়া। তাঁহারা বেলুড়মঠে ফিরিবেন। শ্রীম দাঁড়াইয়া বিদায় দিলেন। বলিতেছেন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি বাক্য মনের অতীত, যিনি মানুষ হয়ে এসেছেন, আপনাদের তাঁর পদপ্রান্তে স্থান দিয়েছেন, তাঁর সন্তান আপনারা, আপনার লোক, যেমন পিতাপুত্র। এই মহাসত্যটি চিন্তা করতে করতে মঠে যান।

সুখেন্দু এইচ. বোসের ফটক পর্যন্ত এসে বিদায় নিলেন।

বেলুড় মঠ,
২০শে অক্টোবর, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ, রবিবার।

ঊনবিংশ অধ্যায়

আগুন নিয়ে খেলা

শ্রীম আপন কক্ষ দ্বারে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে বলিতেছেন, 'নমস্কার, নমস্কার। বাঃ বাঃ! আসুন, বসুন।' বেলুড়মঠের চারজন সন্ন্যাসী আসিয়া শ্রীম-র জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সাধুগণ দাঁড়াইয়া শ্রীমকে অভ্যর্থনা ও প্রণাম করিলেন। শ্রীম চেয়ারে বসিলেন উত্তরাস্য। সাধুরা বসিলেন জোড়া বেঞ্চিতে সতরঞ্চির উপর সম্মুখে।

মর্টন স্কুলের চারতলার সিঁড়ির ঘর। এখন সকাল সাড়ে আটটা। শ্রীম ঘরে বসিয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার দৌহিত্র ঘরে গিয়া সংবাদ দিলে তিনি বাহিরে আসিলেন। সাধুরা এখন ওয়েলিংটন লেন অদ্বৈত আশ্রম হইতে মোটর বাসে মেছুয়া বাজারের মোড়ে নামিয়া শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস। এ গরমেও শ্রীম-র গায়ে লালইম্‌লীর সাদা সোয়েটার। গলায় ওয়ারফ্লানেলের পাঞ্জাবী বিজড়িত। পরণে লালপেড়ে ধুতি। শরীর অসুস্থ। তথাপি কথামৃত বর্ষণের বিরাম নাই।

শ্রীম-র কথামৃত বর্ষণে জগৎ ভুল হয়ে যায়। স্বামী শান্তানন্দ গতকাল 'অন্তেবাসী'কে বলিয়াছিলেন, 'চল ভাই একবার জগৎ ভুলে আসি।' অর্থাৎ শ্রীমকে দর্শন করা। তাই আজ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ স্বামী শান্তানন্দকে লইয়া আসিতেছিলেন। এই সুযোগে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আর স্বামী সম্বুদ্ধানন্দও দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীম (স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের প্রতি) — আপনারা কোথায় রয়েছেন?

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ — দিল্লীতে।

শ্রীম — না, এখন কোথায় আছেন, মঠে?

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ — আজ্ঞে হাঁ, মঠে।

শ্রীম — আমরা দিল্লী গিছলাম, আঠার বছর আগে। কতক্ষণের জন্য — passing ঋষিকেশের ফেরৎ। বায়স্কোপে পঞ্চাশ হাজার লোক নামাজ পড়ছে, দেখেছিলাম। তখনও সেখানে রাজধানী হয় নাই।

স্বামী শান্তানন্দ — নাইটিন হাণ্ড্রেড টুয়েলভে (1912) মা যখন কাশীতে ছিলেন তখন আপনি গিছলেন।

শ্রীম — হাঁ, তখনই। বেশ নামাজের ছবিটি। ভারী উদ্দীপন হয়।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ — actual (সত্যিকার) নামাজ থেকে বায়স্কোপে ভাল দেখায়। সেখানে সবটা দেখা যায়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথামৃত বর্ষণ।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — কি অদ্ভুত দৃশ্য — সর্বদাই ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে আছেন। একটা ছাতা খোলা ছিল। একজন ওটা বন্ধ করছে। দেখেই অমনি সমাধি। যোগের কথার উদ্দীপন হয়েছে। ছড়ান মন কুড়িয়ে এলো। সব নিরোধ হয়ে এলো। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ' (পাতঞ্জলী যোগ সূত্র ১২)। সর্বদাই তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে এক হয়ে আছেন।

একবার গিছলেন, বড়বাজার একজন মারোয়াড়ী ভক্তের বাড়িতে। তখন একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কলিতে এখন তো আর অবতার নাই?' ঠাকুর উত্তর করলেন, 'তুমি কেমন করে জানলে?' অর্থাৎ তিনি নিজেই যে অবতার। এ কথা সকলকে বলতেন না। অন্তরঙ্গদের বলতেন, 'আমাকে ধ্যান করলেই হবে। তোদের আর কিছু করতে হবে না।' বহিরঙ্গদের বলতেন না এ কথা। তাদের, যেমন ব্রাহ্মদের বলতেন, 'হাঁ যা করছ কর।'

ওরা নিরাকার মানে কিনা। ওদের বলতেন, মিছরীর রুটি যেভাবেই খাও মিষ্টি লাগবেই। আড় করেই খাও আর সোজা করেই খাও।

একদিন বললেন, 'একদিন দেখলাম এঁর (ঠাকুরের) ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বের হয়ে দু'টি (ভিন্ন সত্তা) হয়ে বলছে, — আমিই

যুগে যুগে অবতার হই। দেখলাম, সত্বগুণের আবির্ভাব, একেবারে পুর্ণ আর্বিভাব!

অন্তরঙ্গদের বলতেন, তাঁর এই সব কথা।

পুনরায় কিছুকাল চুপ থাকিয়া আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — এই মেমরা এসেছিলেন কাল; আমেরিকার দুটি আর জার্মানটিও।

তাঁহাদের নাম বলিতেছেন।

একটি সাধু শ্রীম-র চক্ষু দু'টি এক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, 'এত বয়স কিন্তু বুদ্ধি কি স্থির! অমন কঠিন নাম একবার শুনেই মনে রেখেছেন। এই ইনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।'

শ্রীম — জার্মানটি নার্সিং ভাল জানেন। জিমনাষ্টিকও ভাল জানেন। রেঙ্গুন যাবেন। আমি একটা remark (মন্তব্য) করলাম — once a nurse always a nurse (জীবনভোর নার্সই থাকতে হবে)! শুনে খুব হাসলেন। বললুম, কেন? এগিয়ে পড় না। ঠাকুরের যেমন কথা আছে। আগে চন্দন কাঠ, রূপার খনি, সোনা, হীরের খনি রয়েছে। এগিয়ে যাও।

বেদান্ত বেদান্ত করে দেখলুম ঐ মেমরা। বেশ লোক। আমরা বললুম, who is to interpret the Vedanta? An avatar is required (বেদান্ত ব্যাখ্যা করবে কে? একজন অবতারের যে দরকার)। অবতার না হলে শাস্ত্রের অর্থ বলবে কে? Sutras are all right. But who is to interpret them? (সূত্র সব ঠিক্। কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা করে কে?)। তিনি এসে তবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন।

The Dispensary is filled with bottles with magnificient labels on – 'Swallow the contents' (ডাক্তারখানা তো পরিপূর্ণ জমকালো লেবেলওয়ালা ঔষধের বোতলে। ইচ্ছামত খাও না ঔষধ)। অসুখ করবে তোমার ইচ্ছামত নিলে। তাই ডাক্তারের দরকার। আবার মাত্রা বলেছেন। 'ডাক্তার' মানে অবতার।

তা নইলে, ‘যদি ছিল রোগী বসে, বদ্যিতে শোয়ালে এসে’, হয়ে যায় — Blind leading the blind (অন্ধের পথ দেখান অন্ধের দ্বারা যেমন)।

বলতেন বাজনার বোল মুখস্থ করা সোজা, হাতে আনা কত বড় শক্ত। একজন সাধু (স্বগতঃ) শাস্ত্র ঠাকুরের কথার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া উচিত। যেখানে মিলবে না সেখানে ছেড়ে দেওয়া।

শ্রীম (উত্তেজিত ভাবে) — It is no joke, a very serious matter — playing with fire. (এ ছেলেখেলা নয়, অতি গুরুতর ব্যাপার — আগুন নিয়ে খেলা)।

God should be seen, talked to, and communed with (ঈশ্বর দর্শন করতে হবে। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে হবে। আবার যুক্ত হয়ে থাকতে হবে)।

জনৈক সন্ন্যাসী (স্বগতঃ) — কি আশ্চর্য জোর কথার! কথার সঙ্গে সঙ্গে মনটা ক্রমশঃ উপর থেকে উপরে নিয়ে যাচ্ছেন, শেষে একেবারে আদর্শে। বাইরের জগৎ যেন ভুল হয়ে গেল।

শ্রীম — অবতার এসে শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ প্রকাশ করেন। তা নইলে blind leading the blind, both fall into the ditch (অন্ধকে যেমন অন্ধ নিয়ে যায় সেইরূপ হয়। উভয়েই গর্তে পড়ে প্রাণ হারায়)।

আজকাল দেখতে পাওয়া যায় নূতন যারা ব্রহ্মচর্য সন্ন্যাস নিয়েছে, তারা আশ্রমের জন্য চাঁদা তুলতে যায়। ওটা খুব dangerous (বিপজ্জনক) sights and scenes-এর (বাহ্য প্রতিকূল দৃশ্যাদির) influence (প্রভাব) হয়। হয়তো যুবতী স্ত্রীলোক সামনে এসে পড়লো।

গুঁড়ি মোটা হলে তখন হাতী বাঁধলেও কিছু হয় না। আগে অনেক যত্নে গুঁড়ি মোটা করতে হয়। তারপর করতে হয় এ সব কাজ কর।

মঠ কত হলো Buddhistic Movement-এ (বৌদ্ধ যুগে) তার চিহ্নও রইল না। মলিনতা ঢুকে সব গেল। রোমান ক্যাথালিকদের

কত সব আশ্রম হয়েছিল। কোথায় সব গেল? মিডল এজে (Middle Age – মধ্য যুগে) কত সব inquisition-ই (লোককে পুড়িয়ে মারা) হলো।

Organisation-এ (সঙ্গে) ক্রমে সব hollowness and rottenness (অন্তঃসারশূন্যতা ও পঙ্কিলতা) ঢোকে। অথরিটিজ্‌দের (কর্তৃপক্ষের) সর্বদাই গার্ড করা উচিত।

ক্রাইস্ট বলেছিলেন, The Sabbath was made for man and not man for Sabbath (St. Mark 2 : 27) (বাহ্য আচার মানুষকে ঈশ্বরমুখী করবার জন্য। কেবল আচার পালনের জন্য মানুষ সৃষ্টি নয়)। ঠাকুরেরও এই ভাব। মানুষকে sacrifice (বিসর্জন) করা তাঁর ইচ্ছা নয়। মানুষকে ঠিক রেখে যতটা হয়। — playing with fire (এ আগুন নিয়ে যেন খেলা)।

সন্ন্যাসীগণ নির্বাক — এই গুরুগম্ভীর সাবধান বাণী শুনিতেছেন।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — ঠাকুর নন্দন বাগানে গিছলেন। ব্রাহ্মদের উৎসব। জুতা পরা মেয়েদের পায়ে। ঠাকুর বললেন, 'ওমা আমি ভাবছি এবার এরা নাচবে।' Caricature (হাস্যরসের অভিনয়) করতেন কিনা (হাস্য)। 'ব্রহ্ম সঙ্গীত' হাতে। কে একজন বললে, 'না, গান গাইবে।' অমনি ঠাকুর উত্তর করলেন, আচ্ছা, মেয়ে মানুষ কাছে বসা। ধ্যান হয় কি করে? ওরা ভোগী কিনা, ভোগের বস্তু কাছে রেখেছে।

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (সমস্বরে) — আজকাল থিয়রি (মত), ওদের সঙ্গে থাকলে sex idea (কামভাব) কম পড়ে। গান্ধিজীও ওটা করেছিলেন। কিন্তু আশ্রমে কয়েকটা খারাপ incidents (ঘটনা) হলো।

শ্রীম (সবিস্ময়ে) — তা' হবে না? তাও (স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে থেকে পবিত্র থাকা) কি কখনও হয়। ভোগী আর ভোগের বস্তু কাছে থাকলে এ হবেই!

তবে ত্যাগীদের নয়। ত্যাগীদেরও যারা প্রবর্তক তাদের সাবধান

হতে বলতেন। প্রথম অবস্থায় স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়াতে বারণ করতেন।

এইসব hard unpalatable truth (কঠোর অপ্রীতিকর সত্য) তিনি বলে গেছেন। সার্জেন যখন সার্জিক্যাল ল্যানসেট (ছুরি) চালায় তখন কষ্ট হয় বটে। কিন্তু পরে বলে বেশ আরামে ঘুম হয়েছিল রোগীর — The patient had a good rest. His nerves were soothed.

Unpalatable (অপ্রীতিকর) হলেও in the long run (শেষ) ভাল। কি বলে? — Nothing succeeds like success (সাফল্যলাভই সফলতার জনক)।

প্রশান্ত গম্ভীর শ্রীম-তে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। পাশে দোরগোড়ায় 'অন্তেবাসী' বসিয়া আছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — মিছরী আন না। ঘরে আছে।

সাধুরা আসিয়াছেন। কি দিয়ে সেবা করিবেন, সেই ভাবনা। আবার নিজের শরীর অসুস্থ। চক্ষু দিয়ে মাঝে মাঝে জল পড়িতেছে। অন্তেবাসী গৃহে প্রবেশ করিলেন। উনিও পশ্চাতে গেলেন। টেবিলের উপর কাঁচের বৈয়ামে মিছরী। টেবিলটি উত্তর-পশ্চিম কোণে, উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান। পাশেই পূর্ব-পশ্চিম লম্বমান খাটে বিছানা। টেবিল পুস্তকরাশিতে পূর্ণ। শ্রীম নিজেই একটি এলুমিনিয়ম পাত্রে কিছু মিছরী দানা লইলেন। অন্তেবাসী জল ঢালিয়া দিতেছেন। তিনবার মিছরী শ্রীম ধুইলেন। বলিতেছেন, ঠাকুরকে দিতে হবে কি না। তারপর সাধুদের প্রসাদ দেওয়া। মিছরীর পাত্র হতে লইয়া চক্ষু অন্তর্মুখীন করিয়া চটীজুতা ছাড়িয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। বাহিরে আসিয়া পুনরায় জুতা ছাড়িয়া সাধুদের হাতে হাতে মিছরী প্রসাদ দিলেন। অসুস্থ শরীর। ভিতরে যন্ত্রণা। তবুও সাধুসেবা ছাড়িবেন না। নিজে সাধুদের স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীরের সেবা করিতেছেন অকাতরে।

যুবক সতীনাথের প্রবেশ। সঙ্গে কিশোর বয়স্ক ভাই। তাহার হাতে একটি ঠোঙ্গা, তাতে মিষ্টি। সতীনাথ মাঝে মাঝে আসেন। তাঁহার ভাইটি গৌরবর্ণ। চোখ মুখের ভাব স্থির, ভক্তিমান। উভয় ভ্রাতা

ভূমিষ্ঠ হইয়া সাধুদের প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীম (স্বগত) — কুঁজোতে যে জল নাই।

সতীনাথ জল আনিতে একতলায় যাইতেছেন।

শ্রীম (সতীনাথের প্রতি) — পঞ্চুকে দিয়ে জল আনিও যদি দেখা পাও।

সতীনাথ নিজেই জল লইয়া আসিলেন।

অন্তেবাসী (সতীনাথের প্রতি) — বড়ই কষ্ট হলো। একতলা থেকে কুঁজো নিয়ে চারতলায় ওঠা।

শ্রীম (সহাস্যে প্রতিবাদ করিয়া) — জল আনতেই এত কষ্ট! মানুষ ঈশ্বরের জন্য অত কষ্ট করে। স্বামীজী তিনদিনের অনাহারে মুর্চ্ছিত হলেন। সাধুদের জন্য জল আনতে আর কত কষ্ট!

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ — এখানে এসে পাঁচ মিনিট বসলে সব কষ্ট দূর হয়ে যায়।

শ্রীম — হাঁ। যেখানে অচ্যুতের কথা হয় সেখানে সর্বতীর্থ — গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী — সব তীর্থ সমাগম হয়। ভাগবতে আছে প্রথম দিকে এইসব কথা। আবার এসব ঠাকুরের কথা।

(সকলের প্রতি) — 'উপনিষদং ভো ব্রূহি'; উপনিষদং — (হাস্য)। আচার্য উত্তর করলেন, এই যে বললুম উপনিষদ্। ঈশ্বরীয় কথাই উপনিষদ্।

সতীনাথ আম ও সন্দেশ আনিয়াছে। শ্রীম আরও একটু সন্দেশ দিয়া বলিলেন, 'দাও সাধুদের একটু একটু করে ভাগ করে সকলকে দাও।' সাধুরা পুনরায় প্রসাদ পাইতেছেন।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি বালক ভক্তটিকে দেখাইয়া) — এই সব New generation (নূতন লোক)।

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ — আচ্ছা, আজকাল পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন young man-দের (যুবকদের) ভিতর?

শ্রীম — হাঁ। অনেক। খালি কি এই? আবার ওটিও বল না — মেয়েদের কথা। কি হচ্ছে দেখ না। ঐ সব দেশ (ওয়েস্ট)

একেবারে অবাক হয়ে যাচ্ছে সব দেখে। অভাবনীয়, অচিন্ত্যনীয়, স্বপ্নের অগোচর যা, তাই হচ্ছে। ওদের (ওয়েস্টের) ধারণা, মেয়েরা যখন ঐ সব (নন কো-অপারেশন) করছে তখন দেশের খুব উন্নতি হয়েছে।

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ও সম্বুদ্ধানন্দ — সরোজিনী নাইডু আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়েছেন। শুনে ওরা স্তম্ভিত হয়েছে।

শ্রীম — উনি কি একা? এখন কত সব বের হচ্ছে। ঐসব দেশেও অত হয় না। জেলের ভিতর কি করছে সব। নৃত্য করছে — কিছুতেই দমছে না।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — আচ্ছা, তাহলে ঠাকুর যে বলেছিলেন 'স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ' —তা'র কি হল?

হাঁ, এটা স্বরাজ লাভের জন্য। তরঙ্গের (হাতে দেখাইয়া) hollow and crest (উচ্চনীচ) আছে। এটা hollow (হীনাবস্থা) আবার crest (উচ্চাবস্থা) হবে — যখন স্বরাজলাভ হয়ে যাবে। লজ্জা ফিরে আসবে।

কিশোর বালক ধন্য। কারণ, দেখিতেছি শ্রীম তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন। এইরূপ কত বালককেই না শ্রীম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভে ধন্য করিয়াছেন। শ্রীম বালকের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (বালকের প্রতি) — (বেলুড়) মঠে গিছলে?

বালক — তিন-চারবার গিয়েছি।

শ্রীম — এঁদের দেখেছ?

বালক — না।

শ্রীম — কারুকেও না? — সব এক রকম, লাল কাপড়। আর বস্তুতঃ ও একই (নারায়ণ)। ছেলেবেলায় সাহেবদের আমরা সব এক মনে করতাম। সব (পোশাকে) ঢাকা।

কলকাতায় একজন সাধু এসেছেন। (দুই হাতে দেখাইলেন — মোটা)। অনেক লোক যায়। (বালকের প্রতি) তুমি যাও নাই? তোমার বাপ বুঝি গিছলেন? ঔষধ দেন।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — ঠাকুর কিন্তু এক মা ছাড়া কিছুই জানতেন না। 'মা তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও'— এই তাঁর এক প্রার্থনা।

রোগ সারান, ছেলে হওয়া, টাকাকড়ি হওয়া — এ সবের ব্যবস্থা অন্য সাধুরা করেন। ঠাকুরের মা ছাড়া অন্য কোনও কথা নাই।

যত উপদেশ দিয়েছেন — যারা সংসারে আছে কিম্বা যারা সংসার ত্যাগ করেছে — সকলকেই ত্যাগের উপদেশ করেছেন। সন্ন্যাস আগাগোড়া।

টাকাকড়ি তিনি চাইতে পারতেন না। এইটে আমাদের অনুকরণীয়। যার তার কাছে টাকার জন্য হাত পাতা ভাল নয়।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় রামকৃষ্ণ বাণীসুধা বর্ষণ হইতেছে।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — ঠাকুরের শরীর থাকতে তাঁর জন্মোৎসব হয়েছিল। তিনি বলে দিছলেন, 'যারা আপনা থেকে দেবে তাদের টাকা নেবে। চাওয়া হবে না।'

আমরা যখন গেছি এইটিন এইট্টি টু-এ (1882) তখন মনে হয় সবে তাঁর জন্মোৎসব হয়ে গেল। তারপর দু'টো দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। এরপরই অসুখ। কাশীপুরেও হয়েছিল একটা।

বলে দিছলেন, টাকা পয়সা চাওয়া হবে না। ইচ্ছা হয় দিক্।

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ — তখন কত লোক হতো? কুড়ি পঁচিশ জন?

শ্রীম — হাঁ, ঐ রকম। পরে ক্রমশঃ বেশী।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ — মা ঠাকরুণের সমাধি দেখেছেন আপনি?

শ্রীম — ভক্তরা কেউ কেউ দেখেছেন, যারা খুব fortunate (সৌভাগ্যবান)। স্থির, চক্ষুর নিমেষ নাই। খুব লজ্জা ছিল কিনা। তাই যাঁরা কাছে থাকতেন, তাঁরা ডাকতেন ভক্তদের যাদের তিনি ভালবাসতেন। আহা, কি দুর্লভ সে দৃশ্য!

স্বামী শান্তানন্দ — মা নিজেই ন'বতে থাকার কথা বলেছিলেন। বলতেন, ঐটুকুন জায়গা তাতে দু'তিনজন থাকতেন। কখনও আরো

বেশী। আবার অত সব জিনিষপত্র। এমন কি জিয়ান সিঙ্গী মাছ — টিনে নড়ছে।

শ্রীম — বেড়া দেওয়া ছিল। ওতেই আবার রান্না হতো। আমরা যখন গেছি দক্ষিণেশ্বর মা তখন সবে চলে গেছেন দেশে।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ — যেখানে মঠ ঠাকুর নাকি একবার সেখানে নেমেছিলেন?

শ্রীম — হাঁ, তবে ঠিক ঐখানে কিনা তার ঠিক নাই। কাপ্তেনের কাঠের কারখানা ছিল ঐদিকে। নেপাল থেকে কাঠের চালান আসতো। সেখানে একবার নেমেছিলেন।

স্বামী শান্তানন্দ — নটা বেজে গেছে। আপনার স্নানের সময় হয় নাই তো?

শ্রীম — না, দশটার ভিতর হলেই হয়।

স্বামী শান্তানন্দ — এই জলেই হয়?

শ্রীম — হাঁ, ঐ ছাদে বালতিতে জল গরম হচ্ছে রৌদ্রে।

সাধুরা প্রসাদী হাত ধুইতেছেন। সতীনাথ হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — আপনারা সকলেই ওয়েলিংটনে (অদ্বৈতাশ্রমে) যাবেন?

স্বামী শান্তানন্দ — এঁরা দুজন যাবেন। আমি আর ইনি (স্বামী নিত্যাত্মানন্দ) পূর্ণেন্দুর ওখানে খাব।

শ্রীম — পূর্ণেন্দুর গেস্ট!

এইবার ভাই ভূপতির কথা হইতেছে।

একজন সাধু (শ্রীম-র প্রতি) — উনি ঠাকুরের কৃপা পেয়েছিলেন?

শ্রীম — হাঁ, ঠাকুর কৃপা করেছিলেন। গায়ে পা দিলে সমাধি হয়েছিল।

সিভিল ডিজঅবিডিয়েন্স (আইন অমান্য) আন্দোলন সবে মাত্র বন্ধ হইয়াছে। 'গান্ধী-আরউইন ট্রুস্' হইয়াছে। গান্ধী মহারাজের বিজয়

বার্তা সর্বত্র বিঘোষিত। তাহার কথা চলিতেছে।

শ্রীম — গান্ধী মহাত্মা খালি খদ্দর করছেন না। রাম নামও প্রচার করছেন। রোজ রামনাম হয় তাঁর আশ্রমে।

তা হলেই হোল — ঠাকুর যা বলেছিলেন। — ভক্তি প্রচার কর। তাহলে problem of untouchability solved (অস্পৃশ্যতা সমস্যা) দূর হয়ে যাবে।

গান্ধী মহাত্মা তাই করছেন। শুধু intellectual movement (বুদ্ধির আন্দোলনের) দ্বারা ইহা solved (সমাধান) হয় না। অনেক দিন ধরে এটা একটা knotty problem (জটিল সমস্যা) ছিল। এখন solved (সমাধান) হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, সকলের সঙ্গে খেলে, আর সকলের পাতে খেলেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান হতো, তা হলে কুকুরগুলো ব্রহ্মজ্ঞানী। সকলের পাতে খায় (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর ভক্তি প্রচার করতে বলেছিলেন। তাতে হবে। গান্ধী মহাত্মা তাই করছেন। In so many words-এ (কতগুলি কথা দিয়ে) নাই বা বললেন। তাতে কি আর প্রচার হয় না! তিনি মুখে বলেন না — ধর্ম প্রচার করছি। কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ — আজ (কর্মভার লইয়া) ঢাকা যাব। আশীর্বাদ করুন।

শ্রীম — তাঁর আশীর্বাদ রয়েছে।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ — হাঁ। তা নইলে বেঁচে আছি কি করে!

সাধুরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। শ্রীম সিঁড়ির গোড়ায় দণ্ডায়মান।

শ্রীম — হাঁ উঠি saving clause (ভরসার বাণী)। আবার আছে, 'অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং?'(গীতা ৬/৪৫) এক জন্মে না হয় পর জন্মে হবে। এই আর একটি saving clause (ভরসার বাণী) রয়েছে।

সাধুরা ধীরে ধীরে নামিতেছেন আর শ্রীম-র অভয় বাণী

শুনিতেছেন। এক একবার উপরে তাকাইয়া শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন। পুনরায় সাধুরা শুনিলেন, শ্রীম বলিতেছেন, 'ন হি কল্যাণকৃত কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি' (গীতা ৬/৪০)। ঘরের ছেলে ঘরে যাবে ভাবনা কি?

অদ্বৈত আশ্রম। ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা।
৩০শে মে, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার। জ্যৈষ্ঠা শুক্লা চতুর্দশী।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এই পঞ্চম ভাগে পাঠকগণ শ্রীমকে দেখিতে পাইবেন ঋষির ভূমিকায়। শ্রীম উপনিষদ্ গুরুগম্ভীর বৈদিক সুরে পাঠ করিতেছেন আর ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বেদের সার উপনিষদ্। হিন্দু সংস্কৃতির হৃদয়মণি এই উপনিষদের সুগভীর ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রীম এমন সহজ আর সরলভাবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে আরূঢ় করাইতেছেন যে আমরা চেষ্টা করিলেও তাহা ছাড়িতে পারি না।

বাল্যকাল হইতে তপোবন ঋষি উপনিষদ্ এইসকল পবিত্র মহাবাণী আমরা শুনিয়া আসিতেছি। ঋষির নাম শুনিলেই মনে হইত তাঁহারা আমাদের মত মানুষ নন। প্রাচীনকালে তাঁহারা আসিয়াছিলেন। উপনিষদতত্ত্ব ভারতকে উপহার দিয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমরা আর দেখিতে পাইব না। ঋষিদের নাম শুনিলেই হৃদয়ে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সুমহৎ দৈবী চরিত্রের কথা ভাবিয়া অকিঞ্চন আমাদের ভয় হইত।

শ্রীমকে আমরা তখন ঋষির ভূমিকায় লইতে পারি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের পার্যদ শিক্ষাব্রতী ও মনীষী শ্রীমকে 'মাস্টার মহাশয়' রূপে আমরা পাইয়াছিলাম। তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত করিলেও তখন তাঁহাকে ঋষির মর্যাদা দিতে পারি নাই। কিন্তু যখন ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করিলাম সর্বাবস্থায় সর্বকার্যে সর্বকালে, তখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম ঋষিগণ বুঝিবা তাঁহারই মত মানুষ ছিলেন, তাঁহারই মত নিঃস্বার্থ স্নেহে জীবগণকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞান ভক্তির সরস সজীব আর সুমধুর আনন্দধামে লইয়া যাইতেন।

যতই দিন যাইতে লাগিল ততই ইহা স্পষ্ট মানসচক্ষুর সম্মুখে

প্রতিভাত হইতে লাগিল যে প্রাচীনকালের ঋষিগণও শ্রীমর-ই মত মানুষ ছিলেন; নিঃস্বার্থতা আর প্রেমে পরিপূর্ণ ছিলেন তাঁহারা, জীবের পরমার্থ লাভের পরম সুহৃদ্ ছিলেন তাঁহারা, সংসারে যথার্থ বন্ধু ছিলেন তাঁহারা। এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ঋষিগণের জন্য যে ভয় ছিল সে ভয় বিদূরিত হইল। মনে হইতে লাগিল তাঁহারা আমাদের অনন্তকালের বন্ধু। আর পিতামাতার মত শুভ চিন্তক।

এখন মনে হইতেছে আমরা ধন্য, আমরা সৌভাগ্যবান, আমরা কৃতকৃত্য। কেননা, বর্তমান জড় সভ্যতার তাণ্ডব নৃত্যে উদ্বেলিত, এই কলকব্জার যুগে, এই ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে আমাদের এই জড় চক্ষুতে প্রাচীনকালের ঋষিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার কাছে স্নেহাষ্পদ সন্তানবৎ স্নেহ ও শাসন উভয়ই লাভ করিয়াছি। তাই আমরা ধন্য।

এই ঋষি দর্শন কি করিয়া সম্ভব হইল তাহাও ভাবিতেছি। শ্রীম-র মুখে শুনিয়াছি যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্যমনের অতীত সেই পরব্রহ্মই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ভারতের বাংলায়।

শ্রীম নিজ মুখে বহুবার বলিয়াছেন, এই পরশমণির সংস্পর্শে আমরা সোনা হইয়াছি।

আরও বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদপুরুষ, উপনিষদ্ যাঁর গুণগাথা বর্ণনা করেন। এই মহামানবই আমাদিগকে এই সুখ দুঃখময় সংসারে রাখিয়াই আমাদের মনকে পরম আনন্দ, পরম শান্তি, পরম সুখের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম প্রবোধ দিয়া আমাদিগকে বলিতেন, তোমরাও সেই পরমধনের উত্তরাধিকারী। আমাদের কথায় যদি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে, অল্পায়াসে বা অনায়াসে সেই পরমধন লাভ করিতে পার। সেই পরমধনটি হইতেছে — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'জীবশিব' — প্রাচীন উপনিষদের মহাবাণী।

শ্রীমকে পাইয়া উপনিষদ্-যুগের হাজার হাজার বৎসরের দূরত্ব

ও বিভীষিকা দূর হইল। মনে হইল, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে দূরত্ব নাই, ভয়ও নাই। আছে কেবল আত্মীয়ত্ব, অনন্ত শান্তি, অনন্ত প্রেম, অনন্ত আনন্দ।

মিহিজামের তপোবনে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে শ্রীম বলিয়াছিলেন, তোমাদিগকে উপনিষদাদি শাস্ত্র কেন শুনাইতেছি — এই জন্যই না, এই সব শাস্ত্রাদির যাহা উদ্দেশ্য আর লভ্য, তাহাই তোমরা সরল সহজ সুললিত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে শুনিতে পাইতেছ।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত উপনিষদের নির্যাস। পাছে তোমাদের মনে হয় উপনিষদাদি শাস্ত্রে না জানি কি আছে, তাহা দেখা হইল না, শুনিলামও না। এই আক্ষেপ দূর করিবার জন্যই এই উপনিষদ্ পাঠ, এই পবিত্র নির্জন প্রান্তরে তপোবনে।

ঠাকুরের কথা সব বেদ উপনিষদ্। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত উপনিষদ্।

গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে উপনিষদের এই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ সম্ভব কি? — এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীম বলিতেছেন, এই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ কঠিন হইলেও সম্ভব, যদি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ কর।

শ্রীরামকৃষ্ণ তারস্বরে বলিতেছেন, সংসার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। ইহাতে ঝলসিত হইয়া যায় লোক। এইখানে সর্বত্যাগী ঈশ্বরপ্রেমীগণ Oasis (মরূদ্যান) স্বরূপ। তাঁহাদের সঙ্গ কর, তাঁহাদের সেবা কর, তাঁহাদের সঙ্গে সশ্রদ্ধ স্নেহে সংযুক্ত হও, তাঁহাদের জীবন পর্যালোচনা কর — কেন সর্বস্ব ছাড়িয়া তাঁহারা রাস্তায় দাঁড়াইয়াছেন। তাহা হইলে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ও ঝলসিত সংসারাশ্রমীর মন পরম শান্তিময় শ্রীভগবানের পাদপদ্মে স্থান পাইবে। আর আকুল প্রাণে অন্তরের অন্তঃস্তলে 'দাঁতের ব্যথা'র মত সর্বদা প্রার্থনা কর, হে পিতঃ, হে মাতঃ আমাদের বিভ্রান্ত মনকে তোমার অভয় চরণে আশ্রয় দাও, আমাদিগকে সুমতি দাও, আমাদিগকে দেবমানব কর।

শ্রীম-দর্শনের পঞ্চম ভাগ ভরসার এই অমূল্য পঞ্চম রত্নটি হৃদয়ে বহন করিতেছে। ইহা ছাড়া অপরাপর ভাগের মত আরও চারিটি অমূল্য রত্ন বহন করে।

প্রথম রত্ন পরমহংসদেব ও মায়ের কিছু নূতন কথা। দ্বিতীয় রত্নটি হইতেছে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী ও গৃহী সন্তানগণের অমর কথা। কথামৃতকার দ্বারা অমর গ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বিজ্ঞানসম্মত অপূর্ব ভাষ্য হইতেছে তৃতীয় রত্ন। চতুর্থ রত্নটি, উপনিষদ্ গীতা ভাগবত কোরাণ বাইবেল আদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনালোকে উদ্ভাসিত ও অভিনব ব্যাখ্যা।

শ্রীম-দর্শনের পঞ্চম ভাগ এবারের নূতন নৈবেদ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (তুলসীমঠ)। বিনীত
ঋষিকেশ, হিমালয়। গ্রন্থকার
শ্রীশংকর জয়ন্তী,
১৩৭৫ সাল, ১৯৬৮ খৃঃ

যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি) — যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, — সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্ ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে — সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি — যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[দক্ষিণেশ্বর, ২৪শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ]

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ - ২য় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন পথ ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

'আমার চিন্তা করবে যে, আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে সে'... ১৭

তৃতীয় অধ্যায়

কালীঘাটে গদাধর আশ্রমে শ্রীম ৪১

চতুর্থ অধ্যায়

'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে' ৫৬

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীম-প্রতিভা ৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়

মনে ত্যাগ ও সর্বত্যাগ, গান্ধী মহারাজ ৯১

সপ্তম অধ্যায়

পার্শী ভক্তসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ও কাশীপুর উদ্যানে শ্রীম ১০০

অষ্টম অধ্যায়

আমেরিকাবাসী ডক্টর হামেলসঙ্গে শ্রীম (১) ১১৫

নবম অধ্যায়

আমেরিকাবাসী ডক্টর হামেলসঙ্গে শ্রীম (২) ১২৩

দশম অধ্যায়

প্রতীচীর প্রতি ভারতের হিতবাণী ১৩৭

একাদশ অধ্যায়

উপনিষদের ঋষি শ্রীম (১) ১৫০

দ্বাদশ অধ্যায়

উপনিষদের ঋষি শ্রীম (২) ১৭০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কলার ভিতরে কুইনাইন যেমন ১৮৮

চতুর্দশ অধ্যায়

মহাসমাধিমগ্ন ক্রাইস্ট ২১০

পঞ্চদশ অধ্যায়

উপনিষদ গীতা বাইবেল ২৩০

ষোড়শ অধ্যায়

কলির নিদান ব্যাকুল ক্রন্দন ২৫৮

সপ্তদশ অধ্যায়

মধুকর শ্রীম — গীর্জা, গুরুদ্বারা আশ্রম ২৭৬

অষ্টাদশ অধ্যায়

কর্ম উদ্দেশ্য নয় — উপায় ২৮৬

উনবিংশ অধ্যায়

আগুন নিয়ে খেলা ২৯৫

* * *

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

(পঞ্চম ভাগ)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রী ম ট্রাস্ট

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট

৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চণ্ডীগড় - ১৬০০১৮

প্রকাশক ঃ
প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রী ম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চন্ডীগড় - ১৬০০১৮
ফোন ঃ ০১৭২-২৭২৪৪৬০
Website : http://www.kathamritra.org

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

পঞ্চম সংস্করণ
শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা
৯ই আষাঢ়, ১৪১৬
(২৪শে জুন, ২০০৯)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি - ১১০০১৯
ফোন ঃ ০১১-৪১৬০৩৯৯৬ / ৯২১৩১৩৪৪৮৭

মুদ্রক ঃ
শ্রী অরবিন্দ গুপ্ত
প্রিন্ট ল্যান্ড, কাশ্মীরি গেট, দিল্লী
ফোন ঃ ০৯৯১১৩৮৬৭১৬/০৯৮১০০৮৬৭১৬

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা (Subsidised)

✿ শ্রীম - দর্শন ✿

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন

(পঞ্চম ভাগ)

শ্রীম - দর্শন ❁ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ | ৬

শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তাকে লিখিত শ্রীম-দর্শনের গ্রন্থকার স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীর পত্র (মূল হিন্দী পত্রের বঙ্গানুবাদ)

শুভাশীর্বাদ

পরমকল্যানীয়া শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা,

দেবী, দেবার্চনার অর্ঘস্বরূপ আপনার কৃত 'শ্রীম-দর্শন'-এর (প্রথম ভাগ) হিন্দী অনুবাদ একাধারে অতি সুন্দর, সরল, সাবলীল, প্রাঞ্জল, ভাব-ব্যঞ্জক এবং মূল রচনার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ।

অনুবাদকার্য স্বভাবতঃই নীরস। কিন্তু গ্রন্থের মূল বিষয়-বস্তুর সহিত আপনার একাত্মতা-হেতু এই অনুবাদ অতিশয় সরস ও সুরুচিসম্পন্ন হইয়াছে।

ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া দৈনন্দিন জীবনে আচরণীয় বৈদান্তিক এই গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ অতি সুকঠিন কার্য।

'শ্রীম-দর্শন'-এর মূল বিষয়বস্তু ঃ সুখ-দুঃখময় এই সংসারে কি করিয়া বেদবর্ণিত দেব-জীবন লাভ সম্ভব, তাহারই পথ-নির্দেশ।

বেদ-মূর্তি যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষায় বর্তমান জড়-সভ্যতার যুগে আচার্য শ্রীম বনের বেদান্তকে ঘরে আনিয়া মূর্ত করিয়াছিলেন আপনার জীবনে — এই ঊনবিংশ-বিংশ শতকে, ঠিক যেরূপ মূর্ত হইয়াছিল বৈদিকযুগে - তপোবনে ঋষিগণের জীবনে।

'শ্রীম-দর্শন' মহর্ষি শ্রীম-র জীবনের একটি জীবন্ত আলেখ্য, আবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রকাশকও। বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত যুগে, শ্রীম কথিত এই প্রামাণিক মহাগ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের মনোমুগ্ধকর সজীব বিস্তৃত বিবরণ ও সটীক ভাষ্য।

আপনি এই পরম আকর্ষণীয় মহাগ্রন্থ (হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া) হিন্দী ভাষাভাষী ভক্তগণের কর-কমলে পরিবেশন করিয়া এক সুমহান জ্ঞান-যজ্ঞ সাধন করিয়াছেন।

দেবী, আপনার এই মহৎ প্রচেষ্টা দেখিয়া স্বতঃই মনে উদয় হইতেছে যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার হৃদয়-মন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

তাঁহার শ্রীচরণে আন্তরিক বিনীত প্রার্থনা — তিনি তাঁহার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া আপনার দ্বারা 'শ্রীম-দর্শন'-এর অবশিষ্ট সকল ভাগও এইরূপ সরল, সুমিষ্ট, হৃদয়গ্রাহী অনুবাদ করাইয়া লউন।

ইহাদ্বারা আপনার জীবন হইবে অধিকতর ধন্য ও মধুময় এবং সমাজ-জীবন হইবে অধিকতর উন্নত ও দেবভাব-মন্ডিত। ইতি,

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ঋষিকেশ, হিমালয়। শুভানুধ্যায়ী
দুর্গা-নবরাত্রি, ১৯৬৫ (ইং)। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

ঃ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ

(১) শ্রীম-দর্শন (বাংলা) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(২) শ্রীম-দর্শন (হিন্দী) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত
(৩) শ্রীম-দর্শন (ইংরাজী) - "M. the Apostle and the Evangelist", ১ম হইতে ১১শ ভাগ
(১৬ ভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে)
(৪) Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Centenary Memorial
(৫) A Short Life of Sri "M"
(৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (হিন্দী), ভাগ ১ম হইতে ৫ম (মূলগ্রন্থের যথাযথ হিন্দী অনুবাদ)
(৭) The Life of M. and Sri Sri Ramakrishna Kathamrita

এই সকল গ্রন্থে আছে —

ভারতীয় সংস্কৃতি - আধ্যাত্মিকতা — আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন আর যোগসাধনার বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে — বর্তমান কালোপযোগীভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশ — যাহা পড়িয়া দেশবিদেশের বহু নরনারী চির শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন ও হইতেছেন।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

1. Sri Ma Trust Office
579, Sector 18-B, Chandigarh 160018

2. Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Peeth
Sri Ma Trust
Sector 19-B, Chandigarh - 160019

3. Smt. Padma Gadi
R-899, New Rajendra Nagar
New Delhi -110060

গ্রন্থকার

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীম-র সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ও সাধু ভক্তদের সঙ্গে শ্রীম-র যেসব ঈশ্বরীয় কথা হইত তাহা তিনি নিত্য ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। শ্রীম এই ডায়েরীর পাঠ শুনিয়াছেন, আর স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কিভাবে উত্তমরূপে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-দর্শন এই ডায়েরীর সংকলন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ষোল ভাগে লিখিত।

ইহাতে আছে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কিছু কিছু নূতন কথা। আর কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য। অধিকন্তু উপনিষদ, গীতা পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা।

।। কয়েকটি অভিমত ।।

স্বামী বিরজানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট) বলেন, শ্রীম-দর্শন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইহার লিখনভঙ্গী যেমনি নাটকীয়, বিষয় - বস্তুও তেমনি সুগম ও সুগভীর।

প্রবুদ্ধ ভারত — শ্রীম দর্শন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক রত্ন।

বিশ্ববাণী — রচনানৈপুণ্যে ও বর্ণনামাধুর্য্যে শ্রীম-দর্শন পাঠকালে কথামৃতের কোনও নবতর সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন।

ভবন জারনেল (বম্বে) — প্রতি মানবই শ্রীম-দর্শন থেকে কিছু না কিছু লাভ করবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা — শ্রীম-দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের...জীবনভাষ্য। গ্রন্থকার গভীর একটি তত্ত্ববোধিনী দৃষ্টি নিয়ে সেই মহাশ্চর্য জীবনকথা আলোচনা করেছেন। ভক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন পাঠকের কাছেই এর আবেদন অমোঘ।

শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' ' মাস্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্ত্বা যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহুরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে — লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীম-র অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রী মা বলেন, — একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন — কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।.... এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন — শ্রীম-র লেখা যেন শর্টহ্যান্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন — কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবনচরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী — কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর —'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূল স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।

নিবেদন

শ্রীম-দর্শন ষোলটি খন্ডে সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি ভক্তগণের চাহিদাতেই একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে।

শ্রীম-দর্শনের মূল আবেদন ঃ গৃহে বাস করিয়া কি প্রকারে দেবভাবে জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে বেদবর্ণিত উপায়ে সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয়।

এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের কিছু নূতন কথা, আর স্বামীজীপ্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা। আর আছে 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃত'-র ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল-আদি শাস্ত্রের আলোচনা।

শ্রীমতি ঈশ্বরদেবী গুপ্তা শ্রীম-দর্শনের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ শ্রীম-র কথামৃত হইতে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন যাহাতে হিন্দী ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই মহাগ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে পারেন। পরে এই গ্রন্থ 'M - the Apostle and the Evangelist' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত ধরমপাল গুপ্ত মহাশয়।

পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিবার দায়িত্বভার 'শ্রী ম ট্রাস্ট'-এর উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি ট্রাস্ট এই গ্রন্থরাজি বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

শ্রীম-দর্শন মুদ্রণে এবং প্রকাশনে যে সকল সহকর্মী, অনুরাগীবৃন্দ ও ভক্ত সমাজ অক্লান্ত সহায়তা দান করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে আমাদের অকুন্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত
প্রকাশক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজ্যপাদ্য স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ যখন শ্রীম-দর্শন রচনায় হিমালয়ের কোলে হৃষিকেশের 'তুলসী মঠ' আশ্রমে সাধনারত ছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলীন পরমারাধ্য স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজও ঐ মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদপুষ্ট সৌভাগ্যবান তাপস স্বামী সারদেশানন্দজী তাঁকে এই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন। স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজের এই অকৃপণ স্নেহপরায়ণ সহায়তায় শ্রীম-দর্শন রচনা সম্ভবপর হয়। শ্রী ম ট্রাস্ট এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজের সেবকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই অপরিশোধ্য ঋণ স্মরণ করেন।